শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার জাতীয় পত্রিকা

গোলাঘর

৩য় বর্ষ ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা জুলাই - ডিসেম্বর ২০১১

প্রকাশকাল
১৫.০৬.১২

সম্পাদক
শওকত হোসেন
শরমিন নিশাত

যোগাযোগ
৩৬২ ফ্রি স্কুল স্ট্রিট, হাতিরপুল, ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৫
৪র্থ তলা, ডানপাশ, ইস্টার্নপ্লাজা মার্কেটের পেছনে মোবাইল ০১৭১৬৪৩৪৪৬৫
০১৫৫৯১১৩৯৬১, ই-মেইল: golaghor@yahoo.com

বানান সমন্বয়
ফরীদুল আলম

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
কাইয়ুম চৌধুরী

পত্রিকার নামলিপি
শরমিন নিশাত

প্রচ্ছদে রঙবিন্যাস
রুবাবা হোসেন নদী

জনসংযোগ
আবদুল হাই

অনলাইন মেকাপ
খোরশেদ রানা

মুদ্রণ
বিকল্প প্রিন্টিং

মূল্য
২০০.০০ টাকা
২০০.০০ রুপি
৪$ ডলার

স ম্পা দ কী য়

গতমাসে বাংলাদেশে এসেছিলেন ভারতের নাগরিক কথাসাহিত্যিক দেবেশ রায়। ২৮ মে সন্ধ্যায় তাঁর একক বক্তৃতা শুনতে আমাদের যেতে হয়েছিল কাঁটাবনের একটি অডিটোরিয়ামে। বক্তৃতার শুরুতেই আয়োজকরা ঘোষণা দিল, বিখ্যাত উপন্যাস 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত'-র এই লেখকের সাহিত্য নিয়ে কোনো প্রশ্ন করা যাবে না; উনি উপস্থিত বক্তৃতায় যা বলবেন কেবল সেসব কথার ওপরই প্রশ্ন রাখা যাবে; এই প্রশ্ন আবার আয়োজকদের আস্থাভাজন পূর্বনির্ধারিত চার/পাঁচ জনই করতে পারবে। হাত-পা-মুখ গুটিয়ে শুধু কান আর চোখ খোলা রেখে দেবেশ রায়ের বক্তৃতা শুনতে বাধ্য থাকলাম; বাধ্য থাকলাম এই কারণে যে, তাঁর উপন্যাস 'তিস্তা পারের বৃত্তান্ত' এবং প্রবন্ধের বই 'উপন্যাস নিয়ে', 'উপন্যাসের নতুন ধরনের খোঁজে', 'উপনিবেশের সমাজ ও বাংলা সামাজিক গদ্য'এরকম কিছু বই আমাদের পড়া থাকায় এক ধরনের দুর্বলতা দেবেশ রায়ের প্রতি ছিল। কিন্তু হায়, বক্তৃতায় এ কোন দেবেশ রায়ের কথা আমরা শুনছি? বাংলাদেশ সৃষ্টির ইতিহাস নিয়ে বলতে গিয়ে ওনার মুখে যেভাবে ইতিহাস বিকৃতি ঘটল এবং আমাদের এত ত্যাগের বিনিময়ে পাওয়া মুক্তিযুদ্ধকে উনি যেভাবে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে কথাগুলো বলে যাচ্ছিলেন, সেটা আমাদের মতো উপস্থিত সবাইকেই নিশ্চিতভাবে আহত করেছে।

তিস্তার পানি নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী এবং সোনিয়া গান্ধী আমাদের যে আশ্বাস দিয়েছিলেন, পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী তার ওপর ছড়ি ঘুরিয়ে যে খেলা দেখিয়ে আমাদের দাদা ও দিদিভক্ত সরকারকে যেভাবে নাকানি-চুবানি খাওয়ালেন সেই খেলার সাথে দেবেশ রায়ের এই খেলাটার মিল পাওয়া গেল। আমাদের আশা ছিল, মমতার রাজনৈতিক চাতুরতা বিবর্জিত হয়ে তিস্তার পানি-অধিকার নিয়ে রায় মহোদয় একজন বড়মাপের লেখক হিসেবে বিবেকবান মানুষ হিসেবে বাংলাদেশের ন্যায্যতা নিয়ে কিছু বলবেন। আমরা সে-আশাতেই বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলাম। কিন্তু লেখক যখন জাতীয়তাবোধের প্রশ্নে এমন চরম ও বিবেকহীন হন তখন তার নৈতিক স্থান নিয়েও অনেকের মধ্যে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। দেবেশ রায়ের জন্ম বাংলাদেশের পাবনায়; তা সত্ত্বেও এ-দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তাঁর ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধ নেই দেখেও অবাক হইনি; কারণ তাদের এই আচরণ আমরা সবসময়ই প্রত্যক্ষ করে আসছি। যার বীজ নিহিত আছে আরও অনেক গভীরে। ...জেনারেল নিয়াজি রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করেছিলেন মিত্রবাহিনীর কাছে; সেদিন জেনারেল ওসমানী কোথায় ছিলেন, কী কারণে নিয়াজির আত্মসমর্পণকালে ওসমানী উপস্থিত ছিলেন না এই ইতিহাস আমরা আজও যেহেতু জানতে পারিনি, তাই একজন মমতা বা দেবেশ রায় বাংলাদেশের মানুষ, মুক্তিযুদ্ধ, সাহিত্য তথা সকল অর্জনকে তাচ্ছিল্যের চোখে দেখবেন এটাই স্বাভাবিক।

দেবেশ রায় ২০০৮ সালেও একবার বাংলাদেশে এসেছিলেন; তখনও উনি বাংলাদেশের সাহিত্য নিয়ে অনেক অনাহূত অনাকাঙ্ক্ষিত কথা বলে গেছেন। এবারও একই কাজ করলেন। বাংলাদেশের আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, শওকত আলী, হাসান আজিজুল হক, শহীদুল জহির প্রমুখ ঔপন্যাসিকদের উপন্যাস-যে ওনার পড়া নেই, এর প্রমাণ মেলে উনি যখন দু-দুবার বাংলাদেশ সফরে এসে ওনার সবচেয়ে ভালোলাগা ঔপন্যাসিক হিসেবে একেবারেই আনকোরা অপরিচিত কোনো বাংলাদেশী কানাডা-প্রবাসী উপন্যাস-লেখকের নাম উল্লেখ করেন।

জীবনভর বিপ্লবী সংগীত-শিল্পী ভূপেন হাজারিকা বুড়োকালে এসে যদি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল বিজেপি-তে যোগ দিতে পারেন, তাহলে একজন দেবেশ রায় কেন বিলাসবহুল ভ্রমণ-এর আয়েসে প'ড়ে কূপমণ্ডুকতার কাছে আদর্শ জলাঞ্জলি দিতে পারবেন না!; তাঁর উত্তাল যৌবনে লিখিত গণমুখি রচনাগুলো পড়ে তো মনে হয় না তিনি এমন কোনো কথা বা কাজ উপহার দিতে পারেন যা আমাদের বয়ে নিতে কষ্ট হবে! অথচ তাঁর প্রায় পুরোটা বক্তব্যেরই উপস্থাপন-ভঙ্গী (অ্যাপ্রোচ) ছিল এ-রকমের: 'কী একটা যুদ্ধটুদ্ধ হল, এরপরই বাংলাদেশ নামে একটি দেশ হয়ে গেল অমনি হঠাৎ করেই ঢাকা হয়ে গেল বাংলাদেশের রাজধানী!'

তাহলে একটি প্রশ্ন সহজেই আমাদের সামনে এসে যায়; উনি বাংলাদেশে আসেন কাদের বিমানভাড়ায়, ফাইভস্টার হোটেলে থাকেন, ঢাকা ক্লাবে ডিনার করেন কিংবা হয়তো মোটা অংকের মাসোহারা নিয়ে কোলকাতায় ফেরেন কাদের অর্থে? এই দেশে এমন অনেক মুক্তিযোদ্ধাও রয়েছে যারা মানসিকভাবে রাজাকার-এর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত, পাহাড়পুঁজির মালিক, গণশত্রু। তা না-হলে দেবেশ রায়কে দিয়ে কত টাকার বিনিময়ে বাংলাদেশের অস্তিত্ব, সার্বভৌমত্ব, মুক্তিযুদ্ধ, এদেশের সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে স্বেচ্ছাচারী বক্তব্য বলিয়ে নেয়া যায়? এটা কি ভারতীয় আগ্রাসী সম্প্রসারণবাদের এ-দেশীয় দালালচক্রের উল্লম্ফন নয়? এদেশের ভবিষ্যৎ-প্রজন্ম যাতে এসব আত্মবিক্রির প্রকল্প, নপুংশক উদ্যোগ দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়, সে-কারণে বিষয়গুলো বাংলাদেশের সাহিত্যিক, চিন্তক ও নির্বাহী মহল-এর গভীরভাবে খুঁটিয়ে দেখবার প্রয়োজন রয়েছে।

দেবেশ রায় যে-বক্তব্য বাংলাদেশে এসে দিয়ে গেলেন তার দায় এর আয়োজকরা কোনোভাবেই এড়াতে পারে না। দেবেশ রায়ের বাংলাদেশ-বিরোধী যাবতীয় আপত্তিকর বক্তব্যের ব্যাখ্যা যদি আয়োজকদের কাছে থেকে থাকে তাহলে সেটা লিখিতভাবে প্রকাশ করে তারা নিজেদের কৃতকর্মের যৌক্তিকতা তুলে ধরবেন আশা করছি। অন্যথায় ভবিষ্যতে এর জবাব দেবেশ রায়দের কাছ থেকে এদেশের সচেতন মানুষই বুঝে নেবেন; সেদিন অতিথির প্রতি সৌজন্যবোধ হয়তো ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করে যাবে; তখন এইসব মুখোশধারী পুরস্কারখেকো অশুভ প্রতিক্রিয়াশীল

দেশীয় তোষকদেরও এ-দেশের কবি-লেখক-শিল্পী-সাংবাদিক ও পেশাজীবী-শ্রমজীবী মানুষ প্রতিহত করবে ।

সংখ্যাটি প্রকাশের ক্ষেত্রে সহযোগী সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ।

শওকত হোসেন
শরমিন নিশাত
১৫.০৬.১২

সূচি

স্ম র ণ
মনোরমা বসু "মাসিমা" ০৭

ব্য ক্তি ত্ব
মনোরমা বসু মাসিমা: একটি জীবন, একটি প্রতিষ্ঠান
স ত্যে ন সে ন ৯
মনোরমা বসু: শ্রদ্ধাঞ্জলি
ক বী র চৌ ধু রী ১৯

রা জ নী তি / অ নু বা দ প্র ব ন্ধ
ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন: মৌলিক পরিবর্তনমুখী কল্পনাপ্রতিভা
ডে ভি ড গ্রে বা র / সে লি ম রে জা নি উ ট ন ২২
ওয়াল স্ট্রিট বিদ্রোহ
ব খ তি য়া র আ হ মে দ ২৬

অ নু বা দ / ক বি তা
না-বললেই নয়
গু ন্টা র গ্রা স / শে খ বা তে ন ৪১

দ র্শ ন / প্র ব ন্ধ
ভারতীয় মুসলমানদের সংকটের কারণ
সু র জি ৎ দা শ গু প্ত ৪৬

স মা জ / প্র ব ন্ধ
এস. ওয়াজেদ আলি'র 'ভবিষ্যৎ-বাঙালি'
ন জ রু ল হো সে ন বু ল বু ল ৫২

ক বি তা
২য় দশকের ২১ জন কবির ২১টি কবিতা **৬২**

দ্বি তী য় দ শ কে র ২১ জ ন ক বি র ২১ টি ক বি তা র ৩ টি আ লো চ না
মিশ্র পাঠ-প্রতিক্রিয়া তবু আবাহন আবাহন... **৮২**

শ্র দ্ধা ও মূ ল্যা য় ন / প্র ব ন্ধ
কবীর চৌধুরী: তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য
শ ফি আ হ মে দ ৯৩

গ ল্প
মানুষের প্রতিপক্ষ ঘুণপোকা
ঘুণপোকার প্রতিপক্ষ মানুষ মানুষের প্রতিপক্ষ মানুষ
তা রে ক শা হ রি য়া র ১০৩

অ র্থ নী তি / প্র ব ন্ধ
নৈতিকতা, ব্যাংকিং ও পেশাজীবীর দায়বদ্ধতা
মো জা ফ্ ফ র অ হ ম দ ১০৯
রবীন্দ্রভাবনায় কৃষকের অধিকার
আ তি উ র র হ মা ন ১৩৭
জাতীয় বাজেট ও কৃষক খামারিদের চাহিদা
শা ই খ সি রা জ ১৪৫

নারী / প্রবন্ধ
জাতীয় আয় এবং নারীর অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ
হোমায়রা আহমেদ ১৫০
নারীর সমস্যা: সমাধানের খোঁজে
মিতালী হোসেন ১৫৮

প্রেম / প্রবন্ধ
মার্কসীয় দৃষ্টিতে প্রেম
লেখক: অজ্ঞাত ১৬১

বই/ আলোচনা
রাইসুর কবিতা কি কলাকৈবল্যবাদী?
শওকত হোসেন ১৭৬

স্মরণ

মনোরমা বসু "মাসিমা"

(১৮৯৭-১৯৮৬)

[মনোরমা বসুর জন্ম ১৮৯৭ সালের ১৮ নভেম্বর, বরিশাল জেলার বানাড়ীপাড়া থানার নরোত্তমপুর গ্রামে। বাবা নীলকণ্ঠ রায় ও মা প্রমদাসুন্দরী রায়। মনোরমা ছিলেন বাবা-মা'র পঞ্চম সন্তান। সেই সমস্ত বিপ্লবী যারা জীবন দিয়ে ভারত ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা এনেছিল তাদের একজন মনোরমা বসু। যিনি ভারত ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবনবাজি রেখে লড়েছেন। তিনি বরিশালের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহন করেন। ক্ষুদিরামের ফাঁসি তার মনকে স্পর্শ করে মাত্র ১১ বছর বয়সে। তিনি ১৯৩০ সালে বরিশাল শহরের কংগ্রেস নারী কর্মীদের সাথে যোগ দেন ও ১৯৩৮ পরবর্তীকালে কমউনিষ্ট মতবাদ দ্বারা প্রভাবিত হন। মাত্র তের বছর বয়সে মনোরমার বিয়ে হয় বরিশালের বাঁকাই গ্রামের বিপত্নীক জমিদার চিন্তাহরণ বসুর সাথে। ১৯২৫ সালে মাহাত্মা গান্ধী রাজনৈতিক প্রচারণা এবং তহবিল সংগ্রহের জন্য বরিশাল এলে মনোরমা বসু নিজের গহনা দান করেন। বরিশালে গান্ধীর সাথে এই সাক্ষাৎ তাঁকে আরো উজ্জীবিত করে তোলে। তিনি ব্রিটিশদের শৃঙ্খল থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার জন্য বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন এবং বিপ্লবী মনোরমা বসু মাসিমা নামে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি শুধু ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য আন্দোলন করেননি, মানুষের মুক্তির জন্যও আন্দোলন করে গেছেন সারাজীবন। বরিশাল শহরে নিজ বাড়িতেই গড়ে তোলেন 'মাতৃমন্দির'। কুমারী মা, স্বামী পরিত্যক্তা, বিপথগামী ও আশ্রয়হীনা মেয়েদের আশ্রয়স্থল এই 'মাতৃমন্দির'। অসহায় মেয়েদের স্বাবলম্বী করতে গড়ে তোলেন 'নারী কল্যাণ ভবন', শিশু-কিশোরদের মানসিক বিকাশের জন্য 'মুকুল-মিলন খেলাঘর আসর', সাধারণ মানুষের জ্ঞানের জন্য 'পল্লীকল্যাণ অমৃত পাঠাগার', নারী জাগরণ ও নারী অধিকার রক্ষায় 'নারী আত্মরক্ষা সমিতি', 'মহিলা সমিতি' ও 'মহিলা পরিষদ'সহ নানা সংগঠন।

১৯৩০ সাল থেকে ভারতে কংগ্রেসের ডাকে শুরু হয় আইন অমান্য আন্দোলন করায় জীবনে প্রথম ৬ মাসের জেল ও ১৫০ টাকা জরিমানা হয় ।
তিনি নিজের বাড়িতে পাড়ার ও নিজের ছেলেমেয়েদের নিয়ে গড়ে তোলেন মাতৃমন্দির সরকারী আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় । আর্থিক সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি বাড়িতে বাড়িতে মুষ্টি-ভিক্ষার ঘট বসালেন ।

মাতৃমন্দিরের এই কঠিন কাজ করার পাশাপাশি মনোরমা বসু রাজনৈতিক কাজেও কঠোর পরিশ্রম করেন এসময় । তিনি ১৯৪২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য পদ লাভ করেন । ১৯৪৩ সালে কলকাতা শহরের মতো বরিশালেও মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে তোলেন মনোরমা বসু । তিনি এর প্রথম নির্বাচিত সম্পাদক হন ।

১৯৪৮ সালে সারা পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে দেখা দিল দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির প্রতিকার চেয়ে ৫ জুন বুভুক্ষু মেয়েদের নিয়ে বরিশালে মিছিল করেন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কার্যালয়ের সামনে । ফলে পুলিশ তখন তাদের উপরেও লাঠিচার্জ করে । মহিলা সমিতির ৪ জন নেত্রীসহ ৮ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে পুলিশ । এসময় প্রায় ১০ মাস বিনাবিচারে কারাগারে আটক ছিলেন । পরে ৪ বছরের জেল হয় এবং জেল থেকে তিনি ছাড়া পান ১৯৫২ সালের ২৫ এপ্রিল ।

১৯৭০ সালে তিনি মহিলা পরিষদ বরিশালের সভানেত্রী নির্বাচিত হন । এবছর দেশের দক্ষিণ উপকূল জুড়ে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় হয় । মনোরমা দেশের নানাস্থানে গিয়ে ত্রাণ সংগ্রহ করেন এবং তা সন্দ্বীপ ও পটুয়াখালির নিম্নাঞ্চলে বন্যার্ত মানুষের মাঝে বিতরণ করেন ।

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে মনোরমা বসু জুন মাসে চলে যান ভারতে । সেখানে গিয়েও তিনি মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে প্রচারণা, অর্থ সংগ্রহ, নারীদের সংঘটিত করা ইত্যাদি কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন । দেশ স্বাধীন হলে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং দেশ পুনর্গঠনের কাজে নিয়োজিত হন । মহিলা পরিষদের উদ্যোগে বয়স্কা মহিলাদের জন্য কালীবাড়ি রোডের চন্ডীসদনে স্থাপন করেন বৈকালিক স্কুল । ১৯৭৪ সালে তিনি সোভিয়েত নারী কমিটির আমন্ত্রণে বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের প্রতিনিধি হিসেবে রাশিয়া ভ্রমণ করেন ।

১৯৮৩ সাল থেকেই তিনি বার্ধক্য আর নানা জড়ায় পীড়িত হতে থাকেন । অবশেষে এই মহিয়সী নারী ১৯৮৬ সালের ১৬ই অক্টোবরে মৃত্যুবরণ করেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত মাতৃমন্দিরে । মনোরমা বসুর মৃত্যুর পর বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে ১৯৯২

সালের ১১ মার্চ মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান করে। পরে ১৯৯৭ সালে শেরেবাংলা পদক (মরণোত্তর), ১৯৯৮ সালে মহিলা পরিষদ কর্তৃক সম্মননা (মরণোত্তর), ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বেগম রোকেয়া পুরস্কার (মরণোত্তর) প্রদান করা হয়। তাঁর রেখে যাওয়া যাবতীয় সম্পত্তি নিয়ে ২০০১ সালে গঠন করা হয় 'মনোরমা বসু মাসিমা স্মৃতি ট্রাস্ট' ।]

তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
https://bit.ly/3b2Pu7g

ব্য ক্তি ত্ব / প্র ব ন্ধ

মনোরমা বসু মাসিমাঃ একটি জীবন, একটি প্রতিষ্ঠান

....

স ত্যে ন সে ন

ছোট্ট একটি প্রতিষ্ঠান। আয়তনে একবারেই ছোট; কিন্তু গুণের দিক দিয়ে ছোট নয়। এই উজ্জ্বল আদর্শটিকে সবার সামনে তুলে ধরবার প্রয়োজন আছে। আমি বরিশালের মাতৃমন্দিরের কথা বলছি। এই মাতৃমন্দির আর যিনি তাকে জন্ম দিয়েছেন এবং সুদীর্ঘ আটত্রিশ বছর ধরে লালন পালন করে আসছেন, সেই মনোরমা মাসিমার কথা বরিশাল শহরের সবাই জানে। শুধু বরিশাল শহর নয়, মনোরমা মাসিমা আর তাঁর মাতৃমন্দিরের কথা আজ বরিশালের সীমানা ছাড়িয়ে সারা প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে। একটুও বাড়িয়ে বলছি না, আজকের বরিশাল সারা প্রদেশের সামনে এই দুটি জিনিসের জন্য অতি সংগতভাবেই গর্ব ও গৌরব বোধ করতে পারে। প্রথমটি মনোরমা মাসিমা, দ্বিতীয় তাঁর হাতের সৃষ্টি মাতৃমন্দির।

মাতৃমন্দিরের পল্লীকল্যাণ অমৃত পাঠাগারের জন্মবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দেবার জন্য মাসিমার কাছ থেকে কড়া তাগিদ পেয়েছিলাম না-গেলেই নাকি চলবে না। আমাদের মতো চারটি অবান্তর প্রাণী না-গেলেও কোনো কিছু আটকে থাকত না সে কথা ভালো করেই জানতাম। গিয়েছিলাম নিজেদের প্রাণের তাগিদেই। মাসিমা আর তাঁর মাতৃমন্দিরের জীবন-কথা মাসিমার মুখে কতবার যে শুনেছি, কিন্তু শুনে শুনেও তৃপ্তি হয়নি। একটি স্বল্পশিক্ষিত গ্রাম্য মেয়ে দেশের মানুষের প্রতি বুক-ভরা ভালোবাসা, প্রবল আত্মবিশ্বাস এবং দৃঢ় সংকল্পকে সম্বল করে কী ভাবে কঠিন প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করে চলতে পারেন, মনোরমা বসুর তেহাত্তর বছরের জীবন তার উজ্জ্বল পরিচয় বহন করে আসছে।

১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ করে মাসিমা বাইরে বেরিয়ে এলেন। যখন জেলে গিয়েছিলেন, তখন কত আশা ছিল মনে। মনে হয়েছিল স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের আর বাকি নেই। বাইরে বেরিয়ে এসে কী দেখলেন? দেখলেন আন্দোলন ভেস্তে যাওয়ার ফলে সারা দেশ হতাশার অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। পুরনো সহকর্মী যাঁরা একে একে সবার সঙ্গে দেখা করলেন। কিন্তু কেউ সাড়া দিতে চায় না। তাঁদের মুখে একটি মাত্র কথা এ জাতির কিছু হবে না। কেউ কেউ মুখ ফুটেই সে কথা বলল। কারু-বা মুখের নিঃশব্দ ব্যঞ্জনায় সে কথা ফুটে উঠল।

কিন্তু সংগ্রামী মনের চেতনা মনোরমা বসুকে ভেঙে পড়তে দিল না। এ জাতির কিছু হবে ন্নএই কথাটা তিনি কিছুতেই মেনে নিতে পারলেন না। তাঁর অপরাজেয় মন অবিরাম গুঞ্জন করে চলেছে, মেঘ ক্ষণিকের চিরদিবসের সূর্য। সেই আলোয় উজ্জ্বল মন নিয়ে আবার শুরু হবে অভিযাত্রীদের যাত্রা। কিন্তু সেই সুদিনের অপেক্ষায় চুপ করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। ইতিমধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। কিন্তু সেই প্রস্তুতি আসবে কাজের মধ্য দিয়ে। বিনা কাজে বসে থাকলে চলবে না। যে অবস্থায় যতটুকু সম্ভব ততটুকু কাজ করতেই হবে। একদিন দেখা গেল সদ্য জেল-খেটে বেরিয়ে-আসা মনোরমা বসু তাঁর ঘরের দাওয়ায় মাদুর পেতে ছ'টি মেয়েকে নিয়ে পড়াতে বসেছেন। এই ছ'টির একটি তাঁর নিজের মেয়ে ভজনা। পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ল কথাটা। দেখতে দেখতে মেয়ের সংখ্যা বাড়তে লাগল। শেষে বারান্দায় আর জায়গা হয় না। ঢুকতে হল ঘরে। ঘরের মধ্যে দুটো খাট, কোনোমতে গাদাগাদি করে বসত মেয়েরা। কিন্তু শেষে তাতেও কুলোয় না। এভাবে ছাত্রীসংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে দেখে মেয়েদের জায়গা দেবার জন্য পাশের বাড়ির আরও একখানা ঘর ভাড়া নিতে হল। এ পর্যন্ত মাসিমা একাই পড়াতেন। এবার আরও দু'জন শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করতে হল। মাসে মাসে চাঁদা তুলে তাদের যৎ-সামান্য বেতন দেওয়া হত।

জেলখাটা স্বদেশী মেয়ে মনোরমা বসুর এই নতুন ভূমিকার কথা জানতে পেরে কয়েকজন উকিল কৌতূহলী হয়ে একদিন স্কুল দেখতে এলেন। এখানকার শিক্ষাপ্রণালী দেখে তাঁরা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

এবার বাড়ি তৈরি করবার আয়োজন শুরু হয়ে গেল। শহরের উকিল, শিক্ষক এবং অন্যরা চাঁদা করে ৩০০ টাকা তুলে দিলে মাসিমা তাঁর গলার হার বিক্রি করে ২৫০ টাকা সংগ্রহ করলেন। এই ৫৫০ টাকা পুঁজি করে বিদ্যালয়ের বাড়ি তোলার কাজে হাত দেওয়া হল। এই উদ্দেশ্যে আট কাঠা জমি লিজ নেয়া হয়েছিল। বিদ্যালয়ের ঘর ছাড়াও আরও তিন-চারখানা ঘর তোলা হল। এইসব ঘর তোলার জন্য মাসিমাদের নিজেদের সংসার থেকেও অনেক টাকা যোগাতে হয়েছিল। নতুন বাড়ি তৈরি করার পর ছাত্রীসংখ্যা একশোর উপর উঠে গেলে এবার আরও দু'জন শিক্ষয়িত্রীকে নিয়োগ করতে হল। বিদ্যালয়ের নিজস্ব বাড়ি তো তৈরি হল কিন্তু বিদ্যালয়ের খরচ চলবে কী করে? ছাত্রীদের কাছ থেকে কোনো বেতন নেওয়া হত না। মাসিমা ছাড়া তখনও আরও চারজন শিক্ষয়িত্রী কাজ করছেন। তাঁদের বেতন দেওয়া হবে কী করে? এই দায়িত্বটা মাসিমা'র কাঁধেই এসে চাপল। এই আর্থিক সমস্যার সমাধানের জন্য মাসিমা বাড়িতে বাড়িতে মুষ্টি-ভিক্ষার চাল সংগ্রহ করতেন। এই থেকেই শিক্ষয়িত্রীদের বেতন দেওয়া হত। এ থেকে কিই-বা তাঁদের দেওয়া যেত? যা দেওয়া হত তাকে ঠিক বেতন দেওয়া বলা চলে না। একটা কথা মনে রাখতে হবে, প্রধানত দেশসেবার উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁরা মাসিমা'র সঙ্গে এই কাজে নেমেছিলেন। মাসিমার কাছ থেকেই তাঁরা এই প্রেরণা লাভ করেছিলেন।

মুষ্টি-ভিক্ষা সংগ্রহের ব্যাপারে একটা কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার। এই ধরনের কোনো জনহিতকর কাজ পরিচালনার জন্য মুষ্টি-ভিক্ষা সংগ্রহের রেওয়াজ অনেক জায়গাতেই প্রচলিত আছে। কিন্তু এই উপলক্ষে মাসিমা গণ-সংযোগের যে অভিনব ব্যবস্থা করেছিলেন, তার অনুরূপ দৃষ্টান্ত আর কোথাও দেখেছি বা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। তাঁরা যে সমস্ত বাড়ি থেকে মুষ্টি-ভিক্ষা সংগ্রহ করতেন, এই উপলক্ষে তাঁরা সেই সমস্ত সংসার সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ নিতেন এবং যে কোনো সমস্যার ব্যাপারে উপদেশ ও সাহায্য যোগাতেন। এইভাবে প্রতিটি সংসারের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক এমন ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে, সমস্ত কোতোয়ালি ওয়ার্ডটা তাঁদের একান্ত আপন ও নিজস্ব বাড়ির মতোই হয়ে গিয়েছিল। কোনো বাড়িতে যদি অসুখ-বিসুখ হত এবং সেই সংসারে যদি সেবা-শুশ্রূষা করার মতো লোক না থাকত, তাহলে মাসিমা এবং অন্য শিক্ষয়িত্রীরা তাঁদের সেবা-শুশ্রূষা করতেন এবং প্রয়োজন হলে রাত্রি জেগে ডিউটি দিতেন। কোনো সময় কলেরা-বসন্ত ইত্যাদি সংক্রামক রোগ দেখা দিলে তাঁরা খবর পাওয়ামাত্র সেখানে গিয়ে সর্বরকমের ব্যবস্থা করতেন। এক সময় গ্রামাঞ্চলের ছেলেদের মধ্যে এই ধরনের সেবা-সমিতি করার রেওয়াজ ছিল, পাড়ার লোকের বিপদের দিনে তারা যথেষ্ট কাজও করত; কিন্তু মেয়েদের মধ্যে এই ধরনের সেবা-সমিতি কোথাও ছিল বলে মনে পড়ে না। বিশেষ করে কোনো বিদ্যালয়ের শিক্ষয়িত্রী বাড়ি বাড়ি ঘুরে লোকের অসুখে-বিসুখে সেবা-শুশ্রূষা করছেন আমাদের দেশে এমন আর কোনো দৃষ্টান্ত আছে বলে আমার তো মনে হয় না। সেই কারণে কোতোয়ালি

ওয়ার্ডের সমস্ত লোকের মধ্যে তাঁরা এমন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন বলেই দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাঁরা অব্যাহতভাবে এই বিদ্যালয় চালাতে পেরেছিলেন। সরকার বা মিউনিসিপ্যালিটি কারু কাছ থেকেই তাঁরা কোনোরূপ অর্থসাহায্য পাননি। একমাত্র শিক্ষয়িত্রীদের ত্যাগ ও আদর্শনিষ্ঠা এবং সাধারণের সাহায্য ও সহযোগিতার ওপর নির্ভর করেই মাতৃমন্দির দাঁড়িয়ে থাকতে পেরেছিল।

এই বিদ্যালয়ের মেয়েরা যে শুধু লেখাপড়াই শিখত তা নয়, তারা লণ্ঠনের ফিতা, নেওয়ার, সুতার কাজ এবং নানারকম কুটিরশিল্পের কাজও শিক্ষা করত। তা ছাড়া মেয়েরা নিয়মিতভাবে শরীরচর্চা করত। প্রথমে এই বিদ্যালয়ের নাম ছিল মাতৃমন্দির বিদ্যালয়। পরে এর নাম পরিবর্তন করে নতুন নামকরণ করা হয় আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয়।

'মেঘ ক্ষণিকের, চিরদিবসের সূর্য'। মাসিমা'র কর্মময় জীবন এই সত্যটিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে আছে। এই সত্যটি বহু প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে তাঁর এই আদর্শনিষ্ঠ কর্মীসত্তাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে, বহু দুর্যোগের মুখেও তাকে ভেঙে পড়তে দেয়নি। তাঁর এই দীর্ঘ দিনে কত সহকর্মী এসেছে কত-বা চলে গেছে। ভাঙা হাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সবাই যখন চুপ, তখন একাই তাঁকে চলতে হয়েছে। কিন্তু কোনো বাধা কোনো দুর্যোগ তাঁর চলাকে আটকে রাখতে পারেনি। এই ছোট্ট প্রতিষ্ঠানটির মতোই ছোট-খাটো অতি সাধারণ চেহারার এই স্বল্পশিক্ষিত মেয়েটি প্রবল আত্মবিশ্বাসের দীপ্ত আভায় উজ্জ্বল শিখায় জ্বলছে। সেই আলো শুধু বরিশালে নয়, সারা পূর্ববাংলায় ছড়িয়ে পড়েছে। পূর্ববাংলার প্রগতিশীল কর্মীরা যদি তোমরা তোমাদের এই বিঘ্নসংকুল যাত্রাপথে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা লাভ করতে চাও তবে মাসিমা'র এই কর্মময় জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখ।

১৯৩৩-৩৪ সালে মাতৃমন্দিরের কাজের পরিধি বেড়ে গেল। ভাগ্যের অভিশাপ, সমাজের নিষ্ঠুর বিধানে যেই মেয়েরা সমাজ থেকে পরিত্যক্ত, তাদের নিয়ে এই মাতৃমন্দিরে একটি আশ্রম গড়ে উঠল। বড় করুণ বড় মর্মান্তিক তাদের কাহিনী। কলঙ্কের ভয়ে যাদের কেউ জায়গা দিতে চায় না মাসিমা তাদের কোলে টেনে নিলেন। তাদের জীবিকার ব্যবস্থার জন্য তাঁত, ধান ভানার ঢেঁকি আরও নানারূপ কুটিরশিল্পের আয়োজন করা হল; গড়ে উঠল এক কর্মশালা। মাতৃমন্দিরের পবিত্র ও প্রাণময় পরিবেশে এবং বিশেষ করে মাসিমা'র প্রত্যক্ষ ও দৈনন্দিন সংস্পর্শে এসে এই দুর্ভাগিনীদের মধ্যে অনেকেই এক নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছিল। মাতৃমন্দিরের ইতিহাসে এ একটি বিশিষ্ট অধ্যায়, কিন্তু সেই প্রসঙ্গ এখানে থাক।

মেঘ ক্ষণিকের, চিরদিবসের সূর্য। এই দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে মাসিমা তার কর্মময় পথ ধরে এগিয়ে চলছিলেন। অবশেষে সত্যসত্যই মেঘ কেটে গেল, আবার দেখা দিল চিরদিবসের সূর্য। কিন্তু এ সূর্য যেন নয়, মেঘের বাধার বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে নতুন রূপ আর নতুন দিনের সূর্য। ১৯৩৭-৩৮ সালে বাংলাদেশের তথা সারা

উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগের সূচনা হল। এই স্বর্ণযুগ আকাশ থেকে নেমে আসেনি। এই শতাব্দীর সূচনা থেকে সেই স্বাধীনতার আন্দোলন পরিচালিত হয়ে আসছিল, এর লক্ষ্য, কর্মসূচি ও কার্যক্রম সম্পর্কে অতৃপ্ত হয়ে একদল সচেতন কর্মী নতুন পথের সন্ধান করে ফিরছিলেন। আন্তর্জাতিক পটভূমিকা এবং দেশের মেহনতি জনসাধারণের ওপর যে শোষণ ও অত্যাচার চলে আসছিল, তারা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁরা এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন যে একমাত্র সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ছাড়া এই শোষণকে চিরতরে বন্ধ করে দেয়া সম্ভব নয়। আজ সমাজতন্ত্রের কথা লোকের মুখে মুখে। সেদিন তাঁরাই সর্বপ্রথম সমাজতন্ত্রের আদর্শ সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন। এই যুগসন্ধিক্ষণে জেলের বাইরে এবং জেলের ভিতরে যে সমস্ত কর্মীরা ছিলেন তাঁদের কারু কারু মনে এই চিন্তা বিপুল আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছিল, আর এই আলোড়নের মধ্য দিয়েই তারা নতুন মানুষে রূপান্তরিত হয়ে চলেছিলেন। অবশেষে এই আদর্শ শুধুমাত্র চিন্তার ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল না, স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রচলিত কর্মসূচির পাশাপাশি গড়ে উঠল তাঁদের স্বাধীনতা ও বাস্তব কর্মসূচি। এই কর্মসূচি নিয়ে তারা ছড়িয়ে পড়লেন গ্রামে গ্রামে, শহরে শহরে, কারখানায়

বস্তিতে। সেদিন তাঁদের শক্তি ছিল খুবই সামান্য কিন্তু তাহলেও ভবিষ্যৎ তাঁদের হাতে। এই দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলেই, এই সামান্য শক্তি নিয়েও তাঁরা চিন্তায় ও কর্মক্ষেত্রে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে তুলতে পেরেছিলেন এবং সারা উপমহাদেশে তাঁদের এই আহ্বান ছড়িয়ে পড়েছিল।

মানবতার মুক্তির মহা আহ্বান মাসিমার প্রাণের দুয়ারে এসে ঘা মারল। তাঁর মন যেন এ জন্য নিজের অজান্তে আগে থেকেই তৈরি হয়েছিল। তাই সাড়া দিতে দেরি হয়নি। দেশের দুঃখী মানুষের জন্য দয়া আর ভালোবাসা তাঁর নিজস্ব প্রাণের সম্পদ। যেই ভালোবাসা এই স্বল্পশিক্ষিতা, রক্ষণশীল সংসারের কুলবধূকে স্বাধীনতার সংগ্রামে টেনে নিয়ে এসেছিল। সেই ভালোবাসা আজ সত্যিকারের বাস্তব ও কার্যকরী রূপ পেয়ে আপনাকে কৃতার্থ ও ধন্য মনে করল, যেদিন এই সত্যকে উপলব্ধি করলেন, সেদিন একটু দ্বিধা নয়, একটু ইতস্তত নয়, এতদিন ধরে কংগ্রেসের আন্দোলনের সেই রাজপথ ধরে চলে এসেছেন অবলীলাক্রমে সেই পথ ছেড়ে দিয়ে নতুন পথিকদের সঙ্গে নতুন পথে এসে পা মেলালেন। তাঁর কংগ্রেসী সহকর্মীরা তখন এই নতুন পথের পথিকদের বিরুদ্ধে নানারকম কুৎসা ও অপপ্রচার করতে লাগল। মাসিমা যাতে এদের সঙ্গে চলে না-যান তার জন্য যথাসাধ্য বাধা দিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। আগুনের ফুলকির মতো অদম্য এই মেয়ে, কে তাকে দমিয়ে রাখবে? শুধু তারাই নয়, তাঁর নিজের হাতের গড়া এই মাতৃমন্দিরও তাঁকে আঁকড়ে ধরে রাখতে পারল না। তাঁর মাতৃভূমির সেবার জন্য এবং এখানকার গণমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে লেগে থাকার জন্য নিজের ছেলেমেয়ে, আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ছেড়ে এই মাতৃমন্দিরকে আগলে পড়ে আছেন। আবার যখন সরকারের অনুগ্রহে জেলে চলে যেতে হয় তখন মাতৃমন্দির থাকে

পিছনে। তাঁর অনুপস্থিতির কালে কে তাঁর এত সাধের মাতৃমন্দিরের দেখাশোনা করবে, কে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখবে, এই উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা তাঁর সংগ্রামী মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তাঁর মাতৃমন্দির অতি প্রিয়, কিন্তু তাঁর কাছে তাঁর চেয়ে অনেক বেশি প্রিয় তাঁর দেশের মানুষ। তাদের জন্য সব কিছু দিতে পারেন, সব কিছুই দিয়ে এসেছেন, আপনার বলতে কোনো কিছুই রাখেননি।

১৯৪০ থেকে শুরু করে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত মোটামুটি এই সময়টা তাঁর সমগ্র কর্মজীবনের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ। এই সময়ে তিনি বরিশালের গ্রামে গ্রামে ঘরে মহিলা সমিতি গড়ে তুলেছেন। শুধু মধ্যবিত্ত আর নিম্ন-মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মেয়েদের নিয়েই যে তিনি কাজ করতেন তা নয়, তিনি কৃষক পরিবারগুলোর মধ্যে অন্তরঙ্গভাবে মিশে যেতেন। তাঁকে পেলে কৃষকমেয়েরা আর কৃষকবধূরা কিছুতেই ছেড়ে দিতে চাইত না। প্রথম পরিচয়েই তাঁরা তাঁকে তাদের আপন মানুষ বলে চিনে নিতে পারত। মাসিমা মাঝে মাঝেই দুঃখ করে বলেন, 'আমি যদি আর সব কাজ ছেড়ে দিয়ে কৃষকমেয়েদের মধ্যে আন্দোলন সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আপনাকে ঢেলে দিতে পারতাম, তাহলে আমার জীবনের মস্তবড় একটা সাধ পূর্ণ হত।' আমার মনে হয়, মাসিমা'র সেই সাধ যদি পূর্ণ করা সম্ভব হত তাহলে বরিশাল জেলার কৃষক আন্দোলন হয়তো একটা নতুন রূপ নিয়ে ফুটে উঠতে পারত। কৃষক সমিতির ঝাণ্ডার নিচে কৃষকছেলেদের পাশাপাশি কৃষকমেয়েরাও এসে জমা হত।

এল পাকিস্তান। মানুষ কত কিছুই-না আশা করে, কিন্তু সেই আশা মরীচিকার মতোই মিলিয়ে গেল। কায়েমি স্বার্থবাদীদের শাসন-শোষণ জনসাধারণের জীবনে বিপর্যয় টেনে নিয়ে এল। এ সময় যারা সামান্য প্রতিবাদটুকু জানাতে গেছে, তাদেরই নিগৃহীত হতে হয়েছে। ১৯৪৮ সালের ৫ জুন তারিখে বরিশাল শহরে একটি ঘটনা ঘটে গেল। চাল ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম ক্রমশই বেড়ে যাচ্ছিল, এই অবস্থার প্রতিকারের এবং সস্তাদরের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের আবেদন নিয়ে মহিলা সমিতির নেতৃত্বে বুভুক্ষু মেয়েদের একটি মিছিল জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে গিয়ে উপস্থিত হল। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট তাদের বক্তব্য শুনতে রাজি নন। ভুখামিছিলের মেয়েরা সেখানে দাঁড়িয়ে শ্লোগান দিয়ে চলছিল। সেদিন ছিল হাটবার। গ্রাম থেকে হাজার হাজার লোক হাটে এসেছে। খাদ্যসমস্যা সকলেরই সমস্যা। বিশেষ করে গ্রামের লোকদের অবস্থা আরও বেশি সংকটাপন্ন। তাদের মধ্যে অনেকে মেয়েদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে শ্লোগান দিতে শুরু করল। অপর দিক থেকে সস্তাদরে খাদ্যের পরিবর্তে লাঠিচার্জ শুরু হল। লাঠিচার্জের খবর পেয়ে কলেজ থেকে ছুটে এল ছেলেরা। তখন তাদের ওপরও লাঠিচার্জ চলল। বহু লোক সেদিন আহত হয়েছিল। আহতদের মধ্যে মেয়েরা ছিল। এই উপলক্ষে মহিলা সমিতির নেত্রীস্থানীয়া ৪ জন মহিলা ও ৮ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করা হল। কয়েক মাস হাজতবাসের পর তারা এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হল।

কারাদণ্ডের এক বছর মেয়াদ শেষ হলে মাসিমা ছাড়া আর সবাই মুক্তি পেয়ে গেলেন। মাসিমাকে নিরাপত্তা আইনে আটক রাখা হল। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল এই ক'টা বছর তাঁর জেলখানাতেই কাটল। ১৯৫২ সালে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁর শরীরের এই সংকটাপন্ন অবস্থায় ডাক্তারদের সুপারিশ অনুসারে সরকার তাঁর মুক্তির আদেশ দেন। ১৯৫২ সালের ২৫ এপ্রিল মাসিমা জেল থেকে বেরিয়ে এলেন। এসে কী দেখলেন তিনি? দেখলেন তাঁর এত সাধের মাতৃমন্দিরের ঘরগুলোর চিহ্নমাত্র নেই। শুধু খালি জায়গাটা পড়ে আছে। প্রথম দর্শনে অভিভূত হয়ে পড়লেন তিনি। কিন্তু তাই বলে ভেঙে পড়েননি। মনে মনে সংকল্প নিলেন আসুক সুদিন, আবার গড়ে তুলব মাতৃমন্দিরকে। সেই সুদিন কি আসবে না? অবশ্যই আসবে।

সত্য সত্যই আসছিল। দিনের গতি বদলে যাচ্ছিল। একুশে ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলনের ফলে সারা প্রদেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছিল। লীগ সরকারের স্বৈরাচারী শাসনের শৃঙ্খল ভেঙে ফেলবার জন্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলো ক্রমশই দানা বেঁধে উঠছিল। তার পরিণতি ঘটল ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক বিজয় লাভে। সারা প্রদেশের মানুষ উল্লসিত হয়ে উঠল। আর সবার মতোই মাসিমাও মনে করেছিলেন এতদিনে তাঁরা সুদিনের মুখ দেখতে পেয়েছেন। কিন্তু তাদের অলক্ষে পূর্ববাংলার ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসছিল। মাসিমা'র ব্যক্তিগত জীবনেও একটা গভীর বিচ্ছেদ-বেদনা নেমে এল। ১৯৫৪ সালের ৮ই মে মাসিমা'র স্বামী মফস্বলে তাদের প্রজাদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। মাত্র দুদিন বাদে তিনি সেখানে হার্টফেল করে মারা যান। ১০ই মে তার মৃতদেহ নৌকায় বহন করে নিয়ে এল। সেদিন মাসিমা এক প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলেন কিন্তু বাইরের লোকে তা টের পায়নি। তাঁর মনের অস্থিরতাটা, বাইরে খুব কমই প্রকাশ পেয়েছিল।

মাসিমা'র স্বামী মারা গেলেন ১০ই মে তারিখে। তার কয়েকদিনের বাদেই ঢাকা থেকে খবর এসে পৌঁছল, অবস্থা গুরুতর। মুখ্যমন্ত্রী আবু হোসেন সরকার পুলিশ ধর্মঘটের অছিলা করে রাজনৈতিক কর্মীদের গ্রেফতারের জন্য পরোয়ানা জারি করেছেন এবং ইতিমধ্যে ঢাকা শহরে গ্রেফতার শুরু হয়েছে। শহরের দু'জন কর্মী পালিয়ে এসে এই খবর দিল। রেডিও মারফতও ঢাকা শহরের ধরপাকড়ের সংবাদটা পাওয়া গেল। আরও লক্ষ করা গেল বরিশাল শহরে আই, বি-র লোকদের কর্মব্যস্ততা বেড়ে গেছে। এ অবস্থায় কী করা যায়? কী করা উচিত? প্রকাশ্যে থাকলে নির্ঘাত জেলে যেতে হবে এবং একবার ঢুকলে কত বছর পরে যে বেরোনো যাবে, তার কোনোই স্থিরতা নেই। জীবনের এই মূল্যবান সময়কে এভাবে অপচয় করে লাভ কী? তার পরিবর্তে পুলিশের চোখ এড়িয়ে থাকতে পারলে কিছু না কিছু কাজ অবশ্যই করা যাবে। যতটুকু করা যায় সেইটুকুই লাভ। এ বিষয়ে মাসিমার এটাই ছিল নিজস্ব অভিমত। সহকর্মীদের মধ্যে যাদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায়, সেই মুহূর্তে এমন লোকও কাছাকাছি কেউ নেই। কিন্তু দেরি করার সময় নেই, যা করবার তখনই করতে হবে।

মাসিমা সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন, ধরা দেওয়া চলবে না, যতদিন প্রয়োজন বাইরেই থাকতে হবে।

সেদিন একটানা অবিরাম বৃষ্টি পড়ছিল। ঘন অন্ধকার রাত্রি। সেই অন্ধকারের আবরণে আপনাকে আবৃত করে মাসিমা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন পথে। পরনে শুধুমাত্র বিধবার থান, গায়ে একটা চাদর, হাতে চৌদ্দটি টাকা। এই মাত্র সম্বল নিয়ে মাসিমা নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলেন। শহরের সহকর্মীরা কেউ শহরে ছিল না, তাদের সঙ্গে একটু পরামর্শ করার সুযোগও পাওয়া গেল না। কোথায় যাবেন, কিভাবে থাকবেন, কী করবেন, কোনো কিছুর স্থিরতা নেই। শুধু একটা স্থির আছে শহর থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়তে হবে, পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে যেখানে যেটুকু সম্ভব কাজ করে চলতে হবে।

কোথায় যাবেন? কার কাছে গিয়ে আশ্রয় নেবেন? ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার সময় সে কথাটা ভেবে পাননি। পথে চলতে চলতে ঠিক করে নিতে হবে। পথই পথ দেখাবে। তখন তাঁর বয়স আটান্ন। সাধারণত যে বয়সে লোকে ইহকালের কাজকর্ম থেকে অবসর নিয়ে পরকালের চিন্তায় ডুবে থাকে, সেই বয়সে এই দুঃসাহসিকা এই অনিশ্চিত ও দুর্গম পথে যাত্রা করলেন। ঘরে ঘরে গিয়েছেন, কোথাও আশ্রয় পেয়েছেন, কোথাও-বা পাননি। কেউ আদর করে ডেকে নিয়েছে, কেউ-বা ভয় পেয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে দেশের মানুষের সেবায় কাজে লাগাব, একটি মুহূর্তেরও অপচয় হতে দেব না, এই আদর্শকে সামনে রেখে, সরকারি পরওয়ানা মাথায় নিয়ে মাসিমা বরিশালের গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়িয়েছেন। যেখানে গেছেন, যাদের মধ্যে গেছেন, তাদের মধ্যে তাঁর বীজমন্ত্র ছড়িয়ে গেছেন। বলেছেন; দেশের কথা, সমাজের বঞ্চিত ও নিপীড়িতদের কথা, আন্দোলনের কথা, ভবিষ্যতের উজ্জ্বল দিনের কথা। তার ফলে কী হয়েছে, মাসিমা নিজেও সেকথা জানেন না। হয়তো কিছুই হয়নি, হয়তো-বা লোকচক্ষুর আড়ালে বা ভিতরে কাজ করে চলেছেন। ফলাফল যাই হোক না কেন, তিনি তাঁর চেষ্টার ত্রুটি করেননি, মাসিমার এখানেই সান্ত্বনা।

এইভাবে দীর্ঘ দেড় বছর কাল কাটল। অবশেষে আওয়ামী লীগের শাসনের আমলে বন্দীরা মুক্ত হলেন, পলাতকদের মাথার ওপর থেকে হুলিয়া তুলে নেওয়া হল। এবার মেঘের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলেন মাসিমা। বেরিয়ে এসে বিন্দুমাত্র বিশ্রামের সময় ছিল না। নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া মাতৃমন্দিরকে আবার নতুন করে গড়ে তোলার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কাজ, কাজ, আর কাজ তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। এই মন্ত্রই আজও তাঁকে উজ্জীবিত করে রেখেছে। আজও তেয়াত্তর বছরের জরাজীর্ণ, ভগ্নস্বাস্থ্য, ছোটখাটো চেহারার এই মানুষটি এক মুহূর্ত কাজ ছাড়া থাকতে পারেন না।

দিনের পর দিন তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে আবার গড়ে উঠল মাতৃমন্দির। এ মাতৃমন্দিরের ভবনটি তিল তিল করে গড়ে উঠেছে। সে গড়ার কাজ এখনও শেষ হয়নি। মাসিমা'র স্বপ্নকে সফল করে তুলতে হলে এখনও আরও অনেক কিছু গড়ে

তুলতে হবে। এই ভবনটি গড়ে তোলার জন্য বা মাতৃমন্দিরের পরিচালনার জন্য সরকার বা মিউনিসিপ্যালিটি কোনোরূপ অর্থসাহায্য করবার প্রয়োজন বোধ করেনি, কোনো দানশীল ধনীলোক এই বাজে কাজের জন্য উদার হস্তে অর্থসাহায্য করতে এগিয়ে আসেননি। এক সময় এই মাতৃমন্দিরের পিছনে মাসিমা আর তাঁর স্বামী তাঁদের সংসারের খরচ হিসেবে বহু অর্থ ব্যয় করেছেন। কিন্তু আজ তাঁর সেই সামর্থ্য নেই। নিজের বলতে আজ আর তাঁর কিছু নেই।

সেই সর্বহারা কাঙালিনী মেয়েটি ঘরে ঘরে গিয়ে চাঁদা তুলেছেন, তিল তিল করে সঞ্চয় করেছেন... সর্বসাধারণের মুষ্টিভিক্ষা দিয়ে গড়ে উঠেছে মাতৃমন্দির। মাতৃমন্দিরের তিনটি বিভাগ। (১) আদর্শ বিদ্যালয় (২) পল্লীকল্যাণ অমৃত পাঠাগার (৩) মুকুল মিলন খেলাঘর।

পল্লীকল্যাণ পাঠাগার অমৃত নাগের স্মৃতি বহন করছে। আজ হয়তো অমৃত নাগের নাম অনেকেই জানেন না, কিন্তু একসময় তিনি জনপ্রিয় কর্মী হিসেবে বরিশালের ঘরে ঘরে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি প্রধানত কৃষক আন্দোলনের কাজেই তাঁর জীবন ঢেলে দিয়েছিলেন। ১৯৫০ সালের সাম্প্রদায়িক দাংগায় এই তরুণ কর্মীটিকে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছিল।

মাসিমা তাঁর সেই তরুণ সহকর্মীর স্মৃতিকে এই পাঠাগারের মধ্য দিয়ে ধরে রাখতে চেয়েছেন। সেই পাঠাগারের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমরা ক'জন মাতৃমন্দিরের সুমধুর আতিথ্য লাভ করেছিলাম এবং মাতৃমন্দিরের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেখানকার শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটি দিনের মেলামেশার ফলে আমরা অভিভূত হয়ে গিয়েছি।

আদর্শ বিদ্যালয় (মাতৃ-মন্দির) প্রথমে শুধুমাত্র মেয়েদের নিয়ে শুরু করা হয়েছিল। কিন্তু এখন মেয়েরাও পড়ে, ছেলেরাও পড়ে। ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে এখন তিনশোর কাছে এসে পৌঁছেছে। আর একটা বড় রকমের পরিবর্তন হয়েছে। আগে বিদ্যালয় ছিল অবৈতনিক। বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে বেতন নেওয়া হয়ে থাকে। এছাড়া উপায় ছিল না, নিতান্ত বাধ্য হয়েই এই ব্যবস্থা করতে হয়েছে। প্রধানত যাদের সাহায্যের ওপর নির্ভর করে এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ হত, তাঁদের শূন্যস্থান এখনও পূরণ করা সম্ভব হয়নি।

একটা জিনিস খুবই আশ্চর্য লাগল। আদর্শ বিদ্যালয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বরিশাল শহরে এরই কাছাকাছি সরকার-পরিচালিত আরও কয়েকটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় চলছে। আদর্শ বিদ্যালয়ে যে সমস্ত ছেলেমেয়ে পড়ে, তারা এখানে না এসে ঐসমস্ত সরকার-পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়লে বিনা বেতনেই পড়তে পারত। তা সত্ত্বেও এই দুর্দিনে এদের বাপ-মা পয়সা খরচ করে এখানে পাঠান কেন? তবে কি এরা অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন ঘরের ছেলেমেয়ে? মোটেই না। খবর নিয়ে জানলাম এরা সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়ে।

ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রিকশাওয়ালা, দিনমজুর, এমনকি যে মেয়েরা পরের বাড়িতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে তাদের ঘরের ছেলেমেয়েরাও আছে। এর মধ্যে থেকে দুটো জিনিস পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে আসছে, প্রথমত ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যেও কী পরিমাণ আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সাধারণের মধ্যে একটা ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে যে, একমাত্র আদর্শ বিদ্যালয়েই ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার সত্যিকারের সুব্যবস্থা আছে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে পয়সা লাগে না বটে, কিন্তু লেখাপড়ার নামে সেখানে যা চলে তা দিয়ে সত্যিকারের শিক্ষা লাভ হতে পারে না। মাসিমা একদিন বলছিলেন, 'আগে মেয়েদের জন্য ঘরে ঘরে যেতে হয়েছে, তারা কেউ তখন মেয়ে দিতে চাইত না। কিন্তু এখন এত বেশি ছেলেমেয়ে আসছে যে জায়গা দিয়ে উঠতে পারি না।' আদর্শ বিদ্যালয়ের এই বিশেষত্বের উৎস কোথায়? এর উত্তর মাসিমা এবং এখানকার শিক্ষক-শিক্ষিকারা। বতমানে চারজন শিক্ষক, চারজন শিক্ষিকা। শিক্ষকদের মধ্যে সবাই অল্পবয়সী। তারা দিনের বেলায় শিক্ষকতা করে আর রাত্রিবেলায় নাইট কলেজে পড়ে। শিক্ষিকাদের মধ্যে মাসিমা নিজে, দু'জন গৃহিণী এবং একটি তরুণী। এখানকার প্রধান বিশেষত্ব হল এই যে, এঁরা তাঁদের কাজকে নিছক চাকরি হিসেবে দেখেন না। এ বিদ্যালয়, এখানকার ছাত্রছাত্রীরা তাঁদের কাছে একান্ত আপন এবং এঁরা সবাই দেশের জনসাধারণকে অন্তর দিয়ে ভালোবাসেন। এখানেই এই বিদ্যালয়ের বিশেষত্ব। এ বিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক আমার তরুণ বন্ধুটিকে কথাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করেছিলাম, আচ্ছা, সত্যি করে বল দেখি, গত আট বছর ধরে যে কাজ তুমি করছ সে কাজ করতে তোমার ভালো লাগে? আমার প্রশ্ন শুনে সে একটু ভ্রূকুঞ্চিত করে বলল, ভালো যদি নাই লাগবে তবে কি আর এখানে পড়ে থাকতাম। আমি বললাম, কর্তব্যবোধেও তো থাকতে পার! কর্তব্য তো সব সময় মুখরোচক হয় না, সেই জন্যই বলছি। সে এবার হেসে বলল, সত্যি বলছি, কাজটা আমার খুবই ভালো লাগে। এ সব ছোট ভাইবোনদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ এ আমার জীবনের এক পরম সম্পদ।

এ বিদ্যালয়ের প্রাণশক্তির উৎস কোথায়, এ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম। এরপর বলছি খেলাঘরের কথা। আমাদের ভাইয়ার সুযোগ্য নেতৃত্বে সারা প্রদেশের জেলায় জেলায় বহু খেলাঘর গড়ে উঠেছে। এই প্রদেশের মধ্যে যে খেলাঘরগুলো বিশেষভাবে সক্রিয় 'মুকুল মিলন খেলাঘর' তাদের মধ্যে অন্যতম।

মনোরমা বসু: শ্রদ্ধাঞ্জলি

....

ক বী র চৌ ধু রী

বরিশালের বাঁকাই গ্রামের জমিদারবাড়ির বধূ মনোরমা বসু বঞ্চিত নিঃস্ব ভাগ্যবিড়ম্বিত মানুষদের জন্য তাঁর অপরিসীম স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসার জন্য সর্বজনীন মাসিমা হয়ে উঠেছিলেন। একদিকে এই মমত্ববোধ, অন্যদিকে গভীর দেশপ্রেম আর অন্তরে বিপবের অগ্নিশিখা এই সব মিলে তাঁকে এক অসামান্য চরিত্রে রূপান্তরিত করেছিল।

মনোরমা বসু জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৭ সালে। তাঁর এগারো বছরের সময় কিশোর ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। ক্ষুদিরামের মৃত্যু সারা দেশে যে আবেগের জন্ম দিয়েছিল তা মনোরমাকেও স্পর্শ করে। যখন মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন মনোরমা তখন বিনা দ্বিধায় তাতে সাড়া দিলেন। ১৯৩০ সালে তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ নিলেন এবং সেই অপরাধে তাঁকে কারাবরণ করতে হয়। এরপর বেশ কয়েকবার তাঁকে জেলে যেতে হয়। তিনি বরিশালের গ্রামে গ্রামে ঘুরে মহিলা সমিতি গড়ে তোলেন। প্রথমে কংগ্রেসের সাথে যুক্ত থাকলেও ১৯৩৮ সালের দিকে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন এবং পরে কমিউনিস্ট মতবাদে দীক্ষিত হন। তবে বিশেষ একটি রাজনৈতিক মতাদর্শে আস্থাবান হলেও উদার মানবিকতার বোধই ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তিনি তার বাড়ির নাম রাখেন মাতৃমন্দির। সেখানে তিনি পরিত্যক্ত মেয়েদের আশ্রয় দেন এবং তাদের লেখাপড়া ও নানারকম কাজে শিক্ষিত করে তোলেন। মাতৃমন্দির এবং মনোরমা বসুর নাম বরিশালের সীমানা ছাড়িয়ে দেশের অন্যান্য অঞ্চলে বিস্তৃত হয়ে পড়ে। মনোরমা মাসিমার কথা অনেক রাজনৈতিক নেতাকর্মী তাদের স্মৃতিচারণায় গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে উলেখ করেছেন। ১৯৫০ সালে ইলা মিত্র আর মনোরমা বসু একসঙ্গে রাজশাহী জেলে ছিলেন। ইলা মিত্র লিখেছেন, 'আমাদের মেয়েদের ওয়ার্ডে আমরা রাজবন্দি ছাড়াও চুরি, ডাকাতি ও খুনের দায়ে অভিযুক্ত মেয়ে। বন্দিরাও আমাদের সঙ্গে ছিল। এদের বয়স বেশি ছিল না। মাসিমা ভাবতেন, এরা জেল থেকে বেরিয়ে গেলে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে কি? জেলের ভেতর নিরলস পরিশ্রম করে তাদের তিনি অক্ষর-পরিচয় করাতে লাগলেন, সঙ্গে সঙ্গে সরল ভাষায় রাজনীতিও বোঝাতে লাগলেন।'

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় লুটেরারা তার প্রাণপ্রিয় 'মাতৃমন্দির' ধ্বংস করে দেয়। ওই দুঃসময়ে কতিপয় মুসলমান ছেলে মাসিমা'র নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে এবং তাঁকে সীমান্তের ওপারে পৌঁছে দেয়। দেশ স্বাধীন হলে বিভিন্ন কারণে অনেকে ভারতে থেকে যান, কিন্তু মনোরমা বসু তাঁর প্রিয় স্বদেশভূমিতে ফিরে আসেন।

বিধ্বস্ত মাতৃমন্দির পুনর্গঠিত করার জন্য তিনি বঙ্গবন্ধুর শরণাপন্ন হন। নিখিল সেন তাঁর একটি লেখা এই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন : মনোরমা বসু বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে যান। তিনি বাইরের ঘরে অপেক্ষা করছেন, নিখিল সেন লিখেছেন, 'খবর পেয়ে ছুটে এলেন শেখ মুজিব। তাঁর শালপ্রাংশু দুই বাহু দিয়ে মাসিমাকে তুলে নিয়ে সোজা চলে এলেন খাবারঘরে। নিজ হাতে তুলে দিলেন চা ও জলখাবারের থালা, বঙ্গবন্ধু যখন শুনলেন যে বিধ্বস্ত মাতৃমন্দির নতুন করে নির্মাণের জন্য মাসিমা'র কয়েক বান্ডিল টিন দরকার তখন বঙ্গবন্ধু তাৎক্ষণিক ভাবে বরিশালের জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিলেন'। নিখিল সেন লিখেছেন : 'রাস্তা পর্যন্ত এসে মাসিমাকে বিদায় দেবার সময় বঙ্গবন্ধু তাঁর আঁচলে পাঁচশত টাকা বেঁধে দিয়ে বলেন, মাসিমা এটা সরকারি টাকা নয়, আমার রোজগারের টাকা। আপনি দুধ কিনে খাবেন'। বঙ্গবন্ধু সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়ায় মাতৃমন্দির আবার প্রাণবন্ত হয়ে উঠল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় মাসিমা আরো অনেকের মতো কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। সেখানে

গিয়েও তিনি তাঁর সেবামূলক কাজ অব্যাহত রাখেন। সে সময় কলকাতায় সল্ট লেকে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের জন্য একটি বড় আশ্রয়শিবির স্থাপন করা হয়েছিল। সেখানে ভারতীয় মহিলা ফেডারেশন শরণার্থীদের মধ্যে খাদ্যদ্রব্য ও বস্ত্রাদি প্রভৃতি বিলি করার ব্যবস্থা করে। এ প্রসঙ্গে রেনু চক্রবর্তী তার স্মৃতিচারণায় লিখেছেন, 'আমরা স্থির করলাম মনোরমা মাসিমার হাত দিয়ে ঐ সামগ্রী বণ্টন হবে। তাঁর চাইতে কে উপযুক্ত হতে পারে? কী খুশি মাসিমা! তাঁর প্রাণে কী আবেগ, যখন তিনি ঐ শিশু ও মেয়েদের হাতে ঐগুলো দিতে লাগলেন।' যুঁইফুল রায় ছিলেন বরিশালের মেয়ে। তিনি ছোটবেলাতেই মাসিমাকে দেখেন। মাতৃমন্দির গড়ে তোলার জন্য মাসিমা'র অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা যুঁইফুল রায় গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর স্মৃতিচারণায় উলেখ করেছেন। পরে ১৯৭৩ সালে তাঁর একটি অভিজ্ঞতার কথাও তিনি আকর্ষণীয় ভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি লিখেছেন, '১৯৭৩ সালে আমার স্বামীর সঙ্গে একবার আমরা আন্দামানে যাই। সেখানে আন্দামান-বন্দিদের একটা অনুষ্ঠান ছিল।

মাসিমা বরিশাল থেকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আসেন' যুঁইফুল রায় লিখেছেন, 'মাসিমা ও আমি জাহাজে একসঙ্গে ছিলাম। মাসিমা সেই বরিশাল থেকে চিড়ে, গুড়, নাড়ুইত্যাদি অনেক খাবার নিয়ে এসেছিলেন।

আন্দামানে যাতায়াতে জাহাজে আমাদের মোট ছয় দিন থাকতে হয়েছিল। মাসিমা'র চিন্তা, আমরা সকাল-সন্ধ্যায় খেতে পারলাম কিনা। সকালে উঠে খাবারগুলো সকলের মধ্যে ভাগ করে দিতেন। ১৯৭৪ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর ছিল মাসিমা'র জীবনের একটি

উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৭৪ সালে বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে বাংলাদেশের মহিলা প্রতিনিধিদের একটি দল সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করেন। ফিরে এসে তিনি বলেছিলেন, 'সোভিয়েট দেশের মেয়েদের ও শিশুদের মতো সুযোগ-সুবিধা আমাদের দেশে কবে হবে?'

সার্থক কর্মময় দীর্ঘ নব্বই বছরের জীবন যাপনের শেষে ১৯৮৬ সালের ১৬ই অক্টোবর মনোরমা মাসিমা মৃত্যুবরণ করেন। তবে তাঁর মতো মানুষদের মৃত্যু হয় না। মৃত্যুঞ্জয়ী শব্দটির সৃষ্টি বোধ হয় এঁদের জন্যই হয়েছে।

আমি চাকরিসূত্রে দু দফায় বরিশাল ছিলাম। একবার ১৯৫০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে, আরেকবার ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে। তখন আমি একাধিকবার 'মাতৃমন্দিরে' গেছি। মাসিমা এবং তাঁর 'মাতৃমন্দির' আমার ব্যক্তিগত স্মৃতিতে আজও ভাস্বর হয়ে আছে।

মাসিমা'র মৃত্যুর পর নানা প্রবন্ধ ও স্মৃতিচারণমূলক রচনা ছাড়াও বেশ কিছু কবিতাও রচিত হয়। ওই রকম একটি কবিতার শেষাংশ উদ্ধৃত করে আমার এই লেখা শেষ করছি :

'মাসিমা, তোমাকে দেখে
শ্রমিককর্মী পাভেলের মুগ্ধ জননীর কথাই বেশি মনে পড়ে,
কখনো তোমার মধ্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে
গুড্ আর্থের এক অনন্য স্নেহময়ী মা।
মাসিমা, তুমি নেই, আছে তোমার সেলাই-এর ক্লাস।
সত্যেন সেনের বই।
নদীকে যেমন সমুদ্র থেকে

আকাশকে যেমন নীলিমা থেকে
স্বপ্নকে যেমন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না
তেমনি তুমিও আমাদের অস্তিত্বের গভীর লোকালয়ে
অবিচ্ছিন্ন রয়ে গেছো ॥'

কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৭ সালের ৩১শে জুলাই, সাপ্তাহিক 'একতা' পত্রিকায়। কবির নাম সোহরাব হাসান।

রা জ নী তি / অ নু বা দ প্র ব ন্ধ

ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন: মৌলিক পরিবর্তনমুখী কল্পনাপ্রতিভা

....

ডে ভি ড গ্রে বা র / সে লি ম রে জা নি উ ট ন

[ডেভিড গ্রেবার: মার্কিন নৃতত্ত্ববিদ; নৈরাজ্যবাদী কর্মী; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পশ্রমিকদের 'ইউনিয়ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড'-এর সদস্য; 'ওয়াল স্ট্রিট দখল করো' আন্দোলনের সাথে গোড়া থেকে যুক্ত। ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিদ্যার সহযোগী অধ্যাপক ছিলেন। বর্তমানে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের গোল্ডস্মিথ কলেজে সামাজিক নৃবিদ্যার রিডার। 'তাঁর প্রজন্মের নৃবিদ্যার শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক' হিসেবে আখ্যায়িত। সাম্প্রতিক গ্রন্থ– ঋণ: প্রথম পাঁচ হাজার বছর (২০১১), বিপরীত দিক থেকে বিপ্লব (২০১১), ডাইরেক্ট অ্যাকশন: একটি এথনোগ্রাফি (২০০৯)।]

ওয়াল স্ট্রিটে এবং অন্যত্র প্রতিবাদকারী তরুণ-যুবারা বিদ্যমান অর্থহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রত্যাখ্যান করছেন। ভবিষ্যতের ওপর নিজেদের মালিকানাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে এসেছেন তাঁরা।

কেন মানুষজন দখল করছেন ওয়াল স্ট্রিট? সর্বশেষ পুলিশি ক্র্যাকডাউন সত্ত্বেও কেন এই দখল মাত্র কয়েক দিনের সারা আমেরিকা জুড়ে বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছে? শত শত মানুষকে কেন তা অনুপ্রাণিত করছে পিৎজা, টাকাপয়সা, যন্ত্রপাতি পাঠাতে? আর এখন, কেন তা মানুষজনকে অনুপ্রাণিত করছে শিকাগো-দখল-করো ফ্লোরিডা-দখল-করো ডেনভার-দখল-করো বা লসঅ্যাঞ্জেলেস-দখল-করো নামে তাঁদের নিজেদের আন্দোলন শুরু করতে?

স্বতঃস্পষ্ট কারণ আছে এসবের। নতুন প্রজন্মের মার্কিনিদের অবাধ্য আত্মনির্ভরতার শুরুটা দেখছি আমরা। এটা এমন একটা প্রজন্ম যাঁরা তাঁদের লেখাপড়া শেষ করতে চলেছেন কোনো চাকরি, কোনো ভবিষ্যতের আশা ছাড়াই। উপরন্তু, তাঁরা জর্জরিত হয়ে আছেন বিপুল পরিমাণ ঋণে– ক্ষমার অযোগ্য যে ঋণ। এঁদের বেশিরভাগই শ্রমজীবী শ্রেণী থেকে বা অন্যবিধ গরিবি হালের পারিবারিক পটভূমি থেকে আসা। যা যা তাঁদের করা উচিত বলে বলা হয়েছিল ঠিক তাই তাই করেছিলেন এ তরুণরা। তাঁরা লেখাপড়া করেছিলেন, কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন, আর এখন সেসব করার জন্য তাঁরা স্রেফ শাস্তি তো পাচ্ছেনই, আরো পাচ্ছেন অবজ্ঞা-অপমান। এমন এক জীবনের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁরা, যে জীবনকে মনে করা হয় অলস, হতাশ, ঋণখেলাপির জীবন; হাস্যকর নীতিহীনের জীবন।

এটা কি তবে অবাক করার মতো ব্যাপার যে এবার তাঁরা কথাবার্তা বলতে চাইবেন অর্থকড়ির সেইসব রাঘববোয়ালদের সম্পর্কে, যারা চুরি করে নিয়ে গেছে তাঁদের ভবিষ্যৎ?

ঠিক ইউরোপের মতনই, প্রকাণ্ড সামাজিক ব্যর্থতার পরিণাম দেখছি আমরা। দখল-আন্দোলনকারীরা ঠিক সেই পদের মানুষ যাঁরা ভাবনা-কল্পনায় ভরপুর। যেকোনো সুস্থ সমাজ তার প্রত্যেকটা মানুষের জীবন উন্নত করে তোলার ক্ষেত্রে এঁদের শক্তিসামর্থ্যকে কাজে লাগাতে চাইবে। অথচ, এটাকে তাঁরা ব্যবহার করছেন পুরো সিস্টেমটার পতন ঘটানোর উপায় উদ্ভাবনের কাজে।

কিন্তু, চূড়ান্ত ব্যর্থতাটা এখানে কল্পনাপ্রতিভার ব্যর্থতা। যা আমরা আজ নিজের চোখে দেখছি, তাকে একটা দাবি হিসেবেও দেখা যেতে পারে: শেষ পর্যন্ত একটা আলাপ-আলোচনায় বসার দাবি। এই আলাপ-আলোচনায় আমাদের সকলের বসার কথা ছিল সেই ২০০৮ সালে। পৃথিবীর অর্থকড়ি সংক্রান্ত স্থাপত্য-কাঠামো প্রায়-ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরের সেই মুহূর্তটা ছিল এমন একটা মুহূর্ত যখন যেকোনো কিছুই সম্ভব বলে মনে হচ্ছিল।

বিগত দশক জুড়ে যা যা আমাদেরকে বলা হয়েছে তার সমস্তটাই মিথ্যাকথা হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। বাজার নিজে নিজেকে চালায়নি। অর্থকড়ি বিষয়ক পদ্ধতি-প্রণালীগুলোর স্রষ্টাগণ অভ্রান্ত মহাপণ্ডিত ছিলেন না। এবং ঋণ আসলে পরিশোধ করা লাগে নি। প্রকৃতপক্ষে, টাকাপয়সা নিজেই রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে আবির্ভূত

হয়েছে। দেখা গেছে, ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার এক রাতে অস্তিত্বমান হয়ে উঠতে পারে বা হাওয়া হয়ে যেতে পারে, যদি সরকার বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকগুলো সেরকমটা চায়। এমনকি 'ইকনোমিস্ট' পত্রিকাও এরকম শিরোনাম দিচ্ছিল– 'পুঁজিবাদঃ এটা কি কোনো ভালো আইডিয়া?'।

মনে হচ্ছিল যেন সময় এসেছে সব কিছু নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করার– বাজার, অর্থকড়ি, ঋণ সব কিছু নিয়ে। মনে হচ্ছিল সময় এসেছে এই প্রশ্ন তোলার যে, একটা 'অর্থনীতি' আসলে কীসের জন্য? এই অবস্থাটা টিকে ছিল সম্ভবত দুই সপ্তাহ। তারপর, ইতিহাসের বৃহত্তম স্নায়ু-বিপর্যয়ের মধ্যে সমবেতভাবে আমরা আমাদের হাত দিয়ে ঠেসে ধরলাম আমাদের কান, আর চেষ্টা করলাম যেন আগে যা কিছু যেমন ছিল যতটা সম্ভব সেরকম জায়গায় সেগুলোকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

সম্ভবত এটা অবাক করার মতো কিছু নয়। ক্রমবর্ধমানভাবে এটা স্বতঃস্পষ্ট হয়ে উঠছে যে গত কয়েক দশক ধরে যাঁরা দুনিয়া চালাচ্ছেন, পুঁজিবাদের একটা টেকসই রূপকাঠামো সৃজন করা তাঁদের আসল অগ্রাধিকার নয়। বরং তাঁদের অগ্রাধিকার হল আমাদেরকে এ কথা বোঝানো যে পুঁজিবাদের চলতি আদলটাই একমাত্র বোধগম্য ব্যবস্থা; কাজেই এর কী সমস্যা আছে না-আছে তা প্রাসঙ্গিক নয়। ফলে, বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে আমরা সবাই ঘিরে বসে আছি, আর পুরো ব্যবস্থাটা ভেঙে পড়ছে।

এখন আমরা যা জেনেছি তা হল ১৯৭০ দশকের অর্থনৈতিক সংকট আসলে কখনোই চলে যায়নি। দেশের ভেতরে সস্তা ধারদেনা (ক্রেডিট) আর দেশের বাইরে ব্যাপক লুটতরাজ দিয়ে সংকটটাকে ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল। আর, এই লুটতরাজ চালানো হয়েছিল 'তৃতীয় বিশ্বের ঋণ-সংকট'-এর নামে। কিন্তু বিশ্বের দক্ষিণ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। 'বিশ্বায়ন-বদলাও আন্দোলন' শেষ পর্যন্ত বলতে গেলে সফল হয়েছে। পূর্ব-এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকা থেকে আইএমএফ বিতাড়িত হয়েছে, ঠিক এখন যেমন তা বিতাড়িত হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। পরিণামে, ঋণ-সংকট এখন তার নিজের ঘরে, মানে ইউরোপ আর উত্তর আমেরিকায়, ফিরে এসেছে। আর, তা পরিপূর্ণ হয়ে আছে ঠিক সেই একই মনোভঙ্গিতেঃ একটা অর্থকড়ি-সংকট ঘোষণা করো; এটাকে সামলানোর জন্য আপাত-নিরপেক্ষ টেকনোক্র্যাটদেরকে নিয়োগ করো; আর তারপর 'কৃচ্ছ্রতার' নামে মেতে ওঠো লুণ্ঠনের লাগামহীন আনন্দোৎসবে।

প্রতিরোধের যে আদল জেগে উঠেছে তার সাথে বৈশ্বিক ন্যায়বিচার আন্দোলনেরও উল্লেখযোগ্য রকমের মিল আছে। আমরা দেখছি পুরনো ধাঁচের পার্টি-রাজনীতিকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে। আমরা দেখছি মৌলিক পরিবর্তনমুখী বৈচিত্র্যকে সেই একইভাবে আলিঙ্গন করা হচ্ছে। আর, আমরা দেখছি নিচের থেকে গড়ে ওঠা গণতন্ত্রের নতুন নতুন কাঠামো উদ্ভাবনের ওপর সেই একই রকম গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে। যেটুকু আলাদা সেটা প্রধানত লক্ষ্যবস্তুতে। ২০০০ সালে এ আন্দোলন

পরিচালিত হয়েছে গোটা গ্রহজুড়ে গড়ে ওঠা নজিরবিহীন আমলাতন্ত্রসমূহের বিরুদ্ধে (ডব্লিউটিও, আইএমএফ, নাফটা)। এসব প্রতিষ্ঠানের কোনো গণতান্ত্রিক দায়বদ্ধতা ছিল না। স্রেফ ট্রান্সন্যাশনাল পুঁজির দাসত্ব করাই ছিল এগুলোর অস্তিত্বের কারণ। আর, ঠিক সেই একই কারণে এবারের এই আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে গ্রিস, স্পেন, এবং এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুরো রাজনৈতিক শ্রেণীটারই বিরুদ্ধে। এই হল সেই কারণ যেজন্য বিক্ষোভকারীরা এমনকি আনুষ্ঠানিক দাবিদাওয়া পেশ করতে পর্যন্ত প্রায়শই ইতস্তত করছেন, পাছে তা রাজনীতিবিদদের বৈধতার স্বীকৃতি বলে গণ্য হয়– যাঁদের বিরুদ্ধে তাঁরা প্রকাশ্য অবস্থান গ্রহণ করেছেন।

শেষ পর্যন্ত যখন ইতিহাস লিখিত হবে, তখন যদিও এমন হবার সম্ভাবনাই বেশি যে এই যাবতীয় হৈ-হট্টগোলকে (আরব বসন্ত থেকে শুরু করে) স্মরণ করা হবে মার্কিন সাম্রাজ্যের বিলুপ্তি সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা-তরঙ্গমালার প্রথম পর্ব হিসেবে। তিরিশ বছর ধরে লাগাতারভাবে সারবস্তুর তুলনায় প্রচারণাকে গুরুত্ব দিয়ে চলাটা এবং ভিন্নমতের রাজনৈতিক ভিত্তি গড়ে তুলতে পারে এমন যেকোনো কিছুকেই শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলাটা অবশ্য প্রতিবাদী তরুণদের ভবিষ্যৎ-প্রত্যাশাকে বিবর্ণ করে তুলতে পারে। আর, এটা পরিষ্কার যে তরুণ-যুবাদের পুরো একটা প্রজন্মকে দরকার হলে নেকড়ের মুখে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হলেও উদ্ভূত পরিস্থিতি থেকে প্রাপ্য লভ্যাংশের বেশিরভাগটা (যত বেশি সম্ভব) কেড়ে নিতে ধনীরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু ইতিহাস তাদের পক্ষে নয়।

ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলোর বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটাকে বিবেচনা করে দেখলে আমাদের ভালো হবে। এই বিলুপ্তির ফলে ধনীদের পক্ষে বিস্কুট-চানাচুরের সমস্তটাই হাতিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়েছে তা নয়, কিন্তু সম্ভব হয়েছে আধুনিক কল্যাণ-রাষ্ট্র সৃষ্টি করাটা। এবারের পালা থেকে কী বেরিয়ে আসবে আমরা তা সুনির্দিষ্টভাবে জানি না।

কিন্তু, মানবীয় কল্পনাপ্রতিভার ওপর শ্বাসরোধী যে ফাঁস গত ৩০ বছর ধরে চেপে বসে আসে, দখল-আন্দোলনকারীরা যদি শেষ পর্যন্ত তা ছিঁড়তে পারেন, যেমনটা তাঁরা পেরেছিলেন ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর-পরবর্তী প্রথম সপ্তাহগুলোতে, সবকিছুই তাহলে আবার আলোচনার টেবিলে উঠে আসবে। এবং সেটা হবে ওয়াল স্ট্রিটের এবং সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য শহরের দখল-আন্দোলনকারীদের তরফ থেকে আমাদের প্রতি দেখানো মহত্তম অনুগ্রহ– এতটা অনুগ্রহ আমাদেরকে আর কেউ করতে পারতেন না।

[উৎস: গার্ডিয়ান পত্রিকা ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০১১]

[http://www.guardian.co.uk/commentisfree/cifamerica/2011/sep/25/occupy-wall-street-protest]

ওয়াল স্ট্রিট বিদ্রোহ

....

ব খ তি য়া র আ হ মে দ

ভেবেছিলাম শুধু অনুবাদটা করেই এবারের মতো ক্ষ্যান্ত দিব। কিন্তু করতে করতে দেখলাম যা ভেবে লেখাটা অনুবাদ করতে নামা সেটা খোলাসা না করলে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ অনেক। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, প্রিয় বন্ধুর ভাষায়, আমার 'উচ্চশিক্ষার্থে পরলোক গমন' দশা অনেক বেশি বাংলা লেখার সুযোগ দেয় না, আর সেই সাথে নিজের বৈকল্য তো আছেই। তারপরও মূল লেখাটার সামনে অনুবাদকের এভাবে জুড়ে বসার কারণ ভাষা পরিসরে 'নৈরাজপন্থা' নিয়ে আলোচনার কিছু বিপদ আছে। পরিভাষাগত সংকট তো আছেই, খোদ 'নৈরাজ' নিয়ে আধুনিক নাগরিকের যে ইতিহাস-বিবর্জিত ধারণা সেটাও এই লেখার পাঠ অস্বস্তিকর করে তুলতে পারে। কিন্তু আমি নাগরিকের ধারণা পাল্টানোর পুরা দায়িত্ব নিতে অক্ষম, এবং এটাকে কোনো এক ব্যক্তির একার কাজ বলে মনেও করি না। ফলে লেখাটার সাথে নিজের সম্পর্ক আর পাঠ-অভিজ্ঞতার কিছু এলোমেলো বিবরণ ছাড়া অন্য কোনো ভাবে এই দায় মেটানোর উপায় নেই।

গত বছর পাঁচেক ধরে আমি একটা অস্ট্রেলীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ পরিবর্তন বিষয়ক গবেষণা কেন্দ্রের গবেষক-শিক্ষার্থী। 'মাল্টিডিসিপ্লিনারি ও মাল্টিকালচারাল' এই গবেষণা কেন্দ্রের করিডোরে আমার পরিচয় আমি বাংলাদেশি নৃবিজ্ঞানী। তো, এখানে ২০০৭ সালের দিকে সমসাময়িক সামাজিক আন্দোলন বিষয়ে লেখালেখি ঘাঁটতে গিয়ে ভীষণ বদ-মেজাজি এক লেখার মুখোমুখি পড়ে যাই। এক মার্কিন নৃবিজ্ঞানী, ডেভিড গ্রেয়বার তার নাম। The Globalization Movement : Some Points of Clarification শিরোনামের লেখার প্রথম বাক¨, "A great deal of nonsense has been written about the so-called anti-globalisation movement"। লেখাটায় তার ক্ষুরধার বিশ্লেষণের বিষয় 'বিশ্বায়ন আন্দোলন', যাকে কর্পোরেট মিডিয়া 'বিশ্বায়ন-বিরোধী আন্দোলন' নামে প্রচার করে, সেখানে মিডিয়া ও একাডেমি তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা। পিয়ের বরদিউ'র মতো, তিনি মনে করেন সেই আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমাজবিদ্যার পণ্ডিতদের ভূমিকা, তার সোজা কথায় 'ন্যাক্কারজনক'। সেই সব এন.জি.ও.-পুষ্ট অধ্যাপক, যারা বছরের পর বছর অস্তি ত্বহীন সব সামাজিক আন্দোলন বিষয়ে বস্তা বস্তা কাগজ পয়দা করেছেন, তারা সবাই সিয়াটলের মতো বিদ্রোহ নিয়ে কবরের নীরবতা পালন করছেন। তিনি শুধু অভিযোগ

তুলে ক্ষ্যান্ত দেন নাই। একজন খাঁটি নৃবিজ্ঞানীর মতো এই আন্দোলনগুলোতে নিজের সক্রিয় অংশীদারি অভিজ্ঞতা দিয়ে ব্যাখ্যা করেছেন কর্পোরেটের বিরুদ্ধে মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত শান্তিপূর্ণ বিদ্রোহের বয়ান। লেখাটি পড়তে পড়তে ২০০৩ সালে, আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে মাস্টারির প্রথম বছরে লেখা এক অসহায় জবানবন্দির স্মৃতি জেগে উঠেছিল। কিন্তু নৃবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আমি ২০০৭-এ আরেকটু উপরের ক্লাসে পড়ি, ফলে এই মিল আমাকে অবাক করেনি। নৈরাজপন্থী অধ্যাপক ব্রায়ান মার্টিনের ক্লাস করতে গিয়ে আমি তখন 'হুইসেল ব্লোয়িং' কথাটার মানে বুঝে গেছি, মানুষের ইতিহাসের ভাঁজে ভাঁজে স্বরাজের সুন্দরকে চিহ্নিত করা একটু একটু করে শিখছি। যা হোক, আমি গ্রেয়বারের পিছু ছাড়লাম না। লাইব্রেরি হাতড়াতে গিয়ে পেয়ে গেলাম আরেকটা চটি বই, "Fragments of an Anarchist Anthropology", পড়তে গিয়ে দেখি এখানে তিনি বোঝার চেষ্টা করছেন রাষ্ট্রবিহীন সমাজ যে খুবই সম্ভব এবং এটাই যে মানব-প্রকৃতির সাথে একমাত্র সংগতিপূর্ণ ক্ষমতাবিন্যাস, বার বার এই অমূল্য-অপরূপ সত্যের মুখোমুখি হয়েও কেন নৃবিজ্ঞানীরা মুখে কুলুপ এঁটে থেকেছেন। মনে পড়ছে সবচেয়ে মজার উদাহরণ ছিল র‍্যাডক্লিফ ব্রাউন। নৈরাজপন্থার প্রতি ঝোঁকের কারণে বন্ধুরা তাকে ডাকতেন 'এনার্কো ব্রাউন' নামে। কিন্তু যেই তিনি কেম্ব্রিজের নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান হলেন, 'স্যার' হলেন, মুখ দিয়ে নৈরাজ শব্দটি আর কেউ কোনোদিন শুনতে পায়নি। যদিও তার আজীবন গবেষণার বিষয় থেকেছে আন্দামান দ্বীপের নৈরাজ্যিক সমাজগুলোর রাজনৈতিক বিন্যাস, *The Andaman Islanders*, এক অসাধারণ এথনোগ্রাফি।

যাইহোক, আমার নিজের পিএইচ.ডি. গবেষণার বিষয় বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রান্তসীমা পার্বত্য চট্টগ্রামে পরিচয় ও উন্নয়নের রাজনীতি। পিয়েরে ক্লস্ত্রে আর পিয়েরে বরদিউ নামের দুই ফরাসি নৃবিজ্ঞানীকে পড়ার চাপেই আমি তখন জেরবার, তার ওপর এসে জুটলেন দুই আমেরিকান, জেমস স্কট আর এই ডেভিড গ্রেয়বার, আমার নিজের থিসিস লেখা প্রায় লাটে উঠল। কিন্তু একই সাথে বদলে যেতে থাকল নৃবিজ্ঞান নিয়ে আমার নিজের চিন্তা। একের পর এক ডেডলাইন মিস করতে থাকলাম, সুপারভাইজারের হাসি শুকনো থেকে শুকনোতর হতে থাকল, আর আমি নৃবিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে আগের দেড় যুগের বহু শিক্ষা অশিক্ষা করার কাজে লেগে গেলাম। এখনও লেগে আছি, কিন্তু বাস্তব জ্ঞান খানিকটা ফিরেছে, পিএইচ.ডি. শেষ করতে চাই।

এই সেপ্টেম্বরে যখন ওয়াল স্ট্রিট বিদ্রোহ শুরু হল, অনেকেই হয়তো খেয়াল করেছেন, মিডিয়া প্রথমে পরিষ্কার চেপে যাওয়ার চেষ্টা করল। পরে যখন দেখা গেল এটা আসলে চেপে রাখবার মতো জিনিসের চেয়ে বহুগুণ বড়, তখন শুরু হল এ নিয়ে আবোল-তাবোল সংবাদ পরিবেশন। সেই বিস্তারে যাওয়ার সুযোগ আমার নেই কিন্তু একটা জিনিস মনে হচ্ছিল আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও মিডিয়ার অনেকের কাছে, এবং সাধারণ্যের কাছে আন্দোলনটা ভীষণ অস্পষ্ট এবং ব্যাখ্যাতীত ব্যাপার মনে হচ্ছিল।

মাসের পর মাস আন্দোলন চলছে কিন্তু এখনও কোনো হিরোর নাম জানা গেল না, কোনো নির্দিষ্ট দাবি নেই, কোনো নেতা নেই, এ কেমন আন্দোলন? মিডিয়াও গলদঘর্ম হতে থাকল কিন্তু খুব সুবিধা করা গেল না। কিন্তু সামাজিক আন্দোলনের পেশাদার গবেষক হিসেবে আমার অবাক হওয়ার অনুমতি নেই। কাজেই আমি গুগলে সোজা ডেভিড গ্রেয়বার নামে খোঁজ লাগলাম, দেখলাম মামা ঠিকই আছে গার্ডিয়ানে, নিজের মতো নিজের কাজটা করে যাচ্ছে। এর মধ্যে হঠাৎ দেখি 'বিজনেসউইক' ম্যাগাজিন অক্টোবরের ৩১ তারিখের সংখ্যায় অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট নিয়ে তাদের বিশেষ সংখ্যার শিরোনাম দিয়েছেন Who is Behind the Mask? খানিকটা চমকে, মনে সন্দেহ নিয়ে সেই মুখোশ উল্টালাম, দেখি ডেভিড গ্রেয়বারের নাম। শংকা আরো বেড়ে গেল কারণ আমি জানি এই বিদ্রোহে তো কারো হিরো হওয়ার কথা নয়। লেখাটা পড়ে ভুল ভাঙল। আমার ধারণা গ্রেয়বারকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আপনি এখানে কী করছেন, উত্তর হবে নৃবিজ্ঞানী হিসেবে নিজের সামাজিক ভূমিকা পালন করছি। আর লেখাটা হচ্ছে এক নৃবিজ্ঞানীকে নিয়ে, এথনোগ্রাফিক ধারায় অনুপ্রাণিত একটি রচনা। শিবের গীত লম্বা হয়ে যাচ্ছে, কাজেই কিছু জরুরি আলাপ দিয়ে শেষ করি।

লেখাটি পড়ার গুরুত্বপূর্ণ একটা মানসিক প্রস্তুতি হওয়া উচিত 'নৈরাজ' শব্দটার সরকারি মানের চক্কর থেকে বেরুনো।

নৈরাজপন্থা আসলে কী? নৈরাজপন্থা আসলে কোনো রাজনৈতিক মতবাদ নয়। অন্য এক লেখায় গ্রেয়বার বলেছিলেন, "মার্ক্সবাদ হচ্ছে বিপ্লবের কৌশল বিষয়ক তাত্ত্বিক ও বিশ্লেষণধর্মী ডিসকোর্স আর নৈরাজপন্থা হচ্ছে বিপ্লবী চর্চার নৈতিকতা বিষয়ক ডিসকোর্স"।

এই অনুবাদ, বা মূল লেখার লক্ষ্য ডেভিড গ্রেয়বারকে হিরো হিসেবে উপস্থাপন নয়। বছর পাঁচেক ধরে তার দূরবর্তী কিন্তু মনোযোগী ছাত্র হিসেবে জানি যে আইডিয়াটা উনিও পছন্দ করবেন না। বরং লেখাটি রাজনৈতিক আন্দোলন বা এর নেতৃত্ব যে কর্তৃত্ববিহীনও হতে পারে তার একটা কেসস্টাডি হিসেবে পড়া যেতে পারে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র যে একটি বাস্তব, এবং প্রয়োগযোগ্য, এবং অর্জনযোগ্য ব্যাপার, ওয়াল স্ট্রিট বিদ্রোহ যে তার জলজ্যান্ত উদাহরণ, এটা অনুধাবন করা যেতে পারে এই লেখা থেকে। কিন্তু ওয়াল স্ট্রিট বিদ্রোহকে নৈরাজপন্থী বিদ্রোহ বলার উদ্দেশ্য এটার গায়ে কোনো রাজনৈতিক মতবাদের ব্রান্ড লাগানো নয়, কারণ আগেই বলেছি, নৈরাজপন্থা কোনো রাজনৈতিক মতবাদ নয়, খোদ রাজনীতি প্রশ্নে একটি নৈতিক অবস্থানের নাম।

অন্যদিকে নৃবিজ্ঞানকে একতরফাভাবে একটি বিপ্লবী/বেপরোয়া বিজ্ঞান হিসেবে হাজির করাও এর উদ্দেশ্য নয়। রাষ্ট্রব্যবস্থা-বিবর্জিত সমাজ সম্পর্কে মানববিদ্যাগুলোর মধ্যে নিঃসন্দেহে নৃবিজ্ঞানই সবচেয়ে বেশি ভেবেছে কিন্তু সেই ভাবনার বড় অংশই কানার হস্তীদর্শন... যেখানে রাষ্ট্র নেই সেখানে তাঁরা কাল্পনিক আদিম বর্বরতা দেখেছেন, আবার যেখানে উপনিবেশিক রাষ্ট্র পুরাদমে হাজির থেকে রাষ্ট্রবিহীন

রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলোকে ধ্বংস করেছে সেখানে আধুনিক রাষ্ট্রের জলজ্যন্ত উপস্থিতিকেও তাঁরা উপেক্ষা করে গেছেন। উদাহরণ হতে পারে ইভান্স প্রিচার্ডের ‘দি নুয়ের’। নুয়েরদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা নিয়ে রাজনৈতিক নৃবিজ্ঞানের এই ধ্রুপদী এথনোগ্রাফিটিতে তিনি সব বলছেন শুধু নুয়েরদের রাজনৈতিক ব্যবস্থা যে আসলে রাষ্ট্রের বিপরীতে একটি বাস্তব, যৌক্তিক এবং নৈরাজ্যিক ব্যবস্থা এটা বাদে। আবার একই সাথে এই গোত্রগুলোর চারপাশ থেকে চেপে আসা আধুনিক রাষ্ট্রের ভৌতিক উপস্থিতিকেও তিনি নিজের লেখায় অনুপস্থিত রেখে দিচ্ছেন। আর সবচেয়ে বড় যে ঝামেলাটা উপনিবেশিক (উপনিবেশ কিন্তু কোনো মৃত অতীত নয়) যুগের নৃবিজ্ঞানীরা বাধিয়েছেন তা হচ্ছে রাষ্ট্রবিহীন সমাজকে আদি, আদিম, এথনিক, ট্রাইবাল, উপজাতি ইত্যাকার নামে ডেকে মানুষের ইতিহাসকে বিবর্তনের অমোঘ সরলরেখায় সাজিয়ে দেখানো যে রাষ্ট্র মানুষের ইতিহাসের অবিকল্প/অনিবার্য নিয়তি, এটাই একমাত্র কাম্য, এটাই স্বাভাবিক, এটাই সভ্যতার তথা মানুষের রাজনৈতিক ইতিহাসের শেষ গন্তব্য। ফলে নৃবিজ্ঞানও জান্তে বা অজান্তে বৃহদাংশে সেই কাণ্ডজ্ঞানের অংশ হয়ে গেছে যা মানুষকে ডাণ্ডা ও দণ্ড ছাড়া সভ্য ভাবতে পারে না।

অহিংস নাগরিক বিদ্রোহ, ওয়াল স্ট্রিট বিদ্রোহের যেটা মূল রাজনৈতিক কৌশল, সেটাকেও অদ্বিতীয়, অবিকল্প এবং সার্বজনীন নৈরাজ্যিক রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে ভাবাটাও ঠিক নয়। আসলে নৈরাজের ধারণা মানুষের অবচেতনের এমন গভীরে প্রোথিত যে সেটাকে শুধু তার রাজনৈতিক কৌশলের নিরিখে বুঝতে যাওয়াটাও বোকামি। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বা ঢাকা শহরে অনশন একটি কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে কারণ সেখানে মিডিয়া আছে, জনতা আছে, রাষ্ট্রের আইনি বাধ্যবাধকতা আছে। কিন্তু ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলে রাষ্ট্রের হাতে নিষ্পেষিত আদিবাসীরা অনশন করে কোনো রাজনৈতিক অর্জনে পৌঁছাতে পারবে না। আদিবাসীদের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, স্বরাজের আকাঙ্ক্ষা সেখানে তাই মাও সে তুং-এর বন্দুক হয়ে গর্জে ওঠে।

ডেভিড গ্রেয়বারকে নিয়ে আমার প্রধানত প্রেমানুভূতি হচ্ছে তিনি অতি সাধারণ, স্বাভাবিক, ক্ষুদে একজন মানুষ যিনি নিজের ছোট্ট কোণটিতে নিজের ছোট্ট কাজটা ঠিকঠাক মতো করবার চেষ্টা করেন। ওয়াল স্ট্রিট বিদ্রোহের মতো কাণ্ড ঘটানোর চতুর্থ দিনে বিরহকাতর প্রেমিক হয়ে ছুটে যান নিউইয়র্ক থেকে অস্টিনে, বদমেজাজের জন্য চাকরি হারান, পঞ্চাশ বছর বয়সে এসে ফেল মারেন ড্রাইভিং টেস্টে। ওয়াল স্ট্রিট বিদ্রোহ থেকে সামাজিক আন্দোলনের ছাত্র হিসেবে আমার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা হল যেভাবে অরাজপন্থা অতি সাধারণ সব মানুষকেও ইতিহাসে তার ভূমিকা পালনের ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়, যেভাবে ব্যক্তির আপাত সাধারণ গুজবকেও ইতিহাস নির্মাণের কাজে লাগায়, যেভাবে ইতিহাসকে হিরোদের হাত থেকে উদ্ধার করে ছোট্ট ছোট্ট সাধারণ মানুষদের হাতে তুলে দেয়। অরাজপন্থা এ কারণেই আজকের সময়ের চেয়ে সম্ভাবনাময় রাজনৈতিক অবস্থান কারণ তা রাজনীতির নামে ব্যক্তিকে সমাজের বোঝা

না বানিয়েও তার সমস্ত সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে পারে মুক্তির লড়াইয়ে। ব্যক্তিমানুষও মুক্তি পায় কর্তৃত্বের/নেতৃত্বের অভিশাপ থেকে। গ্রেয়বারের একটা ছবি খুঁজে টানিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল নোটে, পরে ভুল বোঝাবুঝির ঝুঁকি বিবেচনায় বাদ দিলাম। থাক-না ছোট্ট মানুষেরা অনিন্দ্যসুন্দর সব মুখোশের আড়ালেই।

কিছু টেকনিক্যাল টার্ম আছে, আমি ফুটনোট দেয়াসহ নোটটার ঘষামাজা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করব। আর বানানের বিষয়ে নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়া চাওয়া ছাড়া আপাতত গত্যন্তর নেই।

এখান থেকে অনুবাদ শুরু...

ডেভিড গ্রেয়বার : ওয়াল স্ট্রিট দখল আন্দোলনের অ্যান্টি-লিডার

পরিচিত হউন এক নৃবিজ্ঞানী, রাজনৈতিক কর্মী, ও নৈরাজ্যবাদীর সাথে যিনি এক দুর্ভাগা মিছিলকে একটি বৈশ্বিক প্রতিরোধ আন্দোলনে রূপান্তরিত হতে সহায়তা করেছেন।

লিখেছেন : ড্রেকবেনেত্তে

ডেভিড গ্রেয়বার বলতে পছন্দ করেন যে এ বছর আসলে তার লক্ষ্য ছিল তিনটা: নিজের বইয়ের বিক্রিবাট্টা বাড়ানো, গাড়ি চালানো শেখা, এবং বিশ্বব্যাপী একটা বিপ্লব শুরু করা। প্রথম কাজটা ভালোই চলছে, দ্বিতীয়টা কঠিন লাগছে, এবং তৃতীয়টার ক্ষেত্রে,অগ্রগতি ভালো।

গ্রেয়বার পঞ্চাশ বছর বয়স্ক নৃবিজ্ঞানী কেউ কেউ মনে করেন নিজের প্রজন্মের উজ্জ্বলতমদের একজন খ্যাত হয়েছেন বিনিময় ও মূল্যব্যবস্থা নিয়ে উদ্ভাবনী তত্ত্বের জন্য, 'ইরোকুইজ ওয়ামপুম' বা 'কোয়াকিটল পোটলাচ'র মতন নৃবৈজ্ঞানিক প্রপঞ্চ ঘেঁটে। মার্কিন নাগরিক। এখন শিক্ষকতা করেন ইউনির্ভাসিটি অফ লন্ডনের গোল্ডস্মিথ কলেজে। নৃবিজ্ঞানী ছাড়াও তিনি একজন নৈরাজ্যবাদী এবং আমূলপন্থী সংগঠক, গত কয়েক দশকের অনেকগুলো বড় বামপন্থী প্রতিরোধ আন্দোলনের লড়িয়ে, কুইবেক সিটি এবং জেনোয়া, নিউইয়র্ক এবং ফিলাডেলফিয়াতে রিপাবলিকান জাতীয় কনভেনশনে বিক্ষোভ, ২০০২ সালে নিউইয়র্কে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সভায় বিক্ষোভ এবং সর্বশেষ এ বছরের গোড়ায় লন্ডনের বিখ্যাত ছাত্রবেতনবিরোধী বিক্ষোভে সক্রিয় ছিলেন। এই গ্রীষ্মে গ্রেয়বার ছিলেন ছোট্ট একদল রাজনৈতিক কর্মীদের একজন যারা প্রথমে নিঃশব্দে পরিকল্পনা করেছেন, তারপর ঢোল পিটিয়ে দখল করেছেন লোয়ার ম্যানহাটনের জুকত্তি পার্ক, তারপর অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট নামে এক আদলহীন বৈশ্বিক আন্দোলনের পাদ-প্রদীপ হয়ে উঠেছেন।

গ্রেয়বারকে এই আন্দোলনের একজন নেতা বলা ভুল হবে, কারণ তাদের মধ্যে সার্বক্ষণিক চর্চিত কর্তৃত্বহীনতার দর্শন-নেতৃত্বের ধারণাটাকেই বিদ্ঘুটে মনে করে।

তিনি আন্দোলনের কোনো মুখপাত্রও নন, কারণ এই আন্দোলন এখন পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট দাবিদাওয়া পেশ করতে অস্বীকার করেছে। এমনকি, জুকত্তি পার্কেও তার নাম খুব বেশি লোকে জানে না। কিন্তু তিনি এই দলটির সবচেয়ে সুসংহত কণ্ঠস্বরগুলোর একজন যিনি আন্দোলনের আশা-নিরাশাকে ফ্রেমে তুলে ধরতে পারেন, এই ঐতিহাসিক মুহূর্তটির গভীরতর বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে। "আমরা যা দেখছি তা হচ্ছে এক নতুন আমেরিকান প্রজন্মের বিদ্রোহী আত্মসত্তার সূচনা, এমন এক প্রজন্ম যারা দেখতে পাচ্ছে পড়াশুনা শেষ করে তাদের সামনে কোনো চাকরি নেই, কোনো ভবিষ্যৎ নেই, আছে শুধু বিশাল অংকের ক্ষমাহীন ঋণের বোঝা।" সেপ্টম্বরের ২৫ তারিখে গার্ডিয়ানে লেখা এক উপসম্পাদকীয়তে তিনি লিখেছিলেন "এটা কি আসলে অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার যে এই তরুণেরা তাদের ভবিষ্যৎ চুরি-করা মহাজনের সাথে কোনো সংলাপে রাজি হবে না?"

গ্রেয়বারের রাজনৈতিক ধ্যানধারণা কাঠামো পেয়েছে বৈশ্বিক ন্যায়বিচার আন্দোলনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, কিন্তু একই সাথে তা ঋদ্ধ হয়েছে তার জীবনের আরেক অংশ, নৃবিজ্ঞানী হিসেবে তার কাজের মধ্যদিয়ে। গ্রেয়বারের সর্বশেষ বই, *ঋণের প্রথম ৫,০০০* বছর প্রকাশিত হয়েছে ওয়াল স্ট্রিট বিদ্রোহের দুই মাস আগে। বইটা টাকা ও বাজারব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের একটি বিকল্প ইতিহাস; বিশাল বিস্তৃতি, গভীর বোঝাপড়া, এবং চিন্তায় নাড়া দেয়ার মতো এক কাজ। পশ্চিম আফ্রিকার টিভ জনগোষ্ঠী থেকে শুরু করে প্রাচীন সুমেরীয় থেকে মধ্যযুগের আয়ারল্যান্ড থেকে আধুনিক আমেরিকা পর্যন্ত অজস্র সমাজের বরাত দিয়ে তিনি দেখাচ্ছেন, যেভাবে ঋণের প্রতি মানুষের একটা অনিশ্চিত আচরণ কাজ করে, সেভাবে ঋণ একই সাথে বাধ্যবাধকতা ও পাপ হিসেবে বিরাজ করে, সেভাবে একই সাথে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং শোষণ-নির্যাতনের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। এই ইতিহাসের পথ পাড়ি দিতে দিতেই তিনি এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন, কেন ইতিহাসজুড়ে বেশির ভাগ মানুষই ঋণ শোধ করা একটি নৈতিক দায়িত্ব মনে করে কিন্তু আবার একই সাথে মনে করে যে টাকা ধার দেয়া যাদের পেশা তারা শয়তান।

গ্রেয়বারের যুক্তিতর্কের ধারা তাকে সরাসরি অর্থশাস্ত্রের মূল ধারার মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, এবং শাস্ত্রটি তাকে, মোটা দাগে, অবজ্ঞা করেছে। কিন্তু বইটি সাধারণ পাঠকদের মাঝে জনপ্রিয় হওয়ার জন্য এর চেয়ে মাহেন্দ্রক্ষণ আর কিছু হতে পারে না। তার লেখালেখি তিনি যে আন্দোলনটার সূচনার সাথে জড়িত সেটাকে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামো দিয়েছে, একে একটা ঐতিহাসিক গতিধারার সাথে যুক্ত করেছে। ওয়াল স্ট্রিট বিদ্রোহীদের অস্পষ্ট দাবিদাওয়া দুইটা বিষয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে, এক. রাজনীতিতে টাকার প্রভাব; দুই. ঋণ বন্ধক, ক্রেডিট কার্ড, শিক্ষাঋণ এবং তার সাথে বৃহৎ ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানগুলো এবং বড় ব্যক্তি-ঋণগ্রহীতাদের ...... ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক ধসের সময় যেভাবে আপ্যায়ন করা হয়েছে তার তুলনা।

"ও অনেক গভীর করে ভাবতে পারে, ও বরাবরই আন্দোলন আর বিপ্লবের ছাত্র", বলেছিলেন কালে লাসন, ভ্যাঙ্কুভারের কর্পোরেটবিরোধী ম্যাগাজিন *অ্যাডবাস্টার্সে*র প্রতিষ্ঠাতা। সে হচ্ছে ওই টাইপের লোক যে বলবে, "আমরা যার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি সেটা কি ১৯৬৮ সালের মতো নাকি ফরাসি বিপ্লবের মতো?"

গ্রেয়বার এটা ব্যাখ্যা করেন আরো বড় এক গল্পের অংশ হিসেবে : পুরা ইতিহাস জুড়েই ঋণ আসলে নাগরিকদের নিয়ন্ত্রণ এবং তাঁদের সম্পদ হরণের রাষ্ট্রীয় হাতিয়ার (সাধারণত যুদ্ধে খরচ করবার জন্য) এবং ইতিহাসে যখনই যথেষ্ট পরিমাণ মানুষ যথেষ্ট পরিমাণ ঋণে নিমজ্জিত হয়েছেন, তখনই সাধারণত কোনো না কোনো ধরনের বিদ্রোহ হয়েছে।

গ্রেয়বার ছোট্ট-খাট্ট অস্থির ধরনের মানুষ, নীল চোখ, কিশোরসুলভ ফ্যাকাসে মুখ। স্নাতক শিক্ষার্থীদের মতন পোশাক-আশাক পড়েন, হড়বড় করে কথা বলেন, লম্ব যুক্তিমালার ফাঁকে ফাঁকে রাগে ফেটে পড়েন, ছেঁড়াখোঁড়া হাসি দেন, দম নেওয়ার জন্য আবার একটু থামেন। কারো চোখে খুব একটা চোখ রাখেন না। একটা চিন্তা শেষ করার পর হাঁসের মতো মাথা ঝাঁকান, ভুরু দিয়ে ধনুক বানান, যেন তিনি এইমাত্র একটা হালকা কিন্তু আশংকাজনক শব্দ শুনতে পেয়েছেন।

ওয়াল স্ট্রিট বিদ্রোহ শুরু হওয়ার চারদিন পর থেকে কয়েক সপ্তাহ গ্রেয়বার ছিলেন টেক্সাসের অস্টিনে, দীর্ঘ মাঠ-গবেষণা শেষে মেক্সিকো থেকে ফেরা সহ-নৃবিজ্ঞানী বান্ধবীর সাথে সময় দিতে। সেখানেও খানিকটা জড়িয়ে ছিলেন অকুপাই-বিদ্রোহের দুনিয়ার বহু জায়গায় মতো স্থানীয় সংস্করণ 'অকুপাই অস্টিনে'।

এই গ্রীষ্মটা গ্রেয়বার শুরু করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাবাটিকেল ছুটি নিয়ে। লন্ডন থেকে নিউইয়র্কে এসে যেখানে প্রায়শই আড্ডা দিতে যেতেন ১৬ বিভার নামের একটা 'আঁতেল'দের আখড়ায়। এটা ছিল ওয়াল স্ট্রিটের পাশেই বুদ্ধিবৃত্তিক অ্যাক্টিভিস্টদের একটা আখড়া যেখানে লোকজন শব্দার্থবিজ্ঞান, ইন্টারনেট হ্যাকিং বা আদিবাসী সংগ্রাম নিয়ে কথা বলে। আরো অনেক আমেরিকান অ্যাক্টিভিস্টদের মতোই গ্রেয়বারও গভীর নাড়া খেয়েছিলেন মিশরীয় জনতার তাহরির চত্বর দখল, এবং মাদ্রিদের কেন্দ্র দখল করা 'ইন্ডিগনাদোস'দের দেখে। মধ্য-জুলাইয়ের দিকে তিনি *অ্যাডবাস্টার্সে* একটা ছোট নিবন্ধ লেখেন এরকম একটা উত্থান পশ্চিমে ঘটানোর ব্যবস্থা করা যায় সে নিয়ে। গরমের বেশির ভাগ সময়টা জুড়ে ১৬ বিভারের আলোচনা ঠিক এই প্রশ্নকে ঘিরেই ঘুরপাক খায়। যখন 'অপারেশন এম্পায়ার স্টেট রেবিলিওন' নামের স্থানীয় একটি সংগঠন জুনের ১৪ তারিখে জুকত্তি পার্কে প্রথম দখল কর্মসূচির ডাক দেয়, মাত্র চার জন লোক হাজির হয়েছিল সেখানে।

জুলাই ১৩ তারিখে *অ্যাডবাস্টার্স* তাদের আহ্বান জানায় ওয়াল স্ট্রিট দখলের, দিন ঠিক করা হয় দুই মাস পরের, সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখ। দিন ঠিক করা আর প্রচার চালানোই ছিল আন্দোলনে ম্যাগাজিনটির মূল সম্পৃক্তি। 'নিউইয়র্কারস এগেইন্সট

বাজেট কাট’ নামের একটি দল, কিছু ছাত্রকর্মী, এবং নগরীর গরিব পাড়া-মহল্লার কিছু নেতা এগিয়ে এলেন বাকি কাজকর্ম সামলানোর জন্য। জুন ও জুলাইয়ের তিন সপ্তাহজুড়ে শহরের বাজেট কাট এবং ছাঁটাইয়ের প্রতিবাদে তাঁরা ক্যাম্প গেড়ে বসে থাকলেন সিটি হলের সামনের রাস্তার ওপারে, একটা ছোট্ট তাঁবুর শহর বানিয়ে যার নাম দিয়েছিলেন তাঁরা ব্লুম্বার্গভিল। তারপর তাঁদের মনে হল এই একই কাজ করা যায় ওয়াল স্ট্রিটেও। *অ্যাডবাস্টার্সের* সাথে কথা বলে তাঁরা একটি ‘সাধারণ্যের সমাবেশ’ বা ‘পিপল’স জেনারেল এসেম্বলি’র ডাক দিলেন ‘যে কোনো ধরনের কাটছাঁট ও কৃচ্ছ্রতা সাধনের’ বিরুদ্ধে এবং পরিকল্পনা আঁটতে লাগলেন সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখের ‘দখল’ কর্মসূচি নিয়ে।

সমাবেশটা হওয়ার কথা ছিল শহরতলীর ম্যানহাটন পার্কের বোউলিং মাঠে যেখানে এই আন্দোলনের কারণে ইতিমধ্যে খ্যাতি পাওয়া নুড়িপাথরে খুব দাবড়িয়ে তেড়ে আসা ষাঁড়ের ভাস্কর্যটি দাঁড়িয়ে আছে। গ্রেয়বার এই সমাবেশের খবর পেয়েছিলেন এবং আগস্টের ২ তারিখ বিকেলে তিনি বোউলিং মাঠে যান দুই বন্ধুকে নিয়ে, জিওর্জিয়া সাগ্রি নামের এক গ্রিক নৈরাজ্যপন্থী শিল্পী এবং সাবু কোহসো নামের এক জাপানি এক্টিভিস্ট (যিনি গ্রেয়বারের বইয়ের জাপানি অনুবাদকও)।

‘সাধারণ্যের সমাবেশ’ বা ‘পিপল’স জেনারেল এসেম্বলি’ কথাটি একজন নৈরাজপন্থীর কাছে বিশেষ অর্থ ও তাৎপর্য বহন করে। একভাবে ধরতে গেলে এটা সমসাময়িক নৈরাজপন্থার একটি কেন্দ্রীয় ধারণা যেটি দাঁড়িয়ে আছে এই ধারণার ওপর যে বলপ্রয়োগ-নির্ভর যে কোনো বিপ্লবী আন্দোলনই নিপীড়নমূলক সমাজেরই জন্ম দেয়। ‘সাধারণ্যের কেবলমাত্র সমাবেশ’ হচ্ছে খুবই সুচিন্তিত সতর্কতায় পরিচালিত একটি যৌথ আলোচনা পদ্ধতি যার মাধ্যমে সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, কেবলমাত্র গুটিকতক নেতার মাধ্যমে নয়, সংখ্যাগুরুত্বের জোরে নয়, যৌথ-মিমাংসা বা কনসেন্সাসের মাধ্যমে। অমীমাংসিত বিষয়গুলো তুলে দেয়া হয় জমায়েতের মধ্যেই ছোট ছোট ওয়ার্কগ্রুপের হাতে, কিন্তু শেষতক সিদ্ধান্ত হবে সর্বসম্মতি ক্রমে, এমনকি জমায়েতের সংখ্যা কয়েক হাজার ছাড়িয়ে গেলেও। আপাতদৃষ্টিতে এটা খুব কঠিন সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া হতে পারে, কিন্তু ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলন যে অভিনব ঘটনাগুলো ঘটিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে সাধারণ্যের সমাবেশকে বিশালকায় জনস্রোতের মধ্যেও কার্যকর একটি পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণ করা, এবং বিদ্রোহের স্বতন্ত্র সব চিহ্ন-ভাষা উদ্ভাবন করা যা ব্যবহার করে যে কোনো অংশগ্রহণকারীই সরাসরি প্রশ্ন তুলতে, সমর্থন দিতে বা অসম্মতি জানাতে, এমনকি নির্জলা বিরোধিতা করতে পারেন।

কিন্তু গ্রেয়বার ও তার বন্ধুরা যখন আগস্টের দুই তারিখের সমাবেশে হাজির হলেন, তারা আবিষ্কার করলেন যে আয়োজনটা যত-না ‘সাধারণ্যের সমাবেশ’ তার চেয়ে বেশি একটা প্রথাগত মিছিল যা সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে কিছু পূর্বনির্ধারিত দাবিদাওয়া নিয়ে ওয়াল স্ট্রিট অভিমুখে যাত্রা করবে (যার একটি ছিল ‘প্রাইভেট ও পাবলিক খাতে গণ-

কর্মসংস্থান কর্মসূচি', এবং অন্যটি ছিল 'নিপীড়ন ও যুদ্ধের অবসান')। নৈরাজপন্থার পরিভাষায়, আয়োজনটা পরিচালিত হচ্ছিল 'উলম্বিক' ভাবে, 'আনুপূর্বিক' সংগঠনের মধ্যে, গ্রেয়বার ও তার বন্ধুরা যেমন আশা করেছিলেন সে রকম আনুভূমিক ভাবে নয়, এবং এটা দেখে গ্রেয়বার আর সাগ্রি ভীষণ ক্ষেপে গেলেন।

এরপর যা ঘটল তা যেন নৈরাজপন্থার একটি শিক্ষণীয় গল্প। কোহসোকে সাথে নিয়ে এই দুইজন আরো কিছু লোকজন জুটিয়ে ভিন্নমত আর অসন্তুষ্টি জানিয়ে চলে এলেন পার্কের আরেক কোণে এবং নিজেদের মতো করে 'সাধারণ্যের সমাবেশ' শুরু করলেন, ১৭ সেপ্টেম্বরের কর্মসূচির পরিকল্পনা শুরু করলেন। শুরুতে ডজনখানেক লোক থাকলেও আস্তে আস্তে এপাশে লোক বাড়তে থাকল, তাদের র‍্যালিতে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আয়োজকদের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও। এই দড়ি টানাটানি চলল সন্ধ্যার আগ পর্যন্ত, কিন্তু শেষতক বোউলিং মাঠের অবশিষ্ট ৫০ জনের মতো জমায়েতের সবাই যোগ দিলেন বিদ্রোহের ভিতরের বিদ্রোহীদের 'সাধারণ্যের সমাবেশ'-এ।

"ঐ মিছিলের আয়োজকরাও শেষ পর্যন্ত যোগ দিয়েছিলেন আমাদের সাথে", স্মৃতিচারণ করছিলেন কোহসো। "তারপর সবাই মিলে অনেক অনেক রাত পর্যন্ত আমরা পরিকল্পনা করেছি আমাদের একটি কমিটি দরকার সে নিয়ে"।

যদিও পরের কয়েক সপ্তাহের প্রস্তুতি বাকি ছিল, কিন্তু সেদিন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিজয় অর্জিত হয়েছিল। ঘটনাটা আনুভূমিকভাবে পরিচালনা, এবং সে অনুযায়ী যা যা করা প্রয়োজন তা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া। তার মধ্যে অন্যতম একটা সিদ্ধান্ত ছিল কোনো নেতা, এমনকি পুলিশের সাথে দেনদরবারকারী পর্যন্ত না-রাখা, প্রাত্যহিক 'সাধারণ্যের সমাবেশ' ও তৎসংশ্লিষ্ট অগুনতি ওয়ার্কগ্রুপের সভা করা যা এখনও জুকত্তি পার্কের প্রতিরোধ আন্দোলনের হৃৎপিণ্ড হিসেবে কাজ করছে, এর থেকে দুনিয়া জুড়ে স্রোতস্বিনী হওয়া অন্য সব আন্দোলনেরও।

গ্রেয়বারের জন্য পরের দেড় মাস ছিল চাকরির মতো মিটিং করে বেড়ানোর সময়। তখন সাপ্তাহিক সমাবেশ হত, প্রথমটি হয়েছিল ব্যাটারি পার্ক সিটির আইরিশ হাঙ্গার মেমোরিয়ালের কাছে, পরেরগুলো ইস্ট ভিলেজের টম্পকিনস স্কয়ার পার্কে। তিনি এর কয়েকটি সমন্বয় করেন নিজে, এবং বাকি সময়ের পুরোটাই দেন মানুষের বাড়িতে বাড়িতে হওয়া বিভিন্ন কর্ম-দলের সভায়। (আগস্টের ১৪ তারিখে টুইটারে লিখেছিলেন, "আজ আমি ক্লান্তিতে নিঃশেষ। জীবনের প্রথম ড্রাইভিং ক্লাস, তারপর টম্পকিনস স্কয়ার পার্কে সভা পরিচালনা তিন ঘণ্টা ধরে")। তিনি আইনি ও স্বাস্থ্যগত প্রশিক্ষণ সংগঠিত করছিলেন, অহিংস প্রতিরোধ আন্দোলন বিষয়ে ক্লাস নিচ্ছিলেন বিরামহীন। দাবিদাওয়া থাকবে বা আদৌ থাকবে কিনা এ নিয়ে সীমাহীন আলোচনা চলল, এমন এক প্রশ্ন যা এই কয়েক মাস পরেও অমীমাংসিতই থেকে গেছে।

সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখের ‘সাধারণ্যের সমাবেশে’ সিদ্ধান্ত হল দখলের লক্ষ্যবস্তু নিয়ে : প্রথম পছন্দ চেজ ম্যানহাটন প্লাজা। বেশ কয়েকটি হাতের পাঁচও রাখা হল বিবেচনায়। ফলে দখল শুরু হওয়ার আগের রাত থেকেই পুলিশ যখন ম্যানহাটন প্লাজা ঘিরে রাখল, দখলবাজদের বিকল্প প্রস্তুতির কোনো ঘাটতি দেখা দিল না। সেপ্টেম্বরের ১৭ তারিখে, নির্ধারিত সময় বিকেল তিনটার ঘণ্টাখানেক আগেই প্লাজার পরিবর্তে জুকত্তির পার্কে যাওয়ার সিদ্ধান্ত মুখে মুখে ছড়িয়ে দেয়া হল, প্রায় ২০০০ লোক জড়ো হয়ে গেল এখন বিখ্যাত হয়ে যাওয়া জুকত্তি পার্কের পাথুরে চত্বর, নিচু বেঞ্চ আর গাছপালার ছায়ায় ছায়ায়। স্থান নির্বাচনটি আসলেই ভাগ্যের আশীর্বাদপুষ্ট কারণ জুকত্তি একটি ব্যক্তিমালিকানাধীন পার্ক, ফলে শহর কর্তৃপক্ষের বিক্ষোভকারীদের উচ্ছেদ করবার কোনো আইনি অধিকার নেই। সে রাতের সাধারণ সমাবেশটি সমন্বয় করেন গ্রেয়বার। যেখানে সিদ্ধান্ত হয় এখুনি ওয়াল স্ট্রিট অভিমুখে যাত্রা না-করে পার্কে ক্যাম্প করে থাকবার। তিন দিন পরে, গ্রেয়বার যখন অস্টিনের উদ্দেশ্যে উলাড় দেন, বিক্ষোভটি ইতিমধ্যেই নিউইয়র্কের স্থানীয় একটি খবরের চেয়ে একটু বেশি কিছুই হয়ে উঠেছে।

গ্রেয়বার ১৬ বছর বয়স থেকেই নৈরাজপন্থী। তিনি বড় হয়েছেন নিউইয়র্কেই, আমূলপন্থী রাজনীতিতে ঠাসা চেলসিয়ার ট্রেড ইউনিয়ন অর্থায়িত একটি অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিংয়ে। এক ইঁচড়ে পাকা শিশুর মতোই, এগারো বছর বয়সেই তার গভীর আগ্রহ জন্মায় মায়ান হায়রোগ্লিফিক্সের নিয়ে। (এই প্রাচীন লিখনপদ্ধতিটির তখনও কেবল আংশিক পাঠোদ্ধার হয়েছে)। তিনি তার নিজের মৌলিক কিছু অনুবাদ পাঠালেন এ বিষয়ে সে সময়কার এক শীর্ষস্থানীয় বোদ্ধার কাছে যিনি এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে গ্রেয়বারের জন্য একটি বৃত্তি যোগাড় করে দেন আনডোভারের মাস-এর ফিলিপস একাডেমিতে।

গ্রেয়বারের জন্মের সময় তাঁর বাবা-মার বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, যার একটা বড় সময় তাঁরা পার করেছেন ১৯৩০ দশকের বাম রাজনীতির স্বশিক্ষিত শ্রমিক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী হিসেবে। গ্রেয়বারের মা ছিলেন একজন গার্মেন্টস কর্মী, এবং খানিকটা তারকাও, যেহেতু আন্তর্জাতিক নারী পোশাক কর্মী ইউনিয়নের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি মিউজিকেল কমেডির মুখ্য চরিত্র রূপায়ণ করতেন যা একই সাথে ব্রডওয়ে থিয়েটারেও জনপ্রিয় হয়েছিল। বাবা কাজ করতেন একটি অফসেট ছাপাখানার প্লেট কারিগর হিসেবে। তাঁর বাবার আদি নিবাস ছিল কানসাস, স্পেনের গৃহযুদ্ধে তিনি রিপাবলিকানদের হয়ে লড়েছিলেন। নৈরাজপন্থীরা এই রিপাবলিকান মোর্চার অংশীদার ছিলেন এবং অল্প সময়ের জন্য হলেও তারা বার্সেলোনার নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়েছিলেন।

“বেশিরভাগ মানুষই নৈরাজপন্থাকে খারাপ ব্যাপার ভাবে না, ভাবে যে এটা অবাস্তব পাগলামি”, গ্রেয়বার বলেন। “হ্যাঁ, এটা নিশ্চয়ই দারুণ চিন্তা যে কোনো কারাগার, পুলিশ, কর্তৃপক্ষীয় ক্রম-নেতৃত্ব কাঠামো থাকবে না, কিন্তু সবাই তো তখন খুনোখুনি

শুরু করে দেবে। কাজেই এটা সম্ভব না তাই-না?" কিন্তু গ্রেয়বারের বাবা স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময় নিজে দেখেছিলেন যে এটা সম্ভব। "কাজেই এটা কোনো পাগলামি ছিল না। আমি এটাকে কখনও পাগলামি ভেবে বড় হইনি"।

অনেক বছর পরে, গ্রেয়বার যখন শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে নৃবিজ্ঞানের স্নাতক ছাত্র, তখন মাঠ-গবেষণা তাঁকে খুব অন্য এক ধরনের নৈরাজ্যিক জনগোষ্ঠীর সংস্পর্শে নিয়ে আসে। তাঁর অভিসন্দর্ভ ছিল মাদাগাস্কারের বেটাফো নামের এক গ্রামীণ সমাজ নিয়ে যা ছিল অভিজাত বংশধরদের আর তাদের দাসদের সমষ্টি। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) আরোপিত বাধ্যবাধকতার অংশ হিসেবে সরকারি ব্যয় সংকোচনের কারণে কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয় ঐ এলাকা থেকে সরে আসতে, তার বাসিন্দাদের নিজ ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে। পরে যদিও এই ধরনের কাঠামোগত সংস্কারনীতির কঠোর প্রতিবাদ করেছেন তিনি, কিন্তু এটাও লক্ষ করতে ভোলেননি যে রাষ্ট্র তাদের পরিত্যাগ করে যাওয়ার পরে এই জনগোষ্ঠী একটি সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তুলেছে যেভাবে প্রায় ১০,০০০ লোক একসাথে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রায় সর্বসম্মত বোঝাপড়ার মাধ্যমে। যখন দরকার পড়ে, অপরাধের বিচারের দায়িত্ব নেয় জনতারই একটি তাৎক্ষণিকভাবে সংগঠিত অংশ, কিন্তু তারপরও একটি সর্বসম্মত মীমাংসার দরকার পড়ে এখানেও, এমনকি অপরাধীকে ফাঁসিতে ঝোলাতে হলে তার পিতা-মাতারও অনুমোদন লাগে।

১৯৯৯ সালে সিয়াটলে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা বিরোধী বিক্ষোভের আগ পর্যন্ত গ্রেয়বার সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী হয়ে ওঠেননি। সে সময় ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে তিনি অনুধাবন করতে থাকেন সারা জীবনে যে ধরনের আন্দোলনে যুক্ত হতে চেয়েছেন তা এমন এক সময় শুরু হয়েছে যখন তিনি নিজের একাডেমিক ক্যারিয়ারের দিকে মনোযোগ দেয়া শুরু করেছেন। "আপনি যদি এইসব বিষয়ে খুব নিবেদিত হন, তাহলে ঘটনা খুব দ্রুত ঘটতে থাকে", গ্রেয়বার বলেন। "প্রথম কর্মসূচিতে এসে দেখবেন আপনি পুরো একজন বহিরাগত। আপনি বুঝতেই পারবেন না কী হচ্ছে। দ্বিতীয়বারেই কিন্তু আপনি সবকিছুই বুঝে ফেলবেন। তৃতীয়বারে, আপনি চাইলেই হয়ে উঠতে পারেন নেতৃত্বের কার্যকর অংশ। যে কেউ এখানে নেতৃত্ব দিতে পারেন তার যদি সময় ও শক্তি খরচের ইচ্ছা থাকে"।

সময়টা গ্রেয়বারের জন্য ছিল বিশেষ সুখের। নিউ হ্যাভেনে তিনি ছিলেন একজন বিদ্বান, এবং নিউইয়র্কে, যেখানে তিনি বেশিরভাগ সময়ই কাটাতেন, তিনি ছিলেন একজন নৈরাজপন্থী যেখানে তিনি নানান ধারার রাজনৈতিক কর্মী, শিল্পী-সাহিত্যিক, এবং বাউণ্ডুলের দল, তারা নিজেদের ডাইরেক্ট অ্যাকশন নেটওয়ার্ক নামে পরিচয় দেন, তাদের মাঝে নতুন এক সমাজ খুঁজে পেয়েছিলেন। সেখানে বিক্ষোভ যেমন হত তেমনি হত বিশদ ব্যঞ্জনাময় উৎসবাদিও 'রিক্লেইম দা স্ট্রিট' পার্টি অথবা সেই রাতগুলোতে,

যখন সবাই এক সাবওয়ে ট্রেনে উঠে গোটা শহর জুড়ে হৈ-হুল্লোড় করে বেড়ানোটাই কাজ।

যাই হোক, ২০০৫ সালে এই সুখের দিন শেষ হয়ে যায় যখন ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় চাকরি পাকা হওয়ার আগেই তাঁর নিয়োগচুক্তি বাতিল করে দেয়। গ্রেয়বার এর বিরুদ্ধে আপিল করেন এবং তাঁর মামলাটি ইয়েলসহ অন্যান্য জায়গার পেশাদার নৃবিজ্ঞানীদের দাবি হয়ে দাঁড়ায়। তিনি দাবি করেন যে তাঁর চুক্তি বাতিল করবার পেছনে অন্তত আংশিক কারণ হিসেবে কাজ করেছে তাঁর রাজনৈতিক সক্রিয়তা। যদিও অনেকে মনে করেন আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে ঠিক সে ধরনের একটি কর্তৃত্বপরায়ণ প্রতিষ্ঠান দার্শনিকভাবে গ্রেয়বার যার ঘোর বিরোধী এবং মেজাজ-মর্জির দিক থেকে একদমই অনুপযুক্ত।

"তার ব্যক্তিগত স্টাইল নিয়ে কিছু ঝামেলা ছিল, প্রশ্ন ছিল সে ডিপার্টমেন্ট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পর্যায়ের জ্যেষ্ঠ সহকর্মীদের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল কিনা তা নিয়ে। মচকানোর মতো মোলায়েম লোক হিসেবে তার খুব একটা সুনাম ছিল না", স্মৃতিচারণ করছিলেন থমাস ব্লম হানসেন, স্টানফোর্ডের নৃবিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং ইয়েলে গ্রেয়বারের সেই সময়ের সহকর্মী। "আমি মনে করি না সে যে তার নিজের ক্ষেত্রে প্রধানতম একজন নৃবিজ্ঞানী সে বিষয়ে কারো কোনো সন্দেহ আছে", তিনি আরো যোগ করেন। "কিন্তু সে আসলেই আমাদের একাডেমিক জীবনের ক্রমবর্ধিষ্ণু অংশ হয়ে ওঠা একঘেয়ে প্রশাসনিকতায় তারা আগ্রহ খুঁজে পেত না"।

অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনটি সূচনার সাথে যুক্ত সবাই, গ্রেয়বার থেকে শুরু করে *অ্যাডবাস্টার্সের* সম্পাদকরা বা 'বাজেট-হ্রাসবিরোধী নিউইয়র্কবাসী' পর্যন্ত সবাই হতবাক হয়েছেন এর সাফল্যে। আমেরিকার বামপন্থী সক্রিয়তার জগৎ সাধারণত প্রগতিবাদী ও শান্তিবাদী, নাগরিক মুক্তিবাদী ও মার্ক্সবাদী, আদর্শবাদী বা বাস্তববাদীদের মিলিত জগাখিচুড়ি এবং প্রায়শই পারস্পরিক দ্বন্দ্ব আর ভুল-বোঝাবুঝিতে পরিপূর্ণ থাকে। অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট আন্দোলনের অভিনব দিক হচ্ছে এই আন্দোলন, এই প্রবণতা সত্ত্বেও গড়ে-ওঠা কোনো আন্দোলন নয়, বরং এই প্রবণতার কারণে গড়ে-ওঠা একটি আন্দোলন। নিজের বিবেচনায় গ্রেয়বার এই সাফল্যের কৃতিত্ব পরিকল্পনাকারীদের নয়, বরং দেন খানিকটা ভাগ্যকে, যথোচিত সময় নির্বাচনকে, এবং সর্বোপরি দেশটিতে ফুঁসে-ওঠা ক্ষোভ আর হতাশাকে : "খুব হাতে গোনা কিছু চাকরি আছে বাজারে, রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নিশ্চল হয়ে আছে মাটিতে, আর ব্যক্তি হিসেবে, জাতি হিসেবে আমরা নিমজ্জিত হচ্ছি ঋণে"।

ঋণ নিয়ে গ্রেয়বারের সমস্যা বা আপত্তি শুধু এই নয় যে মাত্রাতিরিক্ত ঋণ খারাপ। ঋণের আরো মৌলিক সমস্যা হচ্ছে, নিজের বইয়ে তিনি লিখেছেন, একে অপরকে

সাহায্য করবার যে সহজাত মানবিক প্রবৃত্তি, ঋণের বিস্তার সেটাকে বিকৃত করে ফেলে। অর্থশাস্ত্রের বইগুলো আমাদের বোঝায় যে টাকা ও বাজারের উদ্ভব হয়েছে মানুষের 'পরিবহন ও বিনিময়ের' প্রবণতার কারণে, যেমনটা বলে গেছেন অ্যাডাম স্মিথ। টাকা আসবার আগে, স্মিথ যুক্তি দেন, মানুষেরা সাতটা মুরগির সাথে একটা ছাগল বিনিময়ে করত, বা এক জোড়া স্যান্ডেলের বিনিময়ে এক বস্তা শস্য-দানা। তারপর কিছু কারবারি আর ব্যবসায়ী ভাবলেন যে বিনিময়ের জন্য যদি সাধারণ কোনো মাধ্যম থাকে তাহলে সব কিছু খুব সহজ হয়ে যায়, সেটা উপাই হোক বা ওয়ামপুমই হোক। এই গল্পের ঝামেলা হচ্ছে, যা কয়েক যুগ ধরে নৃবিজ্ঞানীরা বলার চেষ্টা করছেন, এরকম কোনো কিছু আদৌ কখনো ঘটেছে বলে বৈজ্ঞানিক কোনো প্রমাণ নেই। "বিনিময় অর্থনীতির কোনো নিখাদ ও সরল কোনো উদাহরণ আজ পর্যন্ত নৃবিজ্ঞানে বর্ণিত হয়নি, সেখান থেকে টাকার উৎপত্তি তো দূরের ব্যাপার", গ্রেয়বারের দেয়া এক উদ্ধৃতিতে বলছেন নৃবিজ্ঞানী ক্যারোলিন হামফ্রে।

টাকাবিহীন সমাজের লোকেরা বিনিময় করে না, যদি-না তারা একদম অপরিচিত বা শত্রু কারো সাথে কারবার করছে। তার বদলে তারা একজন আরেকজনকে জিনিসপত্র এমনি দিয়ে দেয়, কখনো কখনো অর্ঘ্য হিসেবে, কখনো ভবিষ্যতে কোনো কিছু পাওয়ার আশায়, আবার কখনো কখনো একদম সাদামাটা উপহার হিসেবে। সেই অর্থে, বিনিময়কে সহজ করবার জন্য টাকার উদ্ভব ঘটেনি, বরং এর প্রচলন ঘটে প্রাচীন মিশরের মতন রাষ্ট্র বা সুমেরুর মন্দির-কেন্দ্রিক আমলাতন্ত্রের হাতে যাতে করে মানুষের কর পরিশোধের বিষয়টি নির্ঝঞ্ঝাট হয়, অথবা মালিকানাধীন সম্পদের পরিমাণ নিরূপণ সহজ হয়। এই প্রক্রিয়াতেই তারা প্রচলন ঘটায় মূল্য ধারণার ব্যক্তিনিরপেক্ষ বাজার-ব্যবস্থার, যা ক্রমশ পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতার জৈব জালটিকে গ্রাস করে ফেলে।

এই হচ্ছে আক্ষরিক অর্থে প্রাচীন ইতিহাস। তো, এতে কী যায় আসে? অনেক কিছুই যায় আসে, কারণ, টাকা, গ্রেয়বার যুক্তি দিচ্ছেন, পারস্পরিক বন্ধন আর কর্তব্যবোধকে, যা কিনা নিখাদ সামাজিক বিষয়, তাকে ঋণে পরিণত করে, যা কিনা পুরাপুরি অর্থনৈতিক বিষয়।

ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব বিষয়ক যে ধারণা আমাদের মাথার ভেতর কাজ করে তা আমাদের পরস্পরের প্রতি যে মমত্ববোধ তাকে বিনষ্ট করে। ঋণ পবিত্র কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক পবিত্র।

আমরা যদি ঋণের সামাজিক উৎস বুঝতে পারি, গ্রেয়বার বলেন, আমাদের চিন্তার শর্তাবলি বদলে যাওয়ার সাথে সাথে আমরাও আরো বেশি বেশি আগ্রহী হয়ে উঠব নিজেদের ঋণ, বন্ধক, ক্রেডিট কার্ড, শিক্ষাঋণ, বা গোটা জাতির ঋণকেই পুনর্বিবেচনা করবার জন্য। চলমান অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় নেওয়া মরিয়া পদক্ষেপগুলো যদি কিছু দেখিয়ে থাকে তা হচ্ছে, গ্রেয়বারের মতে, আমরা স্বেচ্ছায় কোনো প্রতিষ্ঠানের ঋণ মওকুফ করে দিতে রাজি যদি প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ হয়। শেষ বিচারে, অন্তত তাত্ত্বিকভাবে, সার্বভৌমত্বের মালিক হচ্ছে জনগণ। সে বিচারে আমরাই ব্যাংককে টাকা বানানোর অধিকার দেই আমাদেরই সেই টাকা ঋণ দেয়ার জন্য, গ্রেয়বার বলেন। "আমারা এ জিনিস বানিয়েছি একসাথে, কাজেই আমরা চাইলেই সবকিছু ভিন্ন ভাবেও করতে পারি"। গ্রেয়বারের বই তার সহ-নৃবিজ্ঞানীদের মাঝে ব্যাপক প্রশংসিত হয়েছে, এবং এটা সেই বিদ্যাজগতের বাইরেও যথেষ্ট মনোযোগ পেয়েছে। (যদিও মান্ডি হ্যাঙ্কের মতে, ইন্ডিয়ানার এক লাইব্রেরিয়ান যিনি জুকত্তি পার্কে রাতারাতি গড়ে-ওঠা লাইব্রেরিটি দেখাশুনা করছেন, গ্রেয়বারের বইয়ের কপিগুলো সেখানে খুব একটা ব্যবহৃত হচ্ছে না)। মূলধারার কয়েকজন অর্থনীতিবিদও তার ধারণাগুলোর সাথে পরিচিত। জর্জ মেসন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক টাইলার কোয়েন, যিনি ঘটনাক্রমে একই সাথে একজন বহুলপঠিত ব্লগারও, তাদেরই একজন। "সে মানুষজনের মধ্যে খানিকটা জ্ঞান সেঁধিয়ে দিতে পারে, এবং আমি মনে করি সে-ই ঠিক আছে, অ্যাডম স্মিথ ভুল করেছিলেন", তিনি বলেন। তারপরও কোয়েন, যিনি নিজে একজন মুক্তিপন্থী, গ্রেয়বারের রাজনীতি তাঁকে কমই আকৃষ্ট করেছে। তিনি আধুনিক রাষ্ট্রের কোনো বিকল্প কিছু দেখতে পান না। "সোমালিয়ার দিকে তাকান, যদি কোনো শূন্যতা থাকে, কিছু না কিছু সেটাকে পূরণ করবেই"।

তিনি হয়তো জুকত্তি পার্কের ঢোল-বাজানো লোকদের প্রতিও আঙুল তুলতে পারেন।

ঢোলের বিরামহীন বাড়ি, যা ছিল অকুপাই আন্দোলনের আবহসংগীত, তাই আবার একগাদা শব্দদূষণের অভিযোগ নিয়ে এসেছে যা অন্যথায় সমর্থন দেয়া কমিউনিটি বোর্ড এবং এর নির্বাচিত কর্মকর্তাদের ধৈর্য-পরীক্ষা নিয়েছে। কয়েক সপ্তাহ ধরে সাধারণ্যের সমাবেশে নানা যুক্তিতর্ক করেও কিছু ঢোল-বাজিয়েকে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বাজানোর বিষয়ে রাজি করানো যায়নি, কিন্তু সংগঠকরা আশা করছেন অক্টোবরের ২৫ তারিখের একটি মতভেদ নিরসন সভায় এটির ফয়সালা হয়ে যাবে।

বইয়ের শেষ দিকে, গ্রেয়বার একটি নীতিগত পরামর্শ দেন : একটা বাইবেল-স্টাইলের 'জুবিলি', সকল আন্তর্জাতিক ও ভোক্তাঋণ মওকুফের। এ ধরনের জুবিলি আজকের আধুনিক যুগে অচল হলেও প্রাচীন ব্যাবিলন, এসিরিয়া, এবং টলেমিজের অধীনের মিশরে এটা ছিল একটা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। শাসকেরা জানতেন, অজন্মার বছরগুলোতে ঋণগ্রস্ত কৃষকদের 'জুবিলি' না দেয়ার অর্থ হচ্ছে দাঙ্গা-হাঙ্গামা। "স্বাধীনতা শব্দটা সবচেয়ে প্রাচীন যে রাজনৈতিক দলিলে পাওয়া যায় তা হচ্ছে একজন সুমেরিয়ান রাজার ঋণ মওকুফের ঘোষণা দেয়ার কাগজ"। "এটা অভিবাদনযোগ্য একটা ব্যাপার হবে", গ্রেয়বার লিখছেন, "শুধু এই কারণে নয় যে এটা মানুষের অনেক অনেক দুঃখ-দুর্দশা কমাবে, এজন্যও যে এটা আমাদের নিজেদেরকে নিজেরাই মনে করিয়ে দেয়ার উপায় যে, টাকা বর্ণনাতীত কোনো ব্যাপার না, কারো ঋণ শোধ করার মূলে নীতিনৈতিকতার ব্যাপার নেই, বরং এই সব কিছুই মানবিক আয়োজনের অংশ এবং গণতন্ত্রের যদি কোনো মানে থাকে তাহলে তা হচ্ছে এই পুরো আয়োজনকে ভিন্নভাবে সাজানোর জন্য আমাদের সকলের একমত হওয়ার সামর্থ্য। (কারেন ওইয়েজ'র রিপোর্টিংসহ)

মূল রচনার লিংক :

http://www.businessweek.com/magazine/david-graeber-the-antileader-of-occupy-wall-street-10262011.html

অ নু বা দ / ক বি তা

না-বললেই নয়

....

গু ন্টা র গ্রা স / শে খ বা তে ন

[যে কথা না-বললেই নয়। যা বলতেই হবে। কেন আমি নিশ্চুপ ছিলাম এতদিন? কবি নিজেকে বারবার প্রশ্ন করেছেন, কবিতায়। নিজের প্রতিবাদহীনতায় ক্ষুব্ধ ছিলেন, নিজের ওপর। পাশ্চাত্যের হিপোক্রেসি বা ভণ্ডামির ওপর। বোঝা যায়, বেশ বোঝাপড়া করে শেষে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। জার্মান ভাষায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল গত ৪ এপ্রিল জাতীয় পত্রিকা 'ডয়েছে যাইটুং'-এ। সেখান থেকে গার্ডিয়ান, নিউইয়র্ক টাইমস সহ, পৃথিবীর বিভিন্ন জাতীয় পত্রিকায় প্রায় সতেরটি ভাষায় দ্রুত অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। বাংলায় কয়েকটি অনুবাদ হয়েছে। তা যুৎসই মনে না হওয়ায় আমি অনুবাদ করেছি। আরো
হতে পারে।

জার্মান কবি খ্যাতিমান লেখক নোবেল পুরস্কার পাওয়া গুন্টার গ্রাসের বর্তমান বয়স ৮৪। বাম ঘরানার মানুষ। ৯টি অনুচ্ছেদে সর্বমোট ৬৯ লাইনে, জার্মান ভাষায় কবিতাটি প্রকাশ হবার পর সারা দুনিয়ায় আলোচনার ঝড় উঠেছিল, প্রিন্ট ও সাইবার জগতে। বিশেষ করে জার্মান, ইসরাইল, ইতালি, ইরান ও মধ্যপ্রাচ্য ও এশিয়ার বেশ ক'টি দেশে। হিস্টিরিয়া গ্রস্তের মতো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে ইসরাইল রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ। ইসরাইলের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গুন্টার গ্রাসকে ইসরাইলে অনাকাঙ্খিত ব্যাক্তি (পারসোনা নন-গ্রাটা) বলে ঘোষিত করেছে। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য, অগ্নিনির্বাপক (অর্থাৎ ইসরাইল) আর অগ্নিসংযোগকারী (তাঁর মতে ইরান ও আরব রাষ্ট্র)-কে এক কাতারে ফেলে গুন্টার গ্রাস অবিবেচকের কাজ করেছেন। তার ভাষায় এটা 'লজ্জাকর' 'অনৈতিক' ও 'নিজের নাম ফাটানোর প্রয়াস'। অন্যদিকে, ইরানের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে– দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কোনো জার্মান এমন সাহসের সঙ্গে সত্যোচ্চুরন করেননি। পাশ্চাত্যে যে মুনাফেকি চলছে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে সেটা উন্মোচিত করে গুন্টার গ্রাস কাজের কাজ করেছেন। ইসরাইল থেকে দাবি জানানো হয়েছে, এই কবির নোবেল প্রাইজ প্রত্যাহার করা হোক। অবশ্য সুইডিস নোবেল প্রাইজ একাডেমি

সেটা প্রত্যাখ্যান করেছে। এই কবিতার বিরোধীপক্ষ আরো বলেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের ইহুদি নিধনযজ্ঞে একটি সংঘের (ওয়াফেন এসএস)-এর সদস্য ছিলেন গুন্টার গ্রাস, তার কাছে থেকে ইহুদী বিদ্বেষী কবিতা আসতেই পারে। সত্য হল এই যে, বালক বয়সে গ্রাসকে জোর করে একটি সংঘের সদস্য করা হয়েছিল। পরবর্তিতে তিনি নিজেই তার লেখায় এর বিরোধীতা করেছেন। এবং যুদ্ধবিরোধী উপন্যাস 'দি টিন ড্রাম' লিখার জন্য নোবেল পুরস্কারও পেয়েছেন। তাকে মনে করা হয় জার্মান জাতির বিবেক। সালমান রুশদি বলেছেন, যে লেখক যুদ্ধবিরোধী লেখার জন্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, এতদিন পর উচিত কথা বলায় তাকে ইহুদিবিদ্বেষী গণ্য করা উন্মাদের কাজ।

অন্যদিকে সঙ্গত কারণে, জার্মানির সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে যুদ্ধবিরোধী মানুষ বিভিন্ন শহরে সমাবেশ করে গুন্টার গ্রাসের পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন। দেশে দেশে কবি-সাহিত্যিকদের একটি বড় অংশ তাকে সমর্থন করেছেন। বাংলাদেশেও তার প্রভাব পড়েছে।

এই কবিতার সঙ্গে একটি বিস্ময়কর প্রশ্ন উত্থিত হয়েছে। এতটা শক্তি কোথায় পায়, একটি কবিতা? এটা অনুধাবনের জন্য পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলোর সাম্রাজ্যবাদি অসততার কিছুটা ধারণা থাকা দরকার। শক্তিশালী পশ্চিমা রাষ্ট্রের অধপতনের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- অন্যায় অজুহাতে অনগ্রসর দেশ আক্রমণ করা, জনবসতিতে বিষ্ফোরক নিক্ষেপ, দরিদ্র দেশে পশ্চিমের স্বার্থবিরোধী জাতীয় নেতাকে হত্যা, গণতন্ত্রের নামে সামরিক একনায়কদের ক্ষমতায়নে মদদ দেয়া, মুক্তিকামী মানুষকে সন্ত্রাসী গণ্য করা অতঃপর দমনের জন্য বেপরোয়াভাবে জনপদে সামরিক সরঞ্জাম ব্যবহার করা। বস্তুত আন্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক এতটাই অনৈতিক, ডাবল ও ট্রিপল স্ট্যানডার্ড-এর কারণে এতটাই জটিল যার সম্যক অনুধাবনে বিশেষজ্ঞ হতে হয়। তবে পশ্চিমের বুদ্ধিজীবী কিংবা সাংস্কৃতিক ব্যক্তিরা এসব জানেন, কিন্তু প্রতিবাদ করেন না- গুটিকয় ব্যতিক্রম ছাড়া। অথচ এরা সারা বিশ্বের ভালোমন্দ নিয়ে সারগর্ভ পুস্তক রচনা করেন, শিল্পের তত্ত্ব নির্মাণ করেন, যা দিয়ে দরিদ্র দেশে আলোচনায় ঝড় তোলেন। খুব সংক্ষেপে এটাই পশ্চিমা সভ্যতার ভণ্ডামি, ওয়েস্টার্ন হিপোক্রেসি। সেটা উন্মোচিত করতে নোয়াম চমস্কি ও এডওয়ার্ড সায়ীদের মতো মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবীরা
যা করতে পারেননি গুন্টার তা পেরেছেন- কবিতার ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে।

আমারা জানি, মধ্যপ্রাচ্যে কোনো দেশে পারমাণবিক সরঞ্জাম আছে কিংবা তৈরি হতে চলেছে, এমন অজুহাতে বিশ্বশান্তি রক্ষার সোরগোল তুলে সেখানে আগাম আক্রমণ করে ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছে। এই রকম একটি খোড়া অজুহাতে সম্প্রতি পশ্চিমা রাষ্ট্রের সমরাস্ত্র পাঠানো হচ্ছিল ইসরাইলে, ইরান-এর ওপর আত্রমন পরিচালনার জন্য, এটা বিশেষজ্ঞ মহলের আশংকা। আশ্চর্য হল, একজন কবির প্রশস্ত মনোজগতে সে আতংক ধরা পড়েছে। তিনি আগাম দেখতে পাচ্ছিলেন একটি

ধ্বংসযজ্ঞ। এই কবিতায় সেই আতংক, অসহায়ত্ব, বেদনা, প্রতিবাদ, ক্ষোভ ও কর্তব্যবোধ সমন্বিত হয়েছে। যেহেতু এটা বিশ্বমানবের জীবন ও নিরাপত্তার ব্যাপার তাই এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে বিশ্বব্যাপী।

কবিতার দেহ-সৌন্দর্য নিয়ে যারা বেশি মাথা ঘামান, তাদের জন্যে এটা এটি একটি চমৎকার কবিতা নয়। এতে নেই ইঙ্গিতময়তা, কারুকাজ ও রঙের খেলা। তবে কোনো কোনো ঐতিহাসিক সময়ে জিহ্বায় উচ্চারিত নিছক সত্যশব্দই হতে পারে শ্রেষ্ঠ কবিতা। সাদাই হতে পারে সর্বোৎকৃষ্ট ও মানানসই রং। যে কবি মানবিক দুর্ভোগ আগাম দেখতে পান,

তাকেই বলা যায় এগিয়ে থাকা মানুষ, স্বপ্নদ্রষ্টা।

জার্মান কবি গুন্টার গ্রাসের সপক্ষে স্বদেশে প্রতিক্রিয়া দেখা গেলেও এর ভেতরে রয়েছে বিপোরীতধমী প্রবণতা- কবিসত্তার সঙ্গে আপোষ, প্রাপ্তির প্রয়োজন পক্ষালম্বন, পছন্দের লোকের প্রশংসাবলয়ে থাকা, জনস্বার্থবিচ্ছিন্ন সত্তায় বসবাস, জনদুর্ভোগে থেকেও এর বর্তমান, ভবিষ্যৎ ও বিশ্বজনীনতা বুঝতে বুঝতে না পারা, কিংবা নিরাপদে অবস্থান করার হীনমন্যতা, যা বড় বড় কবি ও কবিতার মূলধারাকে আচ্ছন্ন করেছে এখানে। এইরকম সময়ে গুন্টার গ্রাসের এই কবিতাটি জরুরি। বিশেষ করে নতুনদের জন্য যারা সৌন্দর্যের সঙ্গে সত্যোচ্চারণের সাহসী সম্মিলন ঘটাতে চান। সে জন্য, গুন্টার গ্রাসের ভাষায়, কথা আজই

বলতে হবে, আগামীকাল বলার সুযোগ নাও হতে পারে।]

....

কেন চুপ করে আছি আমি, কেন মুখ খুলিনি দীর্ঘদিন
এমন অস্ত্রসম্ভার নিয়ে, যা দিয়ে চলে ধ্বংসাত্মক যুদ্ধ-খেলা
যে খেলার শেষে যদি-বা বেঁচে যাই আমরা
বড়জোর উল্লেখিত হবো পাদটীকায়।

সে খেলায় আত্মরক্ষার অজুহাত আগাম-আঘাত হানার অধিকার দেয়
সেই অধিকার যদি উস্কে দেয় কোনো গলাবাজ উন্মাদ নেতা
তাহলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ইরানের জনপদ
কারণ এই সন্দেহ তার
ইরান শানাচ্ছে আণবিক বোমা বিধ্বংসী ক্ষমতার।

অথচ আর একটি দেশে বহু বছর ধরে কখনো-বা গোপনে
মজুদ হয়েছে পারমাণবিক অস্ত্রসম্ভার

কোনো বাধা, নিয়ন্ত্রণ, পরিদর্শন হয় না তার
কেন সে-দেশটির নামটি মুখে আনতে পারছি না আমি
কোথায় বাধা আমার?

সারা দুনিয়া খেলছে এই লুকোচুরি খেলা
আমার নীরবতা সেই সূত্রে বাধা
আমি বুঝি, এই নীরবতা অপরাধমূলক
যদি তা ভাঙতে চাই, অগ্রাহ্য করি মিথ্যাচার
তখনই জুটবে 'ইহুদি বিদ্বেষ'-এর অপবাদ আমার।

আমার দেশ অপরাধী, বহুবার দাঁড়িয়েছে কাঠগড়ায়
অপরাধ তার অনেক গভীর, তুলনা হয় না যার
আজ ভাগ্যের ফেরে স্রেফ ব্যবসায়িক কারণে
যদিও বোঝাতে চাচ্ছে ক্ষতিপূরণের জন্য ঘোষণা করেছে
ইসরাইলকে দেবে আরো একটি ডুবোজাহাজ
যার মাথায় থাকবে বিশেষরকম পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র
যা ছোঁড়া যাবে এমন একটি দেশের দিকে
যে দেশে পারমাণবিক বোমা আছে বলে প্রমাণ মেলেনি এখনো
কিন্তু সন্দেহ করা হয় আক্রমণের জন্য আতংকই বড় অজুহাত
আমাকে বলতে হবে, যা না বললেই নয়।

কেন এতদিন চুপ ছিলাম আমি?
কারণ আমাকে ভাবিত করেছে আমার জন্ম-পরিচয়
যেখানে লেগে আছে কালিমা যা কিছুতেই মুছবার নয়

তাই সত্যোচ্চারণ করতে পারিনি আমি
ইসরাইলের মুখের উপর বলতে পারিনি।
সে দেশের সাথে আমার নিবিড় সম্পর্ক আছে এবং
তাই রাখতে চাই আমি।

কেন বলছি আজ, যে কথা বলিনি এতকাল?
কারণ বয়স হয়েছে আমার, ফুরিয়ে এসেছে কলমের কালি
এমনিতেই বিশ্বশান্তি যথেষ্ট নড়োবড়ো।
ইসরাইলের পারমাণবিক ক্ষমতায় বিপদজনক হবে আরো
আজ, এ কথা না বললেই নয়,
কাল বলার সুযোগ পাবো অসম্ভব মনে হয়।
আমি বলছি, আরো একটি কারণে
জাতে জার্মান আমি, কাঁধে কৃত অপরাধের যথেষ্ট ভার
সামনে দৃশ্যমান আর একটি অপরাধে
মদদ দিয়ে হতে যাচ্ছি তার ভাগীদার
কোনই অজুহাতে পাবো না পার।

মাফ করবেন, আর চুপ থাকতে পারলাম না
কারণ পশ্চিমা দুনিয়ার কপটতায় ক্লান্ত আমি,
এবং আশা করছি আমার উচ্চারণে
অনেকের সোচ্চার হতে সাহায্য হবে
এবং আসন্ন বিপদের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে দাবি উঠবে,
ঘৃণা জাগবে বলপ্রয়োগের বিপক্ষে
যার ফলে ইসরাইল ও ইরান উভয় কর্তৃপক্ষ
তাদের পারমাণবিক ধ্বংস-ক্ষমতাকে আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষের
অবাধ ও স্থায়ী নজরদারির আওতায় আনতে বাধ্য করবে।
আর কোনো পথ খোলা নেই
ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মানুষের জন্য
এ অঞ্চলে শত্রুতার মধ্যে যারা পাশাপাশি বাস করছে তাদের জন্য
পরিশেষে আমাদের সকলের বাঁচবার জন্য
এ ছাড়া আর কোনো পথ নেই।

ভারতীয় মুসলমানদের সংকটের কারণ

সু র জি ৎ দা শ গু প্ত

ভারতীয় মুসলমানদের সামনে এক গভীর সংকট।

সংকটের প্রথম কারণ, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা প্রভাবশালী তাঁদের এক বিরাট অংশ ইতিহাসের বিশেষ সমস্যাগুলোর সমাধান সম্পাদনে নিজের অক্ষমতাকে আড়াল করার জন্য গূঢ়তর উদ্দেশ্য ও বৃহত্তর প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে পবিত্র ধর্মগ্রন্থের ও নবীর পয়গামের এমনভাবে প্রচারে ব্যাপৃত যাতে সাধারণ সরল মুসলমানদের ওপর তাঁদের কর্তৃত্ব কায়েম থাকে। বিশ্ব-বাস্তবতা সম্বন্ধে অচেতন এই প্রভাবশালী অংশের আপন সম্প্রদায়ের ওপর ক্ষমতা রক্ষার লিপ্সাই ভারতীয় মুসলমানদের সংকটের বনিয়াদ। এই অংশই এক সমান সিভিল সংহিতার অথবা সলমন রুশদির ভারতে আসার বিরোধিতা করে সাধারণ মুসলিম সমাজকে বিভ্রান্ত করছে। পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান একই আল্লাহকে সমস্ত সৃষ্টির কারণ বলে বিশ্বাস করলেও ও একই ধর্মশাস্ত্রের অধীন হলেও একই সিভিল কোড বা একই প্রকার নাগরিক অধিকারের সংহিতা অনুসরণ করেন না। এমনকি ইরান, ইরাক, ইন্দোনেশিয়া, সৌদি আরব, মিশর, পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রগুলোর ব্যক্তিগত আইনের মধ্যে প্রচুর অসামঞ্জস্য ও তারতম্য রয়েছে। ভারতীয় মুসলিমদের সেই সাহসী কর্তৃত্ব কোথায় যা ভারতের জন্য সমান সিভিল সংহিতা প্রণয়নে ভারতীয় নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানাবে? স্মরণীয় যে মুসলিম নারীর এমন কিছু অধিকারও আছে যেগুলো মানবিকতার দৃষ্টান্তস্বরূপ। অথবা কোথায় সেই কর্তৃত্ব যা সলমন রুশদির সাহিত্য পাঠের পরে তার সাহিত্যিক বিচারেই সংযত থাকার ও ভিন্ন মত পোষণের মানবিক মূল্যবোধকে স্বীকার করার শিক্ষা দেবে ভারতীয় মুসলমানদেরকে? ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের সম্বন্ধে অবহিত উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব ভারতীয় মুসলমানদের সংকটের প্রথম কারণ। সমান সিভিল সংহিতার ফলে যদি মুসলমানদের স্বতন্ত্র ধর্মীয় সত্তা বিনষ্ট হয় তা হলে হিন্দুরও স্বতন্ত্র ধর্মীয় সত্তা বিলুপ্ত হবে। আসলে যথার্থ আধুনিক, মানবিক ও সদর্থক সিভিল সংহিতা প্রণয়ন সম্ভব হলে হিন্দু বা মুসলমান বা

কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের স্বাতন্ত্র্য বিনাশ পাবে এই আতঙ্কটাই প্রথম সংকটের প্রচ্ছন্ন কারণ।

দ্বিতীয় কারণ, বিশাল দরিদ্র মুসলিম শ্রেণির কাছে নেতৃত্ব যেটুকু আছে সেটুকু মুখ্যতই কট্টরপন্থীদের। ওই নেতৃত্ব ধর্মের আত্মা, যুক্তি ও বাস্তবতাকে বর্জন করে নিজেদের সুবিধামতো নিজেদের ভাষায় যেসব ধর্মাদেশ দিচ্ছেন সেসবের সত্য ও সূত্র যাচাই করার উপায় বা ক্ষমতা ওই সাধারণ শ্রেণির মুসলমানের নেই। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে কট্টরপন্থী নেতাগণ শুধুমাত্র পরলোকে সুবিচার ও সুখের লোভ দেখিয়ে ইহলোকের অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য ও দারিদ্র্য কবুল করার শিক্ষা দিয়ে ও কঠোরভাবে শুধু তাঁদেরই কথামতো জীবনযাপনের ফরমান জারি করে ইসলাম ধর্মাবলম্বী দরিদ্র শ্রেণিকে ভারতের বৃহত্তর জনসাধারণের থেকে বিযুক্ত এক স্বতন্ত্র জনগোষ্ঠীতে পরিণত করার কাজে লিপ্ত। কট্টরপন্থীদের দিয়ে পরিচালিত হয়ে ওই শ্রেণি যতই ভারতের জমিন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাষ্ট্রহীন মুসলমান বা সিরেফ মুমিন পরিচয়ের মধ্যে আশ্রয় খুঁজছে ততই বিপন্ন বোধ করছে। বিচ্ছিন্নতাই সৃষ্টি করে বিপন্নতা। অর্থাৎ ভারতীয় মুসলিমদের সংকটের একটা কারণ তাদের সমাজ-শরীরের ভেতরেই আছে। যতই ওই সমাজ ইহলৌকিক ভারতীয় স্বার্থের থেকে পৃথক ভাবে স্বতন্ত্র সামাজিক অস্তিত্ব ও পরিচয় এবং সেই সঙ্গে পারলৌকিক পুরস্কার ও সার্থকতা সন্ধান করতে লাগল ততই তার বিপন্নতা বেড়ে যেতে লাগল আর ততই ভারত-রাষ্ট্রের নাগরিক রূপে ঘনীভূত হতে লাগল তার সংকট। এছাড়া ভারতীয় মুসলমানদের সমাজ-শরীরের বাইরে কারণ তো আছেই যেটাকে বলা হয় তৃতীয় কারণ।

এই তৃতীয় কারণটি হচ্ছে ভারতের ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠদের অর্থাৎ প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দুত্বের নামে আধুনিকতা-বিরোধী, আত্মস্বার্থাভিমুখী সংকীর্ণ মানসিকতার, সহিষ্ণুতা-বিদ্বেষী, ক্রিয়া-কর্ম, ঘৃণা ও হিংসায় বিশ্বাসী নতুন ধার্মিকতার বিপুল উত্থান। এটাও মনে রাখা কর্তব্য যে দুর্বলের অবাঞ্ছিত আচরণকে প্রবলের পক্ষে সহন বা শাসন করা দুটোই সম্ভব, কিন্তু প্রবলের অবাঞ্ছিত আচরণ সর্বদাই কোনো-না-কোনো প্রকারের নির্যাতন, তেমন আচরণের প্রতি দুর্বল কখনোই উদাসীন বা সহনশীল থাকতে পারে না, তেমন ঘটনাকে দুর্বলও অনুরূপ আচরণ দিয়েই প্রতিকার বা প্রতিহত করার চেষ্টা করবে। সংখ্যাগুরুর সাম্প্রদায়িকতাকে কোনও কোনও সময় জাতীয়তা, এমনকি দেশপ্রেম বলেও মনে হতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা অনিবার্যভাবেই সংখ্যালঘুকে বাধ্য করবে আরও তীব্র সাম্প্রদায়িকতায় সমস্যার সমাধান সন্ধান করতে। বিষয়টাকে স্পষ্ট করে বোঝার জন্য অন্য কোণ থেকে দেখা যেতে পারে।

ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্ন পর্যন্ত স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, সুব্রহ্মণ্য ভারতী, জ্যোতিবা ফুলে, মহর্ষি কার্ভে, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণ, বেহরামজি মালাবারি প্রমুখ ভারতের উৎকৃষ্ট চিত্তের অধিকারীগণ নিজ নিজ উপলব্ধি ও বিশ্লেষণী

প্রতিভা দিয়ে ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক সাধনাকে যে-অনন্যতা-ও-মহতত্ত্ব, ভারতের বহুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যকে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের সাধনা রূপে যে-বিশ্বজনীনতা, ভারতীয় জীবনযাত্রার পদ্ধতিকে অহিংসা সম্প্রীতি ও সহিষ্ণুতার পরাকাষ্ঠা রূপে যে-শ্রদ্ধেয়-চরিত্র দিয়েছিলেন তাকে বিংশ শতাব্দীর অন্তিম চরণগুলোতে অশিক্ষায় অন্ধ, বর্বরতায় বলীয়ান ও জনসংখ্যার স্থূল গরিষ্ঠতা দিয়ে পাশব পরাক্রমে ধ্বংস করা হয়েছে। এর ফলে ভারতীয় জীবনে ঘটেছে যুক্তি-বুদ্ধি, বিচার-বিচক্ষণতা ও মানবিক মূল্যবোধের ভয়ংকর বিপর্যয় এবং যে-হিন্দুত্বের জাগরণ হয়েছে তার সমান্তরালে গড়ে উঠেছে অপরাধ ও ঘৃণার বাতাবরণ, হিংসা ও হিংস্রতার সংস্কৃতি। ভারতের ইতিহাসে সংগুপ্ত ছিল যে-অসভ্য আদিমতা, যার কথা জেমস মিল থেকে মিস ই. রাথবোন প্রমুখ বহু ইউরোপীয় উল্লেখ করেছেন, আজ তা গর্বের বস্তুরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠায় তৎপর। নৈতিক নেতৃত্বের জন্য যে-ভারতের ভূমিকা নির্দিষ্ট ছিল আজ সেই ভারত ঘটনাবলির চক্রাবর্তনে এমন এক নিদারুণ অপরাধের জগতে পরিণত যেখানে অগ্নিসংযোগ, ধর্ষণ, লুণ্ঠন, নিধন ইত্যাদি হিংসাত্মক কার্যকলাপ এবং বিত্তে পেশিতে সংখ্যায় দুর্বলের ওপর সবলের নির্যাতন প্রাত্যহিক সংবাদ। আইনের শাসন বর্তমান ভারতে বিত্তবান ও শক্তিমানদের দ্বারা সংরক্ষিত। সমন্বয় ঘটেছে অপরাধবৃত্তি, রাজনীতিচর্চা ও ধার্মিকতার। মস্তানরাই পূজিত হচ্ছে দেশের ও ধর্মের রক্ষক রূপে। সংবিধান-সম্মত শক্তির ওপরে সংবিধান-বহির্ভূত শক্তি চালাচ্ছে নিজস্ব শাসন। দশচক্রের যোগে আজ এক ধর্মের ভিত্তিতে এক জাতির জন্য এক ভাষাভাষী এক দেশের ধারণাকে প্রচার করা হচ্ছে হিন্দু দণ্ডের ত্রিশূল বাগিয়ে। ভারতবাসীর সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা হচ্ছে হিন্দুত্বের চমকপ্রদ জাগরণ ও একই সঙ্গে অপরাধ ও অরাজকতার অভূতপূর্ব বিস্তার, মনে হয় ওই জাগরণ ও ওই বিস্তার একই সত্যের দুই মুখ, যেন হিন্দুত্ব এক হিংসার সংস্কৃতি। বোতলে বন্দি ছিল যে-দানব আজ সে ছাড়া পেয়েছে হিন্দুত্বের নামে একটার পর একটা তাণ্ডব করার জন্য এবং সেই দানবের আক্রমণের লক্ষ্যই হচ্ছে বহুত্ববাদ ও যুক্তিবাদ আর সেই সূত্রে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলো, বর্ণে বা বিত্তে নিম্নতর গোষ্ঠীগুলো ও সাধারণভাবে হিন্দু সমাজভুক্ত নারীজাতি। এবং এই দানব যতই তাণ্ডব করবে ততই নানা পরিচয়ে বিভক্ত নির্যাতিতরা উত্তরদানের প্রতিজ্ঞায় সংঘবদ্ধ হবে, চেষ্টা করবে পালটা তাণ্ডবের। প্রবলের হিংসাই দুর্বলের বুকে প্রতিহিংসার জন্ম দেয়। হিংসা-প্রতিহিংসার ঘূর্ণিবাত্যায় শুধু মুসলমান সমাজই ছিন্নভিন্ন হবে না, দীর্ণবিদীর্ণ হয়ে যাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজও, দেশ জর্জরিত হবে আধিপত্যের জন্য অপরাধীদের অন্তহীন শক্তিযুদ্ধে। সুতরাং সংকট শুধু মুসলমানদের নয়, সমগ্র ভারতবাসীর।

ভারতীয় মুসলমানদের সংকটের চতুর্থ কারণ হচ্ছে সংবিধানের ক্রমশ মূল্যহ্রাসের প্রক্রিয়াতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অংশগ্রহণ। গান্ধীজী ১৯৩১ সালে গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য ইংল্যান্ডের পথে জাহাজে রয়টারের এক প্রতিনিধিকে বলেছিলেস, সেই ভারতই তাঁর স্বপ্নের ভারত যেখানে উচ্চ

বা নিম্ন শ্রেণি থাকবে না, যেখানে সমস্ত সম্প্রদায় শান্তিতে সম্প্রীতিতে বাস করবে, যেখানে অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থাকবে না, যেখানে থাকবে স্ত্রী-পুরুষের সমান অধিকার, প্রতিবেশী দেশগুলোর সঙ্গে এতটাই সদ্ভাব থাকবে যার জন্য প্রতিরক্ষার ব্যয় হবে ন্যূনতম এবং স্বদেশি ও বিদেশি বলে কোনও ভেদাভেদ করা হবে না।[১] আবার ষোল বছর পরে দেশ স্বাধীন হওয়ার ঐতিহাসিক পর্বে কলকাতায় থাকাকালে গান্ধীজী বারবার আলাপে ও ভাষণে বলেছিলেন, 'রাষ্ট্র হবে অবশ্যই সম্পূর্ণ সেকিউলার। ...আইনের চোখে সবাই সমান হবে। সকলেরই যে-কোনও ধর্ম অনুসরণের অবাধ স্বাধীনতা থাকবে যতক্ষণ-না তা দেশের আইনভঙ্গ করে।'[২] স্বাধীন ভারতের জন্য যে-সংবিধান গান্ধীহত্যার দু'বছর পরে গৃহীত হয় তা সত্যিই বহুলাংশে গান্ধীজির স্বপ্নের সংবিধান। কিন্তু সংবিধানে সেকিউলার শব্দটির ব্যবহার নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। মর্ডানিজম, ফান্ডামেন্টালিজমের মতো সেকিউলার শব্দটিও ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বিশেষ ও নতুন দ্যোতনা লাভ করে। সেকিউলার রাষ্ট্র বলতে বোঝায় এমন এক রাষ্ট্র যার প্রসঙ্গে ধর্মের উত্থাপন নিষিদ্ধ। কিন্তু ঘটনা এই যে ইন্দিরা গান্ধী থেকে নরসিংহ রাও পর্যন্ত সমস্ত প্রধানমন্ত্রীই ধর্মের ভিত্তিতে আপন সমর্থকদের সংগঠিত করেছেন, কখনও মুসলমান মতদাতা-শক্তিকে, কখনও হিন্দু মতদাতা-শক্তিকে সাধারণত মুসলিম-বিরোধী কার্যকলাপ নিরোধে নিষ্ক্রিয়তা দিয়ে প্রধানত হিন্দু মদতদাতা-শক্তিকেই ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতায় উৎসাহিত করেছেন। কংগ্রেস ব্যতীত অপর বৃহৎ জাতীয় দল ভারতীয় জনতা পার্টি সগর্বেই হিন্দুত্বের প্রবক্তা। বর্তমানে বাজপেয়ী সরকার আন্তর্জাতিক মতামতের চাপে সেকিউলারিজমের ঘোমটা টানলেও ও প্রতিবেশীর সঙ্গে বন্ধুত্বের নানা ভঙ্গি দেখালেও এই সরকারের মানসিকতাই হিন্দুত্বে উদ্বুদ্ধ এই সরকারের সমর্থকদের কেউ অনুপ্রাণিত আগ্রাসী হিন্দুত্বে, কেউ সহিষ্ণু হিন্দুত্বে, কেউ বিবেকানন্দের বৈদান্তিক হিন্দুত্বে। কিন্তু আজ সেকিউলারিজমের বিশ্বাসী অর্থাৎ ধর্ম নির্বিশেষে নয়, ধর্মের প্রশ্নে নিরপেক্ষ বা ধর্ম থেকে বিযুক্ত আধুনিক রাষ্ট্রনীতিতে নেতৃত্ব কোথায়? বর্তমান কংগ্রেস সভাপতি সোনিয়া গান্ধীর নেতৃত্বও সংবিধানের সেকিউলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার বিধান মান্য না করে স্বামী বিবেকানন্দ কর্তৃক প্রদত্ত বৈদান্তিক হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা দিয়ে সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্বের বিস্তারকে প্রতিহত করার চেষ্টা করছেন। এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে যাদের সমর্থনে তিনি ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ করতে চান তাদের কাছে স্বাধীন ভারতের সংবিধানের চেয়ে প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কারই বেশি সত্য। ভারতের যে-বাস্তবতা তাঁকে বাধ্য করেছে হিন্দুত্বের যূপে যুক্তিবিচার ও সংবিধানের আধুনিকতাকে বলি দিতে সেই বাস্তবতা শুধু সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায়ের নয়, সমগ্র যুক্তিবাদী বুদ্ধিজীবী সমাজেরও সংকটের কারণ।

সংকটের পঞ্চম কারণ হচ্ছে আগ্রাসী হিন্দুত্বের বাইরে দশচক্রী সাম্প্রদায়িক প্রচারের ফলে ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে সুবিস্তীর্ণ নিষ্ক্রিয় মুসলিম বিরূপতা। গোপাল সিং কমিটি ১৯৮৪ সালে এই নিষ্ক্রিয় বিরোধিতার প্রকৃত রূপ বর্ণনা করেছে প্রচুর

তথ্যের ভিত্তিতে। এই নিষ্ক্রিয় মুসলিম বিরূপতা, হিংসাত্মক কার্যকলাপে সর্বদা সক্রিয় অংশ না নিলেও, শিক্ষিত মুসলমানদের কর্মসংস্থানের উপায়গুলো এবং উদ্যোগী মুসলমানদের ব্যাংকঋণের পথগুলো অবরোধ করে রাখে। এত নীরবে ও বহুক্ষেত্রে সাক্ষ্যপ্রমাণহীন ভাবে এই নিষ্ক্রিয় মুসলিম বিদ্বেষ কাজ করে যে আইন বা প্রশাসন বা সংবিধানের পথে এর প্রতিকার করা খুবই দুঃসাধ্য। যার পা শুধু সে-ই জানে যে জুতোর পেরেক কোথায় ফোটে। বঞ্চিত মুসলমানই জানে যে তার দুর্ভাগ্যের জন্য কে দায়ী। আবার এই নিষ্ক্রিয় বিদ্বেষই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার সময় আরক্ষা বিভাগের বৃহৎ নিম্নতর অংশকে শুধু কর্তব্য পালন থেকে বিরত রাখে না, মুসলিম নির্যাতনে, এমনকি মুসলিম নিধনেও, সক্রিয় করে তোলে। তাহলে কোন্ উপায়ে কেমন করে সাধারণ মুসলমান নিজেকে ভারতীয় জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম ও শনাক্ত করবে? প্রকৃতপক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সবৃহৎ অংশের আপাত নিষ্ক্রিয় ও নীরব হিংসাও ভারতের মুসলমানদের সম্মুখে এক বিরাট সংকট।

সংকটের ষষ্ঠ কারণ হচ্ছে সাম্প্রতিক ভারতে সংবিধান-সম্মত ক্ষমতার ওপর সংবিধান-বহির্ভূত ক্ষমতার কর্তৃত্ব। এই শোচনীয় সত্যের প্রমাণগুলো বিশেষ প্রকট হয় ১৯৮৪-তে ইন্দিরা গান্ধী হত্যার পরে দিল্লিতে সংঘটিত গণহত্যায়, ১৯৮৯-তে ভাগলপুরে মুসলিম কারিগর শ্রেণির ওপর বহিরাগত গুণ্ডাবাহিনীর হিংস্র আক্রমণে ও হত্যাযজ্ঞে, ১৯৯০-এ আডবানীর রথযাত্রার ফলে বিভিন্ন শহরে প্রবাহিত রক্তগঙ্গায় আবার ১৯৯২-এ বাবরি মসজিদ ধ্বংসে ও ধ্বংসের পরে বম্বে ও সুরাটে পৈশাচিকতায় উদ্দাম উল্লাসে এবং সর্বোপরি ভাগলপুর হত্যাযজ্ঞের উপর আর.এল.প্রসাদ কমিশনের অথবা বি.এন.শ্রীকৃষ্ণ কমিশনের বম্বের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত রিপোর্টগুলোকে চাপা দেওয়াতে, শিল্পী হুসেনের শিল্পের ও গৃহের উপর বজরঙ্গ দল, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, শিব সেনা প্রভৃতিদের বারবার হামলাতে, 'ফায়ার' সিনেমার প্রদর্শনগৃহগুলোতে হামলাতে, ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে বর্গিগার্দিতে, গুজরাটে খ্রিস্টান ধর্মস্থানে অগ্নিসংযোগের ও ওড়িশায় কুষ্ঠরোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সংগ্রামে রত খ্রিস্টান মিশনারিকে সপুত্র নিধনের সঙ্গে সঙ্গে খ্রিস্টান ধর্মান্তরীকরণকে অপরাধের মূল কারণ রূপে সাব্যস্ত করায় ও অপরাধীদের দোষ স্খালনের চেষ্টায় এবং এইরূপ আরও নানা ঘটনায়। এইভাবে মন্ত্রীদের ও রাজনৈতিক নেতাদের কার্যকলাপে ও প্রকাশ্যে মন্তব্যে সভ্য আইনের শাসন ক্রমশ উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়ছে এবং তার বিপরীতে ক্রমশ পরাক্রান্ত হয়ে উঠছে। বারবারেই ধর্মীয় সংখ্যাগরিষ্ঠদের সমর্থনে গঠিত সরকারের যন্ত্রে পিষ্ট করা হয়েছে সংবিধানের আত্মাকে, নিরীহ ও নির্দোষদের, দুর্বলদের ও দলিতদের আইনের আশ্রয় থেকে কখনও বঞ্চিত করা হয়েছে, কখনও সেই আশ্রয়ের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সংকটের সপ্তম কারণ হচ্ছে মুসলিম সমাজের বাইরে উদ্ভূত সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরূপতার আর সংবিধান-বহির্ভূত জনতারাজের প্রভাবে মুসলমানদের এক বৃহৎ অংশের মধ্যে

স্কুলকলেজের শিক্ষার ফলাফল ও শিল্প-বাণিজ্যের উদ্যোগের ফলাফল সম্বন্ধে সন্দেহ বা নেতিবাচক মানসিকতা। সেই সঙ্গে আছে আইনের ও সংবিধানের শাসন সম্বন্ধে আস্থার অভাব। শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুসারে যদি জীবিকা না পাওয়া যায় তাহলে ছেলেমেয়েদেরকে শিক্ষিত করার জন্য অর্থ ও সময় ব্যয় করে কী হবে? বরঞ্চ জীবিকার জন্য কারিগরি মিস্ত্রিগিরির কাজ করলে অথবা ছোট কারবার করলে দানাপানির একটা ব্যবস্থা হয়। এইভাবে আধুনিক শিক্ষা-বর্জিত পুরাতন সংস্কারে নিমজ্জিত এক শোচনীয় পশ্চাদবর্তী অস্তিত্ব রক্ষা করে চলছে ভারতীয় মুসলিমদের বৃহত্তর অংশ। ঠিক কথা যে শিক্ষার যোগ্যতা অনুসারে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হিন্দুদের জন্যেও নেই, কিন্তু সংখ্যাগুরুদের মধ্যে এই সংকটের তীব্রতা সংখ্যালঘুদের তুলনায় অনেক কম। কাজ দেওয়ার জায়গায় যাঁরা বসে আছেন তাঁরা ৯৯ শতাংশই সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ভুক্ত। তাঁরা কি নিজ ধর্মাবলম্বী প্রার্থীকে ছেড়ে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী প্রার্থীকে অগ্রাধিকার দেবেন? তাই কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের পথে দুস্তর বাধার কথা ভুলে গিয়ে যতক্ষণ-না আধুনিক শিক্ষায় প্রেরণা দেওয়ার জন্য নতুন মুসলিম নেতৃত্বের আবির্ভাব হচ্ছে ততক্ষণ এই সংকটের সমাধান নেই।

মুসলমানদের অষ্টম সংকট হচ্ছে কোনও রাজনৈতিক দলই ভারতীয় মুসলমানকে স্বাধীনভাবে বিচারক্ষম ব্যক্তি তথা প্রাতিস্বিক নাগরিক হিসেবে বিবেচনা করতে প্রস্তুত নয়, সব দলের কাছেই ভারতীয় মুসলমানের পরিচয় হল নিজস্ব চিন্তাশক্তি-বর্জিত, ধর্মনেতার আজ্ঞাবাহী, একীভূত, জনপিণ্ডাকার একটা রাজনৈতিক অভিব্যক্তি-মাত্র তথা শুধু নির্বাচনের সময় জরুরি অথবা মূল্যসম্পন্ন ভোটদাতা সম্প্রদায় বা ভোটব্যাঙ্ক, পক্ষান্তরে ভারতীয় মুসলমানদের বৃহত্তর অংশ বিশেষত যে-অংশ শিক্ষাহীন ও বিত্তহীন ধর্মনেতার কাছেই নিজেদের রাজনীতিক সত্তা সমর্পণ করে বা জিম্মা দিয়ে নিশ্চিন্ত বোধ করে এবং স্পষ্টভাবেই এখানেই রাজনৈতিক চেতনার অভাবের সঙ্গে অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের একটা অনিবার্য সম্পর্ক আছে। এই সম্পর্ক কমবেশি সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রেই সত্য, কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বেশি সত্য, কারণ ইসলামের মধ্যে একতা ও সমতার আদর্শ ও আচরণ অন্যান্য ধর্মের চেয়ে বেশি সত্য এবং এই তুলনামূলক ভাবে বেশি সত্যের একটি প্রমাণ দেখা যায় রমজানের সময় তখন ভাগ্যবান শ্রেণি জাকাতের মাধ্যমে হতভাগ্য শ্রেণির কাছে পৌঁছাবার চেষ্টা করে ও সীমিত অর্থে শ্রেণির বিভেদ বিলোপীকরণে সফল হয়; এবং অন্য প্রমাণটি প্রত্যক্ষ হয় নামাজ পড়ার সময় তখন এক জমিতে, একসঙ্গে, একমুখে সমবেত ঈশ্বরোপাসনার মাধ্যমে এক গভীর একাত্মতার উপলব্ধি জাগ্রত হয়। এই একাত্মতার সংস্কৃতি ভারতীয় মুসলমানদের শক্তি, আবার এক মধ্যেই আছে তাদের দুর্বলতা, কারণ এই সংস্কৃতি যুগ পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে উচিতানুচিতের ও সত্যাসত্যের বিচারে মস্তিষ্কবৃত্তির স্বাধীন অনুশীলনে অনীহা।

এটা মনে রাখা ভালো যে একদিকে কোনো-না-কোনো ধার্মিকতার প্রতি আসক্তি ও ধর্মনেতার প্রতি ভক্তি, অন্যদিকে অপরাধবৃত্তি ও মিথ্যাচারিতা, অন্ধ ঘৃণা ও বিদ্বেষশীলতা, হিংসা ও হিংস্রতা আজ ভারতের সমস্ত স্তরের ও সমস্ত শ্রেণির মানুষকেই সমাচ্ছন্ন করেছে এবং এটা বলা যায় না যে বিশেষ ভাবে কোনও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সমাজবিরোধী মানসিকতা অপেক্ষাকৃত অধিক সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় ধর্ম নির্বিশেষে যে-কোনও ভারতীয়ই সমাজবিরোধী কার্যকলাপে সমান আকৃষ্ট বা অংশীদার হতে পারে কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই সেই সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা, হিংসা, হিংস্রতা ইত্যাদির অনুপাত বেশি হবে। যে-সম্প্রদায় সংখ্যায় গরিষ্ঠ হবে, যে-সম্প্রদায়ের হাতে দেশের অর্থনীতি ও রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বেশি থাকবে, যে-সম্প্রদায়ের সদস্যদের পক্ষে ক্ষমতার অপব্যবহার করা হবে বেশি সহজ এবং এই মানদণ্ডও বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতেই ভারতীয় মুসলমানদের সংকট বিচার্য।

উৎস: ভারতীয় মুসলমানদের সংকট (সংকটের স্বরূপ)

স মা জ / প্র ব ন্ধ

এস. ওয়াজেদ আলি'র 'ভবিষ্যৎ-বাঙালি'

....

ন জ রু ল হো সে ন বু ল বু ল

ইতিহাসের নানান যোগ-বিয়োগ শেষে বাঙালি জাতির ভবিষ্যৎ আজ বাংলাদেশের ওপর বর্তেছে। মুক্তি আন্দোলনের সময় 'জাগো-জাগো বাঙালি জাগো' বলে যে স্লোগান দেয়া হয় তা বাঙালির ইতিহাসে পূর্বে কোনোদিন ধ্বনিত হয়নি। বাংলাদেশের এই চেতনা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের চেতনা থেকে স্বতন্ত্র, ১৯৪৬-৪৭-এর মৃৎবৎস অখণ্ড সার্বভৌম বঙ্গের চেতনা হতেও স্বতন্ত্র। এর জন্মের সূত্রপাত হয়েছে ভাষা আন্দোলনের

মধ্যদিয়ে, যার মধ্যে অবশ্য পুরনো দিনের নানা রেশ ওতপ্রোতভাবে মিশে রয়েছে। [মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ, প্র. ১৪৫-৪৬]

বাঙালি জনগোষ্ঠীর দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। বাঙলা ও বাঙালির সহস্র বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, এই সুদীর্ঘ সময়ে বাঙালির কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল না। সে ক্ষেত্রে একাত্তরের মহান মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ একটি ব্যতিক্রমধর্মী ঘটনা। ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ফসল বাংলাদেশ। একথা সত্য যে, বাংলাদেশ ছাড়াও বাঙালিরা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং ত্রিপুরায় ছড়িয়ে রয়েছে। তবে বাংলাদেশের বাঙালিরা একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের নাগরিক, পক্ষান্তরে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম এবং ত্রিপুরার বাঙালিরা প্রথমে ভারতীয়, পরে বাঙালি। এ প্রসঙ্গে চৌদ্দই জানুয়ারি, উনিশ'শ বাহাত্তর সালে শেখ মুজিব তাঁর প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেন, 'আমার সোনার বাংলা আমার থাকবে, পশ্চিম বাংলা ভারতে, ভারতেই থাকবে।' মোটামুটি এই বিভাজন স্বীকার করে 'ভবিষ্যতের বাঙালি' সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করতে চাই। আমি আমার আলোচনায় বাংলাদেশের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থার নিরিখে 'ভবিষ্যতের বাঙালি' সম্পর্কে আলোকপাত করব।

যে ভূ-খণ্ডটি নিয়ে আমি আলোচনা করছি তার নাম বাংলাদেশ। এর আয়তন ৫৫,৫৯৮ বর্গমাইল। এ দেশের বার্ষিক মাথাপিছু আয় ২৪০ মার্কিন ডলার। এর জনসংখ্যা বর্তমানে ১২ কোটির একটু বেশি। মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্থান ১৪৩ তম। বাংলাদেশে মুদ্রাস্ফীতি -৪.৭ শতাংশ (১৯৯৬ সালের হিসাব অনুযায়ী)। প্রতি হাজারে শিশুমৃত্যু ৭৮ জন। বাংলাদেশের সমাজের উপরিকাঠামোর শতকরা ২০ জন মোট জাতীয় আয়ের শতকরা ৪৫ ভাগই ভোগ করে। আর নিচের শতকরা ২০ জনের ভাগে পড়ে মাত্র শতকরা ৬ থেকে ৭ ভাগ। আবার দৈনিক মাথাপিছু ২১২২ কিলো ক্যালরি খাদ্যগ্রহণ দারিদ্র্যের সীমারেখা বলে মোটামুটি সর্বজনীনস্বীকৃত। সেই মাপকাঠিতে দেশের অর্ধেক অর্থাৎ ছয়কোটি বা তদূর্ধ মানবসন্ত ান এখনও দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। সরকারি পরিসংখ্যানে বাংলাদেশে মোট নিরক্ষর জনগোষ্ঠী শতকরা ৬৫ ভাগ। এবং এর বিপরীতে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন জনগোষ্ঠী শতকরা ৩৫ ভাগ। এদেশে জনসংখ্যার বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২.১৭ ভাগ। প্রতি বর্গকিলোমিটারে জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রায় ৮০০ জন। চরম দারিদ্র্য, তীব্র এবং অসহনীয় বেকারত্ব এবং সীমাহীন শোষণ ও বৈষম্য এদেশের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। উপরের এই পরিসংখ্যানগুলোকে মাথায় রেখে এ বিষয়ে কতিপয় মন্তব্য করা সমীচীন মনে করছি।

দুই.

বিশ্ব ধনতান্ত্রিক কাঠামোর প্রান্তস্থ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিত। বাংলাদেশের সমাজকে এক অর্থে বহুত্ববাদী সমাজ (Pluralist Society) হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে। বহুত্ববাদকে কীভাবে ব্যাখ্যা করব?

Encyclopeida of social sicence-G pluralism-এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে "society is composed of a variety of reasonably independent religious, cultural, educational, professional and economic associations."

মোটামুটিভাবে বলা বলে নানা মত ও নানা পথের সহাবস্থান সামাজিকভাবে ও রাজনৈতিকভাবে অনুমোদিত এবং সংবিধান কর্তৃক স্বীকৃত। আবার য়ুরোপীয় ধারায় যে পরিসরে বহুত্ববাদী সমাজ ক্রিয়াশীল বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার সমরূপতা অর্থহীন। কেননা গুণগতভাবে দুই সমাজের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া আমরা তো জানি যে, এখানে ধ্রুপদী কায়দায় পুঁজিবাদের বিকাশ হয়নি যে কারণে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভঙ্গুর ও বিকৃত। মার্কসকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, বাংলাদেশে রাষ্ট্রযন্ত্র হচ্ছে সমস্ত শোষণের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

সমাজ ক্ষুদ্রতম কোনো একক নয়। এর পরিসর সুবিস্তৃত। জার্মান দার্শনিক কার্ল ম্যানহাইম-এর মতে 'মানুষের সকল চিন্তা বিশেষ সামাজিক অবস্থার প্রতিচ্ছায়ামাত্র'। তাই সমাজ সম্পর্কে যে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমাজ বিজ্ঞানের জ্ঞানতত্ত্বীয় দিক থেকে ভুল। বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করতে হবে আপেক্ষিকতার আলোকে। যে কোনো সমাজের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে বহুমাত্রিক বিষয়সমূহ। তবে মনে রাখতে হবে সমাজের কেন্দ্রীয় চরিত্র মানুষ। তাকে ঘিরে অন্যদের অবস্থান। সে কারণে সমাজের অপরাপর সম্পর্কের আলোকে সংশ্লিষ্ট শিক্ষার চালচিত্র, অর্থনীতির গতিধারা, নারীর আর্থসামাজিক অবস্থা, রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Political Culture) মূল্যবোধ নৈতিকতা।

বাংলাদেশের সমাজ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে হলে প্রথমে রাষ্ট্রের চরিত্র ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। জার্মান দার্শনিক ফ্রেডরিখ এঙ্গেলস্ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দি অরিজিন অফ দি ফ্যামিলি, প্রাইভেট প্রপার্টি অ্যান্ড দি স্টেট'-এ রাষ্ট্র সম্পর্কিত মার্ক্সীয় অভিমত স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। রাষ্ট্র হল সমাজের একটি নির্দিষ্ট পর্বে বিকাশের ফল; রাষ্ট্র হল এই স্বীকৃতি যে, সমাজটা অমীমাংসেয় স্ব-বিরোধে জড়িয়ে পড়েছে, এমন আপোষহীন বৈপরীত্যে ভেঙে পড়েছে যা থেকে মুক্তি লাভে সে অক্ষম। এই বৈপরীত্যগুলো, বিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণিগুলো যাতে নিষ্ফল সংগ্রামে নিজেদের ও সমাজকে গ্রাস করে না-বসে, তার জন্য দরকার হয়ে পড়েছিল এমন

একটি শক্তির যা দৃশ্যত সমাজের উর্ধ্বে আত্মপ্রতিষ্ঠিত, ক্রমেই বেশি করে সমাজ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে তোলা এই শক্তিই হল রাষ্ট্র।

বাংলাদেশের বাস্তবতায় রাষ্ট্র একটি দমনমূলক, নির্যাতনমূলক, কর্তৃত্ববাদী এবং আধিপত্য চরিত্রের সংস্থা। স্বাধীনতার দু'দশক পর এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, রাষ্ট্র এখানে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী শোষকশ্রেণির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। সেজন্য তার মূল লক্ষ্য শক্তিশালী শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে দুর্বল শোষিত শ্রেণিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে তার ওপর আধিপত্য বজায় রাখা। এই নিয়ন্ত্রণ ও আধিপত্য বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের আইনপ্রয়োগকারী বা শক্তি প্রয়োগকারী সংস্থার অস্তিত্ব দেখা যায়। এরাই অধিপতি শ্রেণির স্বার্থে অন্য শ্রেণিকে নিয়ন্ত্রণাধীন করে রাখে। উপনিবেশ-উত্তর সমাজে (State in the Post Colonial Society)-এ এর চরিত্র একটু ভিন্নরকম।

পাকিস্তানের প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী হামজা আলাভী তাঁর একটি সাড়াজাগানো প্রবন্ধে রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন। হামজা আলাভীর মতে উপনিবেশোত্তর সমাজে কোনো উৎপাদনব্যবস্থা এককভাবে প্রবল না হয়ে উঠার কারণে সমাজে মূলত তিনটি প্রাধান্যশীল শ্রেণির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। এগুলো হচ্ছে প্রথমত মেট্রোপলিটন বুর্জোয়া; দ্বিতীয়ত দেশীয় বুর্জোয়া এবং তৃতীয়ত ভূমিভিত্তিক অভিজাত শ্রেণি। সমাজ যেহেতু একটি শ্রেণির একক নিয়ন্ত্রণে নেই, সে কারণে রাষ্ট্রও একটি শ্রেণির একক নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। এসব সমাজে রাষ্ট্র যেহেতু আপেক্ষিকভাবে স্বাধীন সে কারণে রাষ্ট্র প্রাধান্যশীল শ্রেণিসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে বা মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের অতি-বিকশিত কাঠামো (over developed structure) এখানে ক্রিয়াশীল। বস্তুত রাষ্ট্রের প্রকৃতি কোনো বিমূর্ত বিষয় নয়, একটি সমাজের উৎপাদনব্যবস্থার যে দ্বান্দ্বিক বিন্যাস তার ওপরই এর প্রকৃতি বা চরিত্র নির্ভর করে।

তিন.

যে স্বপ্ন, বিশ্বাস ও অঙ্গীকার নিয়ে এ দেশ স্বাধীন হয়েছিল সময়ের পরিক্রমায় তা পূর্ণতা পায়নি। সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে সুষ্ঠু গণতন্ত্র চর্চার অনুপস্থিতি, স্বাধীনতা-পরবর্তী প্রত্যেকটি সরকারের ভ্রান্ত অর্থনৈতিক নীতিমালা, সামরিক বাহিনীর অবৈধ ক্ষমতা দখল-এর কারণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভূলুণ্ঠিত হয়। এ সময় সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি সর্বত্র ভণ্ডামি, বিকারগ্রস্ততা খুব স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। পুরো সমাজ হয়ে পড়ে আদর্শহীন। আমরা জানি কোনো সমাজে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো যখন দুর্বল হয়ে পড়ে, তখন সে সমাজ ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর চাহিদা মেটাতে পারে না। এখানে সর্বত্র ভাঙনের শব্দ শোনা যায়। সবল প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে দুর্বল এবং ক্ষয়িষ্ণু প্রতিষ্ঠানগুলোর সামঞ্জস্যহীনতা দেখা দেয়। এই সামঞ্জস্যহীনতার পথ ধরে সামাজিক বিশৃঙ্খলা হয়ে দাঁড়ায় মৌলিক সত্য। সে কারণে আজ বাংলাদেশের সমাজকাঠামোতে

বিদ্যমান মূল্যবোধের দ্রুত অবক্ষয় খুব স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। আজ ব্যক্তির সামনে আলোকবর্তিকা হিসেবে কোনো আদর্শ নেই। মূলত সামাজিক ইতিহাসের ক্রান্তিকালে আদর্শহীনতার চরম আকাল লক্ষ করা যায়।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক জনসন-এর মতে, যে কোনো স্বৈরাচারী মতবাদ প্রধানত তিনটি নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। সেগুলো হচ্ছে :

প্রথমত রাষ্ট্রের সাথে রাষ্ট্রশাসককে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত করা;

দ্বিতীয়ত ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থ-সম্পর্কিত সবকিছু রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে নিয়ে আসা;

তৃতীয়ত রাষ্ট্রের স্বার্থ অথবা সুবিধার জন্য যে কোনো সরকারি কাজকে ন্যায্য বলে বিবেচনা করা।

স্বৈরাচার আমাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পথ বেয়ে অর্জিত হয়েছে। এখানকার ভাঙনমুখী বুর্জোয়া সমাজে স্বৈরাচারের আর্থসামাজিক ভিত্তি বেশ শক্তিশালী। স্বৈরাচারের স্বরূপকে কীভাবে ব্যাখ্যা করব? সহজ অর্থে কর্তৃত্ববাদী পারিবারিক কাঠামোর পথ ধরে এখানে স্বৈরাচারের ডালপালা বিকশিত হচ্ছে। এখানকার সামাজিক মনোভূমিতে পিতৃতান্ত্রিকতা হচ্ছে মূল সত্য, বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে পিতাই পরিবারের মূল কেন্দ্রবিন্দু। বলা যায় তার চরিত্র কর্তৃত্ববাদী। তার অধিকাংশ সিদ্ধান্ত সমূহ পরিবারের সদস্যদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়। তিনি সবধরনের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিবিহীন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে পরিবারের অন্যদের চাওয়া-পাওয়া এবং গণতান্ত্রিক অধিকারকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে নিজের খেয়ালখুশি, পছন্দ-অপছন্দ অনুসারে অন্যের জীবন ও ব্যক্তিগত বিশ্বাস কিংবা জগৎকে নিয়ন্ত্রণ করেন। পাশাপাশি অন্যদের এই অবস্থা মেনে নিতে বাধ্য করেন। আসলে এই সমাজে এটি এক ধরনের সংস্কৃতি যা কার্যত বিকৃত সংস্কৃতিরই নামান্তর। পরিবার যেহেতু রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র ইউনিট তাই এই ধরনের স্বেচ্ছাচারী মূল্যবোধ-এর সাথে রাষ্ট্রের গভীর যোগসূত্র রয়েছে। সেই ধারাবাহিকতা ধরে বর্তমান মুহূর্তে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের একটি উপাদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি হচ্ছে রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যক্তিকরণ প্রক্রিয়া। কার্যত রাষ্ট্রের সকল সিদ্ধান্ত একজন ব্যক্তির মনোভুবন-এর ওপর নির্ভরশীল কিংবা একজন ব্যক্তির মুখাপেক্ষি। সে কারণে রাষ্ট্রের সকল সিদ্ধান্ত একজন ব্যক্তির দৃষ্টিভঙ্গি-উদ্ভুত, কারণ প্রচলিত ব্যবস্থার ত্রুটির কারণে ব্যক্তির হাতে রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছে। রাষ্ট্রের এই ব্যক্তিকরণ প্রক্রিয়া একপক্ষে সকল ক্ষমতাকে ব্যক্তিভিত্তিক করে তুলছে অন্যপক্ষে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা এবং দক্ষতা নষ্ট করে দিয়েছে। সে আলোকে বলা যায় দলীয়তন্ত্র ও দলকে কেন্দ্র করে সংকীর্ণ ধারা এখানে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল।

চার.

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ক্ষমতায় আসীন হয় মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী সংগঠন আওয়ামী লীগ। স্বল্প সময়ে তারা জাতিকে একটি সংবিধান উপহার দেয়। এই সংবিধানে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের নীতিমালা সংযোজিত হয়েছিল যদিও কার্যকর অর্থে সেসবের প্রয়োগ ঘটেনি। এ সময় শাসকশ্রেণির নিজের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করে। আওয়ামী লীগের কাছে এদেশের প্রত্যাশা ছিল বেশি। কিন্তু ব্যাপক প্রত্যাশা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ নতুন রাষ্ট্রের উপযোগী সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা আওয়ামী লীগের শাসনকে 'Intermediated regime' বা 'মধ্যবিত্তের শাসন' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। এ ধরনের শাসনে কৃষক-শ্রমিক শ্রেণির সাথে মধ্যবিত্তের আঁতাত থাকে। পোলিস অর্থনীতিবিদ মাইকেল ক্যালেস্কি তাঁর 'সোশ্যাল অ্যান্ড ইকনমিক আসপেক্ট অফ ইন্টারমিডিয়েট রিজিম' গ্রন্থে এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, এ ধরনের চার মূলনীতি সংযোজন, প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এসব ছিল আওয়ামী লীগ সরকারের সাফল্য। কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এক অবৈধ সেনাঅভ্যুত্থানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব নিহত হলে বাংলাদেশের রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির করায়ত্ত হয়। সত্যি কথা বলতে কি এ সময় ক্ষমতার মূল উৎস ছিল সেনানিবাস। সামরিক বাহিনীর শাসন বাংলাদেশে দীর্ঘ পনেরো বৎসর স্থায়ী হয়। সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির ব্যাপক মেরুকরণ লক্ষ করলে দেখা যায় পুরো দেশ সামরিক ও অসামরিক ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়ে। অর্থনীতি হয়ে পড়ে বৈদেশিক সাহায্যনির্ভর। এ সময় পুরো অর্থনীতিতে শৃঙ্খলা, জবাবদিহিতা ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছিল অনুপস্থিত। যেহেতু সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত ছিল এক ব্যক্তির হাতে, সে কারণে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটেছিল। মূলত এ অবস্থায় জবাবদিহির কোনো বালাই ছিল না। সকল নিয়ম-কানুন অগ্রাহ্য করে অর্থনৈতিক স্বৈরাচারের পথ ধরে লুণ্ঠনের অর্থনীতিই ছিল বাংলাদেশের অর্থনীতির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। আর এই সামরিক শাসনের মূল সুবিধাভোগী ছিল সেনা আমলাতন্ত্র, বেসামরিক আমলাতন্ত্রের উচ্চ পর্যায় এবং দলছুট রাজনীতিবিদেরা। এদের মধ্যে অশুভ মৈত্রী লক্ষ করা যায়। দীর্ঘ সামরিক শাসন জাতীয় ঐক্যমতকে বিনষ্ট করে ফেলে। যে চার মূলনীতি (বাঙালি জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র) ছিল আমাদের পথচলার আদর্শ ইতিমধ্যেই তাকে সংবিধান থেকে খারিজ করে দেয়া হয়। এ ছিল আমাদের বিরাট ব্যর্থতা। সব ধরনের অন্ধকার সময় ও বিভ্রান্তিতে এ মূলনীতি আমাদের পথের সন্ধান দিতে পারে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, পঁচাত্তর-পরবর্তী রাজনীতি হচ্ছে বিপরীত মতাদর্শের আদর্শহীন রাজনীতি। এ সময় মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী শক্তি ক্ষমতায় আসীন হওয়ার কারণে সংবিধান ক্ষত-বিক্ষত হয়। শাসকগোষ্ঠী সংবিধানকে ছেঁড়া কাগজের মতো টুকরো টুকরো করে

ব্যবহার করে নিজেদের ক্ষমতাকে বৈধতা দেয়ার জন্য। হত্যা, ক্যু এবং অবৈধ ক্ষমতা দখলের রাজনীতির প্রসার ঘটার কারণে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ বলতে কিছু ছিল না। দীর্ঘ সামরিক শাসন একটি জটিল ও বিকলাঙ্গ সমাজের জন্ম দেয়। এই হচ্ছে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক বাস্তবতা। বলা যায় বাংলাদেশের পুরো সামাজিক কাঠামোতে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হয়।

এ অবস্থাকে রোধ করতে পারত ম্যধবিত্তের সচেতন ও প্রাগ্রসর অংশ। কারণ যে কোনো ক্রান্তিকালে এদের ভূমিকাই হচ্ছে মুখ্য। কিন্তু এখানকার ভাঙনমুখী বুর্জোয়া সমাজে মধ্যবিত্তের আপোষকামিতার কারণে সে আশা দুরাশা মাত্র। কারণ সে ভয় করে দ্বন্দ্বকে, যেনতেনভাবে কানাগলির পথ ধরে সে টিকে থাকতে চায়। আপোষ ও সমঝোতার পথ মাড়িয়ে একবার যদি সে রুখে দাঁড়াত তাহলে এ অবস্থাকে রোধ করা সম্ভব হত।

এ সময় বাংলাদেশের রাজনীতির সাধারণ প্রবণতাকে এভাবে উপস্থাপন করা যায় : রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা সরকারপদ্ধতির অস্থায়িত্ব, দুর্বল প্রতিষ্ঠান কাঠামো, নির্বাচনব্যবস্থার অকার্যকারিতা, অসাংবিধানিক পন্থায় যেমন হত্যা, ক্যু বা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন, রাষ্ট্রের মৌলিক বিষয়ে নতুন বির্তক বা ঐক্যমতের অভাব (বাঙালি বনাম বাংলাদেশী, রাষ্ট্রধর্ম বনাম সেক্যুলারিজম), সামরিক-বেসামরিক আমলা-কর্তৃত্ব বা রাজনৈতিক নেতৃত্বের আমলা-নির্ভরশীলতা ইত্যাদি। (হারুন-অর-রশীদ, *বাংলাদেশের রাজনীতির স্বরূপ অন্বেষণ*, দৈনিক জনকণ্ঠ, বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৯৯৬)

পাঁচ.

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের সমাজে, রাজনীতি এবং অর্থনীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিখ্যাত ফরাসি দার্শনিক জাঁ পল সার্ত্রের একটি উক্তি মনে পড়ছে। সার্ত্রের মতে, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে কোনো পদ্ধতির পরিবর্তন শুধু বাহিক্য দিক থেকে ঘটলে সেই পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটেছে বলা যাবে না, এই পরিবর্তন ঘটতে হবে নির্যাস (Essence) বা সঠিক-মৌলিক গুণগত দিক থেকে তথা উপরিকাঠামোর আলোকে। বলা যায় যে, এখানকার আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তনের চেয়ে পরিমাণগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বেশি। গণতন্ত্রের ঐতিহ্যহীনতার কারণে জনসাধারণ গণতন্ত্রহীনতাকে সাময়িকভাবে হলেও মেনে নেয়। ব্যাপক জনসাধারণকে অজ্ঞ, অশিক্ষিত ও পশ্চাদপদ মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ রেখে এবং অ-বৈজ্ঞানিকতা ও কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিলে তা গণতন্ত্রের জন্য কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে অজ্ঞতাই গণতন্ত্রের মৌলিক শত্রু। অজ্ঞ, অশিক্ষিত, মানুষকে শোষণ করা বাস্তবিকভাবেই সহজ যে কারণে এদেশের অজ্ঞ-অশিক্ষিত ব্যক্তিরা গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের মাঝে কোনো পার্থক্য খুঁজে পায় না। গ্রামসিকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, ব্যক্তির মতাদর্শগত ক্ষেত্রে এ বিষয়টি ক্রিয়াশীল

নয় বলেই সামরিক শাসন কিংবা এ ব্যাপারে তার নীরব সমর্থন ও দোদুল্যমানতা অগণতান্ত্রিক শাসনের বৈধতা নিশ্চিত করে।

এখানকার বহুধাবিভক্ত বুর্জোয়া স্বার্থের ধারক-বাহকদের পক্ষে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের মতো ঐকমত্য তৈরি করা এবং সম্মতির ভিত্তিতে শাসন করা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ঐকমত্য কার্যত সোনার হরিণ বৈ অন্য কিছু নয়।

বাংলাদেশের সমাজে একটি বিষয় খুব প্রকটভাবে ভেসে আসে। সেটি হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা কিংবা বিচ্ছিন্নতাবোধ। ইংরেজিতে যাকে Alienation হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। একদিকে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কাছে সিংহভাগ সম্পদের কেন্দ্রীভবন, অন্যদিক ব্যাপক জনগণের মাত্রাতিরিক্ত দারিদ্র্য যার কারণে ব্যক্তির পক্ষে সৃষ্টিশীল এবং অর্থবহ জীবন-যাপন সম্ভব নয়। বস্তুত নিকৃষ্ট অনুৎপাদনশীল ব্যবসায়ী পুঁজির আধিক্য যে সমাজে ক্রিয়াশীল সেখানে বিচ্ছিন্নতা অবশ্যম্ভাবী। পুঁজিবাদী অর্থনীতির মূল প্রবণতাই হচ্ছে সমাজে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি। এই বিচ্ছিন্নতা বাংলাদেশের সমাজে তিনটি ধারায় পরিলক্ষিত হয়। সেগুলো হল

প্রথমত ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির এবং পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা;

দ্বিতীয়ত ব্যক্তির সাথে সমাজের বিচ্ছিন্নতা এবং

তৃতীয়ত ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতা।

শোষণকে নিরঙ্কুশ করার স্বার্থে সমাজে একদিকে শ্রেণিবৈষম্য তীব্র হচ্ছে অন্যদিকে বিচ্ছিন্নতারও উদ্ভব হচ্ছে। এগুলো একটি অপরটির পরিপূরক। সমাজস্থ অধিকাংশ মানুষ নিজেকে আজ তার স্বীয় শক্তি ও সম্ভাবনার প্রত্যক্ষ বাহক না-ভেবে, বহিঃস্থ কোনো শক্তির ওপর নির্ভরশীল দুর্বল বস্তু বলে গণ্য করে। বাংলাদেশের সমাজে বিচ্ছিন্নতার কয়েকটি প্রবণতা আমাদের চোখে পড়ে– প্রথমত কর্তৃত্বহীনতা, বাংলাদেশের সমাজব্যবস্থায় অধিকাংশ ব্যক্তি মনে করে যে, তার বর্তমান মানসিক অবস্থার ওপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। দ্বিতীয়ত অর্থহীনতা, সমাজস্থ ব্যক্তি অনুভব করে যে, তার বিশ্বাস ও আচরণের কোনো সার্থকতা নেই। তৃতীয়ত আদর্শহীনতা, অধিকাংশ ব্যক্তির মাঝে এই ধারণা ক্রিয়াশীল যে, বৈষয়িক স্বচ্ছলতা অর্জনের অবৈধ পন্থাই একমাত্র উপায়। চতুর্থত উদ্দেশ্যহীনতা, সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তি জানে না তার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এভাবে নিষ্ক্রিয়তা এবং নির্বিকারত্ব হয়ে দাঁড়ায় তার প্রাত্যহিক কর্মকাণ্ডের প্রধান অংশ।

এবার রাজনৈতিক সংস্কৃতির দিকে আলোকপাত করা যাক। সহজ অর্থে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে আমরা বুঝি যে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি সদস্যদের মনোভাব। বস্তুত রাজনৈতিক ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ গৌণ বিধায় আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মান অত্যন্ত নিচু। তদুপরি বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি বৈপরীত্যের সংকটে দোলায়িত। এখনও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো বিকশিত না-হওয়ার কারণে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিরাপদ নয়।

সুতরাং বাংলাদেশের বর্তমান সমাজচিত্রকে হতাশাজনক ও অবনতিশীল হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়। তাই সমাজশক্তিগুলোর ঐকমত্যের ভিত্তিতে নীতিগ্রহণ ছাড়া বর্তমান অবস্থার উত্তরণ সম্ভব নয়। তা না-হলে ধন ও ক্ষমতার দিক থেকে সন্ত্রাসের দুর্বিনীত ব্যবহার এবং স্থূল ক্ষমতার চর্চার কারণে বাংলাদেশ জাতিরাষ্ট্র ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারে।

ছয়.

আজ থেকে অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এস. ওয়াজেদ আলি ভবিষ্যতের বাঙালির যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সে আলোকে বাংলাদেশের সমসাময়িক সমাজচরিত্রের তুলনা করলে আমরা হতাশ হই। এই অবস্থাকে অতিক্রম করতে হলে তরুণদের সৃজনশীল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। উনিশ'শ ত্রিশ সালে এস. ওয়াজেদ আলি লিখেছিলেন, পূর্ব বাঙলা একদিন সত্যিকার অর্থে একটি বাঙালি রাষ্ট্র হবে। একদিন সমগ্র বাঙালিই মিলিতভাবে সেই কাজটি করতে সমর্থ হয়েছে। সেই ঐক্যের লক্ষ্য ছিল ধর্মনিরপেক্ষ, শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। স্বাধীনতার দু'যুগ পরও সেই লক্ষ্য ও আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয়নি। বরং জনগণের দারিদ্র্য, বেকারত্ব এবং বৈষম্য দিনে দিনে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী নিরন্তর অস্তিত্বের সংগ্রামে লিপ্ত। অর্থনীতির গ্লোবালাইজেশন-এর কারণে আমাদের ভবিষ্যৎ কোনো-এক অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা পড়ে রয়েছে। যে মূলনীতির ভিত্তিতে এদেশ স্বাধীন হয়েছিল সেগুলো পূরণ না-হওয়ার কারণ বর্তমান রাষ্ট্রযন্ত্র এই লক্ষ্য-আকাঙ্ক্ষার বিরোধী। একটি সমতাবাদী সমাজকাঠামো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বাঙালির আকাঙ্ক্ষা একদিন বিজয়ী হবে। বিদ্যমান রাষ্ট্রযন্ত্রের আমূল রূপান্তরের মাধ্যমে কেবল সেই প্রত্যাশা পূরণ হতে পারে। আমরা সেই দিনটির অপেক্ষা করছি।

তথ্যসূত্র

১. মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, *গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬, পৃ. ২২।

২. নীহার রঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস আদি পর্ব*, বুক এমপোরিয়াম লিমিটেড, কলকাতা, ১৩৫৬, পৃ. ৪,৮,১৯৩।

৩. আহমদ শরীফ, *বাঙলা ও বাঙালিত্ব*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৯।

৪. সৈয়দ আকরম হোসেন সম্পাদিত, *এস ওয়াজেদ আলি রচনাবলি (১ম খণ্ড)*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫।

৫. গোলাম কিবরিয়া ভূঁইয়া, *বাংলার মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ২০।

৬. গোলাম মুরশিদ, *রবীন্দ্র বিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৩৮-৪৮ ।

৭. হারুন-অর-রশীদ, দৈনিক বাংলাবাজার, ১৮ আগস্ট, ১৯৯৬ ।

৮. জেমস জে. নোভাক, *বাংলাদেশে : জলে যার প্রতিবিম্ব,* ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ৯৮ ।

৯. মুনতাসীর মামুন, *উনিশ শতকের পূর্ববঙ্গের সমাজ,* সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা ।

১০. আবদুর রাজ্জাক, *বাংলাদেশ : জাতির অবস্থা,* মোজাফফর আহমদ চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৮০ ।

১১. আসহাবুর রহমান (সম্পাদিত), *বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ ও অন্যান্য প্রবন্ধ,* ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃ. ৫৯ ।

১২. অনুপম সেন, *বাংলাদেশ : রাষ্ট্র ও সমাজ,* [সামাজিক অর্থনীতির স্বরূপ] সাহিত্য সমবায়, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ. ১২২-২৩ ।

১৩. শিবনারায়ণ রায়, *গণতন্ত্র, সংস্কৃতি ও অবক্ষয়,* দেজ পাবলিশিং কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ১২২-২৩ ।

১৪. নজরুল হোসেন বুলবুল, *বাঙলাদেশের সমাজ : প্রকৃতি ও প্রবণতা,* চাকসু বার্ষিকী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯০ ।

১৫. আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরী ও অন্যান্য (সম্পাদিত), *সমাজ বিজ্ঞান শব্দকোষ,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা ।

১৬. কাজী আবদুল ওদুদ, *শাশ্বত বঙ্গ,* ব্রাক প্রকাশনা ।

১৭. বোরহান উদ্দীন খান জাহাঙ্গীর, *রাষ্ট্রবাদ ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি,* সমাজ নিরীক্ষণ-৩৮ সংখ্যা, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা ।

১৮. Jhonson, *The Age of Enlightened.* p. 208

১৯. সেলিম জাহান, অর্থনীতির কড়চা. সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৬৬, পৃ. ১৬ ।

ক বি তা

....

২য় দশকের ২১ জন কবির ২১টি কবিতা

১.

অ র বি ন্দ চ ক্র ব র্তী

....

সঙ্কোচ

মনে করি, সংশয় বুকে ফুলে ওঠা মাংসপিণ্ডের
নাম সাহস
জনৈক রহস্য উন্মোচনের জন্য
সাদা পৃষ্ঠার শুরুতে অনামিকা পাখির শিস

এবার যাত্রার শুরু
অথচ ওই সাহসেই আমার বুক কাঁপে
সমুদ্র গর্জনকে ভয় না পেলেও
মৃদু দুলে ওঠা সাহসকে
আরও বেশি ভয় পাই।
কারণ কোনো এক যাপনে
উঠে এসে...নামতে পারি না
কে যেন সরিয়ে নিয়েছে মই
এখন নক্ষত্র আকাশে সিঁড়ি গড়ার সময়
ঘুমের ভেতরে স্বপ্ন কুড়োতে কুড়োতে
স্বর্গ নিকুচি করে বাতাসে যেতে চাই
রসের তড়াগ ফুটছে পাতালে
মাটিতে ঝরে আছে টসটসে জাম
এতটাই উপরে যে নামতে পারি না...

২.

হা নি ফ রা শে দী ন

....

মানুষের ইতিহাস

ধাত্রী-মা চাঁদের গল্প বলতে বলতে
স্বাগত জানান আসন্ন শিশুদের এ-গ্রহে ।

শিশুদের ঘুম আসে না, আমরা
সুন্দরী ঝরনা গান শুনিয়ে ঘুম পাড়াই ।

আমরা আমাদের শিশুদের
ফুল ফোটান শেখাতে যত্নবান থাকি ।

এ আমাদের না-দেখা দিনের গল্প ।

ধাত্রী-মা রাজকীয় গল্প বলতে বলতে
স্বাগত জানান আসন্ন শিশুদের এ-গ্রহে ।

শিশুদের ঘুম আসে না, আমরা
ভূত-পেতনির ভয় দেখিয়ে ঘুম পাড়াই ।

আমরা আমাদের শিশুদের
প্রথম হয়ে ওঠার ষোলোকলা শেখাই ।

এ আমাদের প্রতিদিনকার গল্প ।

৩.

আ রে ফি ন অ নু

....

রাজ-হাঁসের ‘ইতি’ পাঠ

সমুদ্র পুঁজি করে হেটেছি বিস্তর, যদিও প্রান্ত ঘেঁষে পড়ে থাকা
ফসিলের ছায়ায় বুঝে নিই নার্সিসাসের মৃত্যুযন্ত্রণা। ছোট ছোট
মাটিগ্রামই একদিন মসলিন লিপিকার। পিকিং-এর খুলি অচ্ছুত নয়
কিছু বরং রেশমগুটি পা টেনে পাখা মেললেই শাং-চৌদের ট্যুরিজম
হয়ে ওঠার লুকোনো আতর মন্ত্র। কালের আতুর স্বাদ নিয়ে যখন
ভোর-রাত্রির ট্রেন ডেকে ওঠে হুইসেল, সূক্ষ্ম বর্ণ বিবর্তনবাদ নিয়ে
উড়ে যায় ক্রীতদাসী চিল... অবহেলার মন্ত্র জপে সে ফেরে
ইজিয়ানবাসী এক মেষপালকের ঘরে। অলিম্পাস ঘুরে ইন্দ্রিয়-ঘ্রাণ
পড়ে রয় স্পার্টা-কোরিন্থের আস্বাদ নিতে। ভেনাসের মগ্নতা সন্তুষ্টির নিশ্চেতনতায়
এসিয়া মাইনর আর মাধবীলতার নির্জনবিভূত
পরিণামেও অনাহূত হেলট, বিনম্র সন্ধ্যার আকাশ দৃষ্টি রাখে মুক্তির
উন্মেষে...

৪.

নি য়া জ মো র্শে দ

....

একটি ধারালো চাকু

একটি ধারালো চাকু নিয়ত আমায় কাটে,
স্মৃতির নরম শিরা ছোপ ছোপ লাল ।

কী এক অন্ধ দ্যুতির ছোঁয়া পাই নরম ব্যথায় ।

সে এক মজার অসুখ...
ঢেউ হয়ে জ্বলে আর নেভে

মাতাল রাত্রির ফুল লুটে নেবে – নিতে পার ভোরে ।

মৃত্যুর মতো হিম কিছু টুকটাক আলো,
তোমার দুটি চোখ মেলে যদি ধরো

সেখানে বরফ দেশ বেদনা পাথর হয়ে যায় ।

হৃদয় অভয়মুদ্রা রহস্যরাত্রির পায়ে পায়ে
স্মৃতিরা অনিদ্রাপরী

নদী ও আকাশ এ-ওকে জড়িয়ে শুয়ে রয় ।

৫.

ম নি র ম হ ম্ম দ

....

ভানসর্বস্ব বানে ভেসে চলছি

ক্যামেরার আলো এসে যেটুকু আলোকিত করে
আমরা সেটুকুই দেখি। ঈশ্বর আমাদের এটুকু দেখার
শক্তি দিয়েছেন। তিনি যখন যা দেখান আমরা তাই দেখি
তিনি যখন যা শেখান আমরা তাই শিখি, আর যা বলান–
গৃহপালিত সুবোধের মতো বলি– আমরা অহঙ্কার করি যে– আমাদের নিজস্ব স্বতন্ত্র
কোনো সত্তা নেই!

দলকানা একপাল অন্ধ মানুষের সমর্থিত গণতন্ত্র মহাশয়
কিছু উচ্চকিত শব্দ-বিলাস ঘণ্টির মতো গলায় ঝুলিয়ে,
খেটে খাওয়া মানুষের ঘরে এসে ফতোয়া আউড়ায়।
এবং সময় এখন এতটাই বিনয়ী সে দেখেও না দেখার
ভান করে, না দেখেও দেখার ভান করে; আমরা ভানসর্বস্ব
বানে ভেসে চলছি...

৬.

মা সু দ সু ম নে র ক বি তা

....

বেমানান

সময় বাড়ার সাথে সাথে
দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে বৃদ্ধি পাবার কথা
ফুলে ফেঁপে ওঠার কথা
অথচ দিনে দিনে আমি ছোট হয়ে চলছি
ক্ষুদ্র হতেছি কেবল–

একই গাছের তলায় যাদের সাথে ছিল বসবাস
তারা দ্রুত একেকজন ছাড়িয়ে যাচ্ছে আমাকে
লম্বা এবং চওড়ায় বেশ ঢকসই হচ্ছে
বুকের ছাতিও বাড়িয়ে নিচ্ছে কেউ কেউ
আবহাওয়ার সাথে খাপ খাইয়ে তারা মোটামুটি
দ্রুতই উঠে যাচ্ছে উপরে

আবহাওয়াটা আমার জন্য এতটাই বেমানান
আমি দ্রুত ছোট হচ্ছি– একা হচ্ছি ।

৭.

জিয়াবুল ইবন

....

ধরো, আমি জঙলি ঘাস

ধরো, আমি জঙলি ঘাস। তুমি সূর্যমুখি। আরজন ঈগলপাখি
তবু প্রত্যেকেই আমরা মানুষ

অস্তিত্বের দায়ে খাদ্য খুঁজতে খুঁজতে
একদিন নীল নদের কূলে পেয়ে যাই আশ্চর্য উর্বর মাটি

মন মেশাই মাটিতে
শ্রমে
ঘামে
ধানে আর গানে

মাটির নিচে তেল তেল গন্ধ আর বিশুদ্ধ পানির প্রবাহ। আমরা প্রতিটি টোটেম একাই
তার সাম্রাজ্য চাই। তারপর
টেরাকোটায় ফুটে ওঠে একেকটি জন্তু-জানোয়ারের যুদ্ধ। কেউ কেউ ঘরের দেয়ালে
সাজাই প্রাচীন কোনো যুদ্ধের শিল্পরস

ধরো, আমি হরিণ। তুমি কালো গাভী। আরজন বাজপাখি

একদিন
আমাদের টোটেম বিশ্বাস
ভেঙে দিয়ে বাজপাখিটার রাজা হয় মেনেস
আর আমাদের মন-মগজ মুঠোয় পুরে মেনেস হয়ে ওঠে
দেবতা হোরাস

আমরা তবু টিকে রই, একটি বিশুদ্ধ যুদ্ধের অনিবার্যতা বুকে...

৮.

শা হ না জ পা র ভী ন স্নি গ্ধা

....

দিন বদলের কাব্য

তোমার অস্তিত্ব বিলীন–যদি আমি ফিরিয়ে নিই মুখ! প্রস্ফুটিত দুঃখের ফেনিল স্রোতে ভাসবে যদি তবে ফেরাই জীবন কুহক। প্রশান্ত জলজ ঢেউ আগুনের তাপে জন্মাবে যে বিশ্বাস, সেখানে ছড়িয়ে দিতে পারি বিষাক্ত কীট–দাবানল বলক। স্নিগ্ধহৃদয় পোকার চিত্তহরণ, চাইলেই ঢুকে যেতে পারি সুড়ঙ্গের অলিগলি...আমি তো পোড়াতে চাই, তবু আমার

পুড়ে কেন বিশুদ্ধ ফুলের আঁচল?

একক নক্ষত্র আমি হেঁটে চলেছি– আলোর সন্ধানে। ওদিকে ছুটছে কেউ বিস্মৃতির। ঐশ্বর্য মন্থনে। আমি স্রেফ একাকী, খুঁজি তোলপাড় বৃষ্টির দানা। হেঁটে যাই কাব্যের মিশ্র পঙ্‌ক্তি বুকে নিয়ে অসম পথে! ছন্দ বুঝিনে আমি, কোন পর্বে লিখে যাবো

তোমার নান্দনিক পাঠ? তবুও যুগলবৃত্ত কবিতা স্বপ্ন দেখায়–আলোতে টানে, দুঃখ ভোলার আশায় ছন্দের তিন পর্বেও নিরামিশে আমি ঋণী হয়ে যাই তোমার কাছে, কবিতার কাছে। পিছনে পড়ে থাকে গাঢ় অন্ধকার, টুকরো অতীত। কবি, আমাকে সামনে টানে–মুঠোয়, আলিঙ্গনে। যে তুমি বাঁচতে শেখাও, জীবনবোধের সূর্যে আমি,

মুক্ত ছন্দে ঘুরি দিন বদলের কাব্যে...

৯.

রা শে দ শা হ রি য়া র

....

মজা পুকুর

ক্ষেত খামার বাড়িঘর আর পুকুর
এ সবে চোখ সেই অনেকদিন ।
ক্ষেত খামার আর বাড়িঘর এরা সবাই কেমন আছে?

কয়েকটা মাছরাঙা উড়ে যেতে যেতে
বিদ্যুৎ দৃষ্টিতে পুকুরের দিকে তাকিয়ে
শিকারি চোখে

পাড়টাও ভাঁজে ভাঁজে বিভক্ত
নায়িকার মেদবহুল শরীরের ভাঁজের মতো
আর বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্বের মতো
জলের উপরিভাগ ছেয়ে আছে কচুরিপানায়
কীতের শহর থেকে আমার এক বন্ধু এসেছিলো
এমত বৈশিষ্ট্য দেখে পুকুরটাকে সে মজাপুকুর হিসেবে নির্ণীত করলো

এবং দিয়ে গেলো গোটা দশেক দামি পরামর্শ । তাই বলি
সময়ের আাবাহনে এসো
ব্যক্তিগত মজাপুকুরে সম্মিলিত বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদ করি
বিপ্লবের বীজ ।

১০.

জোনাক আহমেদ

....

আমার ছায়ারা রোদদুর হতে চেয়েছিল

আমি জীর্ণ পৃথিবীর লোকাচারের মাঝে চলমান
হতে পারি,
প্রয়োজনহীন পরিত্যক্ত ধ্বংস্তূপের মাঝেও
দ্রুত, অনিদ্রিত, এমনকি আলোর বেগেও ধাবমান
হতে পারি ।

আমার অবিন্যস্ত হৃদয় সীমাতিক্রান্ত কুয়াশার
মাঝে উড়তে থাকে
শুধু একবার তাকে জড়িয়ে ধরার নেশায় ।

আমার সমস্ত বোধ নমঃ নমঃ বলতে বলতে
মুখ গুঁজে ডানায়
দূরে উড়ে যাওয়া শঙ্খচিলের শিয়র পাশে ।

আমার ছায়ারা রোদ্দুর হতে চেয়েছিল–
ভোরের কুয়াশাকে নিয়ে
অদৃশ্য হবে বলে ।

১১.

আ বু না সি ব

....

সজারু

সজারু–
ও সজারু
তোমার সারা গা-ভর্তি কাঁটা
তোমাকে ছুঁতে গেলেই ঘা খেতে হয়
দেখতে বিসদৃশ কুৎসিত তুমি
সবার ঘৃণা উদ্রেককারী ।
অথচ তোমারই সম-আকৃতির খরগোশ
কী সুন্দর মোলায়েম লোমে ঢাকা দেহ
মানুষ তাকে কত ভালোই-না বাসে
কোলে নিয়ে কী আদিখ্যেতাই-না করে ।

সজারু–
জানি মাঝে মাঝে তুমিও
দেশ ও জাতির ভাগ্য বদলের চিন্তা কর ।
কিন্তু সজারু– তোমার কাঁটার খোঁচায়
তোমার পাশে যখন একজনও বাকি
থাকবে না, তুমি তখন কাকে নিয়ে
দেশ ও জাতির ভাগ্য পাল্টাবে ।
সজারু– কাঁটা দিয়ে কি ভালোবাসা জেতা যায়?

১২.

অ মি ত আ শ রা ফ

....

তেতে ওঠার প্রতীক্ষায়

কাশফুল আকাশ ছেয়ে গেছে
অজস্র মিরার বিবর্ণ আলোয়
আরেকবার কাঙ্ক্ষিত মিলনে
বর্ণমালার ভিড়ে
তেতে ওঠে পথ।
যে পথ লুকায় পায়ের তলে
দেখে কান্নারত অগণিত শিশুর ঠোঁট
সুদর্শন শয়তান চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে
দেয়ালে দেয়াল জুড়ে দেয় ক্ষতের বিকাশে
ঠগি ঈশ্বর ঘুমায় কবির মরাচোয়ালে।

এখানেই শুরু, কোথায় শেষ?
চেয়ে থাকা শুধু
ব্যাপক
অনিদ্রিত
আকুল চোখে।

১৩.

অ জি ত দা শ

....

মানুষ খোঁজ মানুষ দেখ

এ পথেই কতবার!
মেলবন্ধনের সেতু খুলে দিয়ে
                    পুনরায় ফিরে আসি

তুমি যাবে না?
বিতৃষ্ণার তিক্ততায় জলের পর জল ভেঙে দেয়,
নষ্ট হয় সঙ্গমস্মৃতি
বেহায়াপনা শরীরের প্রতিটি ভাঁজে একা একা...
আত্মতা বা অস্মিতায় ভুলে যাই
                    'স্বপ্নযাত্রা কিংবা উদ্বাস্তুপুরাণ'

সস্নেহে পীড়নে তুমি জাগিয়ে দাও
                    মানুষ খোঁজ মানুষ দেখ।

১৪.

সা লে হী ন শি প্রা

....

নৈঃশব্দে

কোনো তাড়া ছিলো না, বারান্দায় ইজিচেয়ারের পাশে বসে ছিল অন্ধকার
ভোর অবধি। রেলিঙে মানিপ্লান্ট দুলছিল: ভাবতে পার ইসাবেলার
রোমান্টিক স্কার্ফ। তারপর দিগন্তে চেয়ে কোনো কোনো বেডরুমের আলো
নিভে যেতে থাকলেই ভ্রম: এ শহর আরশিতে প্রতিচ্ছবি নক্ষত্রের,
আকাশের।

কাছে দূরে উৎসব– মুখে ও মুখোশে পিছলে পড়ে আরো, সুর শব্দ। ছিটকে
আসে কিছু শব্দ এখানেও– নৈঃশব্দের গায়ে ঝ'রে পড়ে, বিব্রত...
কখন যে মৃত্যু এলো, আর চলেও গেলো। মৃত একা অপেক্ষা করছে
জীবিতের...

১৫.

সু জ ন আ হ মে দ

....

বন্দনা না

তুই শালা সারারাত সীমান্তে আদম পাচার করেছিস আর আমি
ভালোবাসার হাত ধরলে দোষ
শিল্পের কলা খেয়ে ভাসিয়েছিস শিল্পকলা
সাহিত্যের দশা আল্লামালুম; তোর দক্ষতায় প্রধানমন্ত্রীর মাথা গফরগাঁওয়ের
গাছপাকা কাঁঠাল এক চাকার সার্কাসে গণভবন থেকে বঙ্গভবন এলাকার,
আমি শুধু একবার সংসদের ভেতর অতৃপ্ত মৈথুনের বীর্য ঢেলে ছায়া ঢাকা গ্রামে
ফিরে যাবো, তুই একবার ফাঁসির মঞ্চের বিচারপতি হয়ে যা এই জবানের
কসম! আমি ঐ আদমবেপারি গুরু রাষ্ট্রপতির কাছে একবারও প্রাণ ভিক্ষা
চাইবো না- না- না!

১৬.

শো য়ে ব স র্ব না ম

....

দিন শেষে

দিন শেষে একা তুমি, একাকী হৃদয়
সব কথা শেষ হলে চলে যেতে হয়।
কী চেয়েছ তুমি আজ? পেয়েছ কি তাই
তোমার জোছনাচোখে চেয়ে টের পাই–

তারপরও থাকে বাকি আরও ভালোবাসা
পরে থাকে বহুদূর স্মৃতির মনীষা।

যে কথা জানতে তুমি, জেনেছিলে আগে
সে কথা আবারও বুঝি জেনে ভালো লাগে?
সবকিছু শেষ হয়, পড়ে থাকে ছাই
তবুও আগুন জ্বেলে এখনও পোড়াই–

এমনটা প্রেম হলে আর কিছুদিন
আমিও তোমার মাঝে কিছুটা বিলীন

১৭.

সুদীপ্ত সাইদ

....

ভুল প্রসঙ্গে সঠিক বিশ্লেষণ

ভুল বিকেলে ভুল পাঠশেষে পাঠ প্রতিক্রিয়ার জন্য টিচারের
মুখের দিকে তাকাতেই তিনি বাঘ না হয়ে একটি কালো
বিড়াল হয়ে গেলেন। আমি ও ভুল বালিকারা সঙ্গম
পাঠের ব্যবহারিক ক্লাস করার অনুমতি চাইতেই
তিনি বিড়াল থেকে হয়ে গেলেন একটি ধূর্ত শিয়াল!

১৮.

মেহেরুবা নিশা

....

পরিপূর্ণ বেদেনী হয়ে উঠতে পারিনি

আমি বেদেনী, সর্পচর্চা করি;
ছোটখাট সাপ ধরি।
কিন্তু পরিপূর্ণ বেদেনী হয়ে উঠতে পারিনি
তাই গোখরাকে বশ মানাতে পারিনি।

তবুও সর্পচর্চা করি–
পরিপূর্ণ বেদেনী হয়ে ওঠার আশায়
গোখরার বিষদাঁত ভাঙার স্বপ্ন দেখি!
আর ছোটখাট সাপ ধরি।

একদিন জোছনার অলক্ষে,
ঝোপ সাজানো কক্ষে;

দেখা হয়ে যায় গোখরার সাথে ।
আর ফুঁসতে থাকি আমি,
ফণা তুলে দাঁড়াই-ও আমি
কারণ গোখরাটাই আমাকে ধরতে চায় জড়িয়ে,
এ কেমন পাগলামি!

গোখরার বিষদাঁত ভাঙার স্বপ্ন নিয়ে
এগিয়ে যাই–
অসাবধানতাবশত
গোখরাটাই আমাকে ধরে ফেলে!
আর আমি, বিষদাঁত ভাঙার আগেই,
পরিপূর্ণ বেদেনী হয়ে ওঠার আগে–
দংশিত হই, হতেই থাকি–
শীতল অনুরাগে!

১৯.

মা মু ন অ র র শী দ

....

পূর্বপশ্চিম

গল্পটা সহজ,
মি. গ্রাসহপার জুয়ার টেবিলে মদের গাস আছড়ে
মি. অ্যান্ট হয়ে শিকারির পা কামড়ে পাখিটিকে বাঁচিয়ে দেয়
পাখিটি উড়াল মারে পশ্চিমে ।

'আই ওয়ান্ট টু হোল্ড ইউর হ্যান্ড'– বলে বিটলসের কীর্তন
কলাবতী রাগে হয়ে যায় মীরের সকালের রেওয়াজ
পাখি তখন উড়ে পশ্চিমে ।

প্রজাপতি উড়ে যদি ম্যাজিক রিয়্যালিজম হয়ে যায়
তবে সব প্রজাপতি উড়বে ল্যাটিন আমেরিকার ফুলে ফুলে;
কলাচাষি সব শুয়োরের রাখাল হয়ে বাঁশি বাজায় কালিনী নদীকূলে
জলে ছায়া ফেলে পাখি তখন উড়ে পশ্চিমে ।

চায়না ক্লের এক মগে মোঁ মোঁ করা যুবতীর যৌবন
পান করে মৈথুনক্লান্ত পুরুষ খোঁজ করে শাওয়ার ছেড়ে নগ্নতার;
বিবাহিতা স্ত্রীর চোখের জল ক্রিস্টাল পাখি হয়ে উড়াল মারে পশ্চিমে ।

মেঘনাদের প্রাণ নিয়ে রাবণের কোলে
ভগবান ট্রয়পতনের পাইরেটেড অ্যানিমেশন ধরিয়ে দিলে
বেদমন্ত্র ভুলে পাখি উড়ে পশ্চিমে ।

গিলগামেশের পাতা উল্টে যদি মারা পড়ে জলপাই-তেল ব্যবসায়ী
কামসূত্র তিলাওয়াত করে আরব্য বণিক খোঁজে
নারীর নরম মঞ্চ-পুরোহিতের চোখেরা যেখানে ব্যালে নৃত্য করে

জীবনানন্দের সব পাখিরা তখন ঘরে না ফিরে ওড়ে পশ্চিমে
সব বনলতা সেন লাস-ভেগাসে, প্যারিস সুবাস গতরে মেখে ।

নগর অমরাবতী শাহবাগে পূর্বপ্রিয় নাগরিক সব বলতেই পারে
আজ সূর্য পূর্বেই অস্ত ও উদিত হোক
মহাকালে চুমু খেয়ে পৃথিবীর একটা দিন হোক পূর্বময়
সব পাখি উড়বে পূবের অস্তাচলে–
চোখের দ্রষ্টব্যে নামবে ব্যক্তিগত লাল সন্ধ্যা
আমি প্রেমিকার জর্ডানা লিপস্টিক মুছে চুম্বন করব ।।

২০.

সৌম্য সরকার

....

একজন হোমিও ডাক্তার ও একজন কবির জন্য শোকগাথা

একজন হোমিও ডাক্তার ও একজন কবি আমার ভবিষ্যৎ গণনা করলেন: রাশি-রাশি দুঃখ তোলা আছে আমার ভবিতব্যের সিক্রেট সিন্দুকে, আমাকে কাঁদতে হবে– তাদের শব্দভেদী অভিমত। আমার হাসি-পোস্টার মুখ, তেলতেলে হোঁদল কুতকুতে শরীর, প্রেমিকার সাথে আমার স্বাস্থ্যকর বিবিধ সম্পর্ক, পিতা-মাতার সঙ্গে অ-সিনেম্যাটিক রিলেশন, শিষ্য-শিষ্যাদের সাথে বন্ধুর মতো ভাব ইত্যাদি অবলোকন করিয়া তাহারা বলিলেন, আমার জন্য অদূর বন্ধুর পথ; আমি নাকি জীবনের চিনিনি কিছুই– জীবনের একরাশ হিংসামালা, হিমালয়ের মতো ভারি কতিপয় কষ্টরাজি, আকাশের মতো চওড়া ঘৃণা ইত্যাদি...

বেশ, আমি মৃত্যুর অপেক্ষায় রইলাম: মাথার উকুন থেকে শুরু করে পাড়ার বিশাল বটবৃক্ষ সকলের মৃত্যু-মা-বাপ ভগ্নি, প্রিয়া ও প্রিয়জন একদিন জানি এমন স্থানে সরে যাবে যেখানে স্বপ্নেরাও পৌঁছাতে ভয় পায়, জানি প্রিয়ংবদা হয়তো আমাকে প্রত্যাখ্যান করবেন লজ্জায়; যে কর্ণে আমার রক্ষাকবচ লটকানো ছিল এতদিন সেই কর্ণখানি হয়তো ক্রসফায়ারে পড়ে গুলির আঘাতে যাবে উড়ে: আমি হব কানকাটা রমজান; জর্জ ডব্লিউ ওবামা ও এঙ্গেলা ক্যামেরনরা বিশ্বের কালো-কালো ভূমিতে দুর্ভিক্ষ রচনা করবেন, 'বসন্ত' উদ্ভাবন করে পৃথিবীময় দখিনা বাতাসে উড়িয়ে দেবেন গন্ধকের সুগন্ধি পরাগ, এমনকি একদিন ভক্ষণযোগ্য মুঠোফোন ছাড়া হবে প্রাচ্যের বাজারে: আমাদের আকাঙ্ক্ষা, আমাদের আকাঙ্ক্ষা, আমাদের আকাঙ্ক্ষার জোয়ারে ভেসে যাবে মানুষ এবং ইঁদুরের মধ্যিখানে এখনও রয়ে যাওয়া এতটুকু ব্যবধান...

সেসব অবশ্য ফিউচার টেন্‌সের কথা: অযথা বাল্মীকি সাজবার কোনো দরকার দেখি না: সীতার জন্মের আগে কী হবে রচে 'সীতায়ণ'! এখন সবকিছু এ্যাত শান্ত, এ্যাত সুষ্ঠু যে একে 'প্রশান্ত' আখ্যা দেওয়া যায়, এখন সবাই গৌতম বুদ্ধ, সেই অর্থে আমিও:

আমার প্রেমিকা সুন্দরী সুজাতা সাজিয়া বিশুদ্ধ দুগ্ধে রঞ্চিত পায়েসের ডিম্বাকার বাটি রাখে আমার জিউভার পাশে, আরামে আয়েশে মুদে চক্ষুদয় নারীর স্তনকে এইবার আমি গোলাকার পৃথিবী বলিয়া ভুল করিতেই পারি-এখন এই বর্তমানে কেননা একজন কবি ও একজন হোমিও ডাক্তার বলেছেন এখন আমার পৌষ, অনিবার্য সর্বনাশ ভবিতব্যে লেখা–

২১.

হি জ ল জো বা য়ে র

....

রেশন কার্ড ...

তুমি ডাক স্বপ্নে– আমি জেগে উঠে সাড়া দেই– এই উপকূলের
শহরে জাহাজে জাহাজে আসে গম– শস্যদানা খায় এক উভমুখী
পাখি– আমাদের সমবায় হল– কেষ্টনগর থেকে সোনাগাছি–
শহরে এবার ঘাস বোনা হবে– ঘাসের ছায়া– ছায়া হবে ঘাস–
ঘাস হবে ছায়ার শরীর– এই উপকূলের শহরে ক্রমে ক্রমে
রাত নেমে আসে– নৈশভোজ শেষে তুমি জেগে থাক–
তোমার ছায়ারা ঘুমায়...

দ্বি তী য় দ শ কে র ২১ জ ন ক বি র ২১ টি ক বি তা র ৩ টি আ লো চ না

....

মিশ্র পাঠ-প্রতিক্রিয়া তবু আবাহন আবাহন...

[এ-সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতার কবি সকলেই দ্বিতীয় দশকের। এ সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতাগুলোর কবির নাম মুছে দিয়ে এবং যে ক্রমানুসারে কবিতাগুলো সাজানো হয়েছে সেই ক্রম এলোমেলো করে দিয়ে এগুলোর ওপর আলোচনা লিখে দেয়ার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলাম এই সময়ের তিন কবি ঝর্ণা রহমান, হেনরী স্বপন ও আমীর খসরু স্বপনকে। অনেক ব্যস্ততার মধ্যে এঁরা আলোচনা তিনটি সমাপ্ত করে গোলাঘরে ছাপার জন্য দিয়েছেন। এঁদের কাছে গোলাঘর-এর পক্ষ থেকে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। কবিতার সঙ্গে কবির নাম না-থাকায় আলোচকত্রয় কবির নাম উল্লেখ না-করে শুধু কবিতার ওপর ভিত্তি করে আলোচনা তিনটি সম্পন্ন করেছেন। এতে আলোচনা কবি-ব্যক্তির প্রভাবমুক্ত থেকেছে আশা করা যায়। তিন কবি-আলোচকের মূল্যায়নে নিশ্চয়ই ভিন্নতা থাকবে; এটি হয়তো সত্যিই কৌতূহল-উদ্দীপক ব্যাপার। কবিতাগুলো কেমন হয়েছে এবং এর ওপর আলোচনা কেমন হয়েছে সেই রায় অবশ্য শেষ পর্যন্ত পাঠকের ওপর বর্তায়।

নতুন দশক মানে নতুন সময় মানে নতুন প্রত্যাশা আর নতুন সৃষ্টি– সেই নতুনের খোঁজে নেমে আমরা যাঁদের কবিতা এ-সংখ্যায় ছাপতে পারলাম না, তাঁদের এমনটি ভাববার দরকার নেই যে, আমরা শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তিতে এই ২১টি কবিতা ছেপেছি। অন্য সৃষ্টির মতো কবিতাও মৃত্যু পর্যন্ত ধারণ এবং সেইমতো চর্চা করে যাওয়ার বিষয়; কাজেই এই সংখ্যায় যাঁদের কবিতা ছাপা হল না, তাঁদের কবিতা পরবর্তী সময়ে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে গোলাঘর-এ ছাপা হবে। যাঁদের কবিতা এই একুশের মধ্যে ছাপা হল না, তাঁদের কাছে ক্ষমাও চেয়ে নিচ্ছি, এই কারণে যে, যাত্রা যাদের শুরু তাদের নিয়ে বিশেষ তালিকা

তৈরির হীন উদ্দেশ্য আমাদের অন্তত নেই। কাজেই আশা করা চলে, আমাদের ওপর ছোট ভাই-ব্রাদারদের কোনো রাগ, ক্ষোভ বা ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ কিন্তু আর থাকলো না! –সম্পাদক দ্বয়]

এক.

ঝ র্ণা র হ মা ন

....

দ্বিতীয় দশকের কবিতা: সম্ভাবনার উঁকি-ঝুঁকি

১. 'সংকোচ' কবিতায় 'সংকোচের বিহ্বলতা' কবি ইচ্ছে করেই এড়িয়েছেন। কল্পনার উল্লম্ফন আছে তাই। মানসযাত্রা স্বর্গলিপ্সু, তবে শেষ পর্যন্ত তা মর্ত্য ভেদ করে পাতালমুখী! 'টসটসে জামের মতো স্বপ্ন কুড়োনো' ব্যাপারটি ভালোই তো !

২. 'মানুষের ইতিহাস' কবিতায় না-দেখা দিন আর দৃশ্যমান প্রতিদিনের গল্প শুনিয়েছেন কবি। অতীত আর বর্তমান এই দুই প্রেক্ষার কাঁচির ফলার ভেতরে রেখেছেন সৌন্দর্য, নৈতিকতা। দেখেছেন যোগ্যতাকে খেয়ে বেড়ে উঠছে প্রতিযোগিতা। ধাত্রীমায়ের চাঁদের গল্পের জন্য কবির আক্ষেপটুকু খাঁটি।

৩. 'রাজ-হাঁসের ইতি পাঠ' কবিতা গদ্যের তাতে পাশ্চাত্য মিথের বুটি তোলা জাদুময় মসলিন। 'ছোট ছোট মাটিগ্রাম' দ্যোতনাময় শব্দ। 'কালের আতুর স্বাদ নিয়ে ভোর রাত্রির ট্রেন হুইসেল' দিলে সে শব্দ অদ্ভুত শোনালেও উত্তরাধুনিকতার লৌহপাতের ওপর দিয়ে তা ছুটতে থাকে।

৪.'একটি ধারোলো চাকু' পানসে নিরামিষ কবিতা। 'নদী ও আকাশ এ ওকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে রয়' – এ লাইনটিতে একটু আমিষের গন্ধ পাওয়া গেল। 'ধারালো চাকুর' প্রতীকে মানসযন্ত্রণা প্রকাশও বড় পুরনো।

৫.' ভানসর্বস্ব বানে ভেসে চলছি' কবিতায় কবি বর্তমান সময়ের কপটতা ও অন্তঃসারশূন্যতাকে ব্যবচ্ছেদ করতে চেয়েছেন। তবে কবিতার শিরোনাম দ্যুতিহীন। অর্থহীনও। দুর্বল তুলনা। অসমঞ্জসতায় উপমা উদ্ভট উটের পিঠে সওয়ারি। শব্দব্যবহারও অনাকর্ষণীয়।

৬. ‘বেমানান’ ছিমছাম সুন্দর কবিতা। সুবিধাবাদী, সুবিধাভোগী আর সাধারণ– এই তিন চরিত্রের ব্যবচ্ছেদ আছে সংক্ষিপ্ততার মাঝেই। বৃক্ষের রূপক সুন্দর। শব্দবিন্যাস সহজ প্রাণময়।

৭. ‘ধরো, আমি জঙলি ঘাস’ কবিতাটিতে অভিনব ‘তিন’ প্রতীকায়িত করা হয়েছে। এর দুটি সমজোড় অপরটি বিপরীত। শোষক বা খাদক। মিশরীয় মিথের ব্যবহার কবিতায় ঐতিহাসিক ব্যঞ্জনা এনেছে। মানুষের শ্রমে ঘামে সভ্যতা গড়ে ওঠে তারপর যুদ্ধ এসে সব বিনাশ করে দেয়। আমাদের ঘাস হরিণ শেষ হয়ে যায়, যুদ্ধ টিকে থাকে। কবির এই উপলব্ধিতে অভিনবত্ব রয়েছে। শিরোনাম সুন্দর।

৮.‘দিনবদলের কাব্য’ কবিতায় কাব্যভাবনা কোনো স্বচ্ছতার উপকূলে পৌঁছায় না। শব্দবিন্যাস টালমাটাল, শিথিল। ‘স্নিগ্ধ হৃদয় পোকার চিত্তহরণ’ – মানে কী! ‘একক নক্ষত্র আমি হেঁটে চলেছি আলোর সন্ধানে’ ছাড়া অন্য পঙ্‌ক্তিগুলো শুধু ভিড় বাড়ায়, ‘হেঁটে চলে’ না।

৯. ‘মজা পুকুর’ কবিতাটিতে এক ধরনের আলোড়ন টের পাওয়া যায়। মজাপুকুরে চাষবাষের মতো চৈতন্যের মজাপুকুরেও মাছেরা লাফিয়ে উঠুক– এমন একটা চিন্তার ঝলক আছে। এলোমেলো শব্দবিন্যাস না-হলে কচুরিপানার সাথে বাংলাদেশের জনসংখ্যার ঘনত্বের তুলনা লাগসই হতে পারত।

১০. ‘আমার ছায়ারা রোদ্দুর হতে চেয়েছিল’ কবিতায় গতিময়তার সাথে অসীমচারিতার বোধ জোট বেঁধেছে। কুয়াশার আস্তরণ সরিয়ে রোদের উদ্ভাসে কবির আকাঙ্ক্ষার মুক্তিপিয়াসী মনটি ছুঁয়ে এসেছে কবিতা।

১১. ‘সজারু’ ব্যঙ্গ কবিতা। কটাক্ষের ভাষা। রাজনীতি ও কালসচেতনতায় আটপৌরে ভাষা মন্দ নয়। তবে ‘ কাঠবেড়ালি কাঠবেড়ালি পেয়ারা তুমি খাও’ এ লাইনগুলোও দেখা যাচ্ছে এ কবিতা পড়তে গেলে মনে পড়ে যাচ্ছে!

১২. ‘তেতে ওঠার প্রতীক্ষায়’ কবিতায় কবির আকাঙ্ক্ষা ‘তেতে‘ ওঠেনি। ব্যবহৃত শব্দের বিবর্ণ বিবর্ণ বিন্যাস। যেমন ‘কাঙ্ক্ষিত মিলনে’। শব্দের ভুল প্রয়োগ– যেমন ‘কান্নারত’। হবে ক্রন্দনরত। কবিতার গঠনশৈলী দুর্বল। স্বাদ পানসে।

১৩. ‘মানুষ খোঁজ মানুষ দেখ’ আত্মকেন্দ্রিকতায় আক্রান্ত গতানুগতিক কবিতা। কাব্যভাবনা মর্মকে স্পর্শ করে না। দ্যুতিহীন পঙ্‌ক্তিমালায় মানুষের জন্য অনুভূতির বয়ান তীব্রতা পায়নি।

১৪. ‘নৈঃশব্দ্যে’ সুন্দর কবিতা। ‘ইজি চেয়ারের পাশে ভোর অবধি বসে থাকা অন্ধকার’ অদ্ভুত সখ্যে জড়িয়ে নেয় পাঠককে। নৈঃশব্দ্যের ভেতরে মৃত্যুর আরও নিঃশব্দ অভ্যুদয় কবিতায় গাঢ় দৃশ্য এনেছে।

১৫. ‘বন্দনা না ’ কবিতাটিতে বিক্ষোভের ধারালো ঝিলিক আছে। সাম্প্রতিক প্রতিকূল সময়, নষ্ট রাজনীতি, মূল্যবোধের অবক্ষয়, কলুষিত চেতনার অন্ধকার চাতালে দাঁড়িয়ে বিক্ষুব্ধ কবির ঘোষণা এখানে কয়েকটি অঙ্গার শব্দের ফোস্কা তুলেছে।

১৬. ‘দিন শেষে’ গতানুগতিক প্রেমের কবিতা। এখানে বিষণ্ন মোম জ্বলে। দু-এক ফোঁটা ধূসর ব্যথা গলে পড়ে। তবে শব্দ ব্যঞ্জনাবিহীন। অক্ষরবৃত্ত ছন্দে রচিত এ কবিতায় পুরনো-প্রাচীন এক ধরনের গীতলতা আছে।

১৭. ‘ভুল প্রসঙ্গে সঠিক বিশ্লেষণ’ কবিতায় সংক্ষিপ্ত অবয়বে মানবমনের জটিলতার স্তর উন্মোচন করার প্রয়াস আছে। শব্দব্যবহারে লক্ষ্যভেদী তীক্ষ্ণতাও আছে।

১৮. ‘পরিপূর্ণ বেদেনী হয়ে উঠতে পারিনি’ – ‘শীতল অনুরাগ’ দিয়ে নির্বিষ করে তোলা একটি শব্দভিড়। সর্পের নিরর্থক ফোঁসফোঁসানি ফস করে জ্বলে উঠেই ছাই। পোড়া দেশলাই কাঠির মতো এ কবিতায় ‘কবিতা’ কোথায়!

১৯. ‘পূর্বপশ্চিম’-এ উত্তরাধুনিকতার মোচড় কবিতার দেহসৌষ্ঠবে ধারালো দীপ্তি এনেছে। পাশ্চাত্য অভিমুখী চৈতন্যের অনিবার্য উড়াল এখানে এক খলনায়ক। আধুনিক জীবনের নানা অনুষঙ্গের উল্লেখ কাব্যভাবনা ব্যঞ্জনায়িত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ট্রয়ের হেলেন থেকে নাটোরের বনলতা সেন, গিলগামেশ থেকে কামসূত্র, লাসভেগাস থেকে শাহবাগ– বিশ্বদিগন্ত ঘুরে ‘পূর্বপ্রিয় নাগরিক’ কবির প্রেমিকাকে বোধ হয় চেনা যায়।

২০. ‘একজন হোমিও ডাক্তার ও একজন কবির জন্য শোকগাথা’ গদ্যকাঠামোয় নির্মিত এ কবিতায় একই সঙ্গে জীবনবিমুখতা আর জীবনবাদিতা ধারালো চিরুনির মতো খামচে ধরে মাথা। কিছু শব্দ আছে গনগনে কয়লা। আবার কিছু ক্লিশে। ‘জাতকের

কাহিনী'র ধরনে কাঠামোবিন্যাসে অভিনবত্ব আছে। বিশ্বায়ন আর পণ্যায়নের বেড়াজালে বন্দী তৃতীয় বিশ্বের একজন তো এই কবিও!

২১. 'রেশন কার্ড' ক্ষীয়মাণ স্বপ্ন আর প্রত্যাশার কবিতা। সংক্ষিপ্ত অবয়বে আটোসাঁটো। তীব্র। তবে 'তোমার হৃদয় আজ ঘাস...' জীবনানন্দ দাশের *আকাশলীনা* কবিতার এ পঙ্‌ক্তিগুলো মনে না-পড়লে ভালো হত।

১০.০৬.১২

দুই.

হে ন রী স্ব প ন

....

নতুন কবিতা নতুন মুন্সিয়ানা

১.

কবি যে সংশয় থেকে প্রবাহমানতার দিকে যাত্রা করেন, সেখানে প্রচল সব কাব্যিক ন্যারেটিভকে প্রত্যাখানের সাহস তার আছে।

২.

জীবন যেখানে স্থবির, কথা বলার ভাষা যেখানে আড়ষ্ট, আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি যখন মানুষে...; কবি ঠিক সেখান থেকেই শুরু করেন স্বপ্ন দেখা। এই কবিতায় তিনি সেই স্বপ্ন দেখেন।

৩.

এক অদ্ভুত সন্দিগ্ধতা কবিকে আচ্ছন্ন করে আছে; সার্থক এই জগতের অতি জাগতিক কিংবা কবিতার অন্তঃসলিলেও ডুব দেন বলেই ‘ফসিলের ছায়ায় বুঝে নেই নার্সিসাসের মৃত্যুযন্ত্রণা’... ।

৪.

এ কেবল নমিত উচ্চারণের কবিতা। যদিও দৃষ্টিগ্রাহ্য জবরদস্তি কোনো রূপক চিত্রকল্পের অপচেষ্টা নেই। এলিয়ে যাওয়া বয়ে যাওয়া কোনো মুডও অবশ্য নেই, তবুও অন্তর্গত উপলব্ধির বয়ান... । ভাল।

৫.

কবি যদি সমকালীন হয়ে চিরকালীনতায় পৌঁছে যেতে যেতে ঈশ্বরকে খুঁজে পান, তবুও মানুষ...‘খেটে খাওয়া মানুষের ঘরে এসে ফতোয়া আওড়ায়’ কেনো?

৬.

সময়ের মাঝেও যিনি ন্যাজ্য ও সত্যিকার জীবনবোধে হারিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন। ‘তবুও বুকের ছাতিও বাড়িয়ে নিচ্ছে কেউ কেউ’– এমনই একবার নিজেকে ভিন্ন চোখে দেখা।

৭.

যে-করেই হোক কবিতাটি মাটি মাখিয়ে নীলকণ্ঠ এবং প্রাচীন গ্রীস থেকে বা তারও পূর্বের টোটেম সভ্যতা বৈপরীত্যের টানাপড়েনে টালমাটাল। এ সত্য মেনে নিয়েই জীবন।

৮.

তবু অন্তর্গত উপলব্ধির কথা তিনি বলেন, এমন শব্দ ও বাক্য যা কাঠামোবাদী গীতলতাকে অস্বীকার করে। ‘তবুও যুগলবৃত্ত কবিতার স্বপ্ন দেখায়’ কিন্তু জীবনের বিবর্তনকে তিনি এড়াতে পারেন না।

৯.
এলিয়টীয় পরিমিতি ধারণ করে সাবঅলটার্ন দৃষ্টিপাত খুঁজে পাওয়া কি সম্ভব ? ছন্দ-অলংকার-উপমা-রূপক-চিত্রকল্প ভেঙ্গে সব আখ্যান অস্বীকারের সংজ্ঞা তবু মেনে নিতে হয় । যে সংজ্ঞায় জীবনানন্দীয় অমোঘ প্রভাবের অনুজ্ঞাও থাকে ।

১০.
যেখানে ভাবগত অস্পষ্টতা তৈরি হয় । তা কেবল হয় প্রয়োগ পদ্ধতির মধ্য দিয়ে । ছুটে চলার পায়ে পায়ে শেকল পরিয়ে কাব্যের বহুমাত্রিকতা খুঁজে পাওয়া যায় না ।

১১.
'সজারু-কাঁটা দিয়ে কি ভালোবাসা জেতা যায়?'– এ জীবনের মোহ তিনি বুঝে নেন, এক এক নীল শাদা দুঃখ । এ ট্রাজিক উপলব্ধি ও বোধ কেবল ইয়েটসীয় সত্যকে মনে করিয়ে দেয় ।

১২.
বোদলেয়ারের কৃত্রিমতা এ সময়ের এ-কবির উপাস্য । প্রকৃতির এষণা বিরোধী কবিতায়ই অপার সৌন্দর্যকে চোখ তুলে দেখতে হয় ।

১৩.
প্রতীকী শরীরবৃত্তের বাস্তবতায় মানুষ এখানে সে তার কাঠামো ছেড়ে কাঠামোহীনতায় যায় আবার ফিরে এসে বলে, 'মানুষ খোঁজ মানুষ দেখ' । অরও দেখে নাও– । আমরাও দেখছি ।

১৪.
মৃত্যু নিয়ে কবিতায় ক্রমাগত মৃত্যুকে সরিয়ে রাখার ভাবনা কেবল আত্মজৈবনিকতা । তবু ইসাবেলার রোমান্টিক স্কার্ফ... । ঠিক আছে...

১৫.
কেউই তো রাজনীতি নিরপেক্ষ নন । কবির এই যে রাজনৈতিক সচেতনতা এ-এক অদ্ভুত শ্লেষের । স্লাং-এর মধ্য দিয়ে দারুণ কবিতা হয়ে উঠেছে ।

১৬.
কবিতার প্রচল সংজ্ঞা দিয়ে কবিতার ক্ষমতা বিচার করা খুব সহজ নয় । কবিতার গভীরতা অনেক রহস্যময়... ।

১৭.
ফ্রয়েডীয় দর্শনের মুন্সিয়ানা আছে। যা কবিতাকে ছুঁয়েছে। কবিতার মধ্যেও সেই জীবন সেই স্খলন সেই ক্ষয় বিড়াল শেয়াল হয়ে ওঠে।

১৮.
বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করে সে অবস্থার আবস্থাকে নেড়েঘেঁটে তারপর সেখান থেকে লেখাটা আসা দরকার...

১৯.
এটা এখন একেবারেই নতুন কবিতার ফর্ম। নতুন ধরনের ফ্রেস লেখা, নতুন রকম, নতুন উন্মোচন, নতুন বাঁক... 'প্রজাপতি উড়ে যদি ম্যাজিক রিয়্যালিজম হয়ে যায়?'... খুব সহজ কিংবা অত্যন্ত রহস্যময়।

২০.
কবিতায় গল্প বললে, সেটাও কবিতা হয়। কবিতা সবকিছু সহ্য করে? কবিতা হওয়া না হওয়ার ফতোয়াটা কে দেয়? কেন দেয়? মোদ্দা কথা কবিতার মধ্যে সেই সারপ্রাইজ বর্ণনা থাকা দরকার যা কবিতাকে সার্থক করবেই।

২১.
রেশন কার্ড... ভীষণ স্মার্ট একটি কবিতার আঙ্গিক। কবির নিজস্ব এক মুন্সিয়ানা আছে। আইডেনটিটিও আছে।

তিন.

আ মী র খ স রু স্ব প ন

....

দ্বিতীয় দশকের কবিতা: নিজস্বতা পায়নি এখনও

১. উচ্চারণগুলো নিজস্ব নয়।

২. একটা বিবরণ পাঠ করলাম। এরকম বিবরণ এর আগেও অনেক পড়েছি।

৩. কবিতা অলৌকিক-প্রতিভা জাতীয় কিছু নয়।

৪. কবিতার থাকে কিছু কলা-কৌশল। যেমন, নাটক অথবা চলচ্চিত্রের থাকে। এসব কৌশল অনুশীলন করা না হলে কবিতা, সাহিত্য সৃষ্টি হয় না।

৫. কবিতা পরম্পরায় সম্পৃক্ত। কারণ ভাষাগত ও কখনো কখনো চিন্তা/তত্ত্ব/দর্শন/সমাজ ইত্যাদির ওপর এই পরম্পরার ধারা ও প্রকৃতি নির্ভরশীল হয়। আর এ কারণেই কবিতা স্থান পরিবর্তন করে। আলাদা হয়। এখানে কিছু চেষ্টা লক্ষ করা গেল।

৬. পার্থক্য তৈরি করে না। ফলে স্বাদও পাওয়া যায় না। অপরিচিত বাক্য, শব্দ, অর্থ দ্বারা অনেক উজ্জ্বল কিছু সৃষ্টি হয়। যেহেতু কবিতা ভিতরের ব্যাপার, তাই এসবই প্রাধান্য পাবে।

৭. এ ধরনের বক্তব্য, চিত্রকল্প এর আগেও অনেক তৈরি হয়েছে। এ বিষয়ে অন্য কী ধরনের কাজ হয়েছে তা জানা না-থাকলে ব্যাপক অর্থে কবিতা কোনো কিছুরই প্রতিফলন ঘটাবে না।

৮. লেখাটি প্রভাবিত করার মতো কিছু হয়নি। বরং গৎবাঁধা।

৯. কবিতা যা খুশি তাই একটা বিষয় নয়। এর জন্য ভাষা দরকার। চিন্তা দরকার। এবং সময়জ্ঞান থাকা দরকার। তা হলেই একে উপস্থাপন করা সম্ভব। অন্যথায়...

১০. প্রাথমিক পর্যায়ের উপলব্ধি।

১১. দুর্বল, ভীষণ দুর্বল। কারণ এইসব উপলব্ধির সাথে এর চারপাশ উঠে আসা খুব স্বাভাবিক। আবেগ, ভক্তি যুক্তি দ্বারা পরিশীলিত থাকাও ছিল স্বাভাবিক।

১২. অন্যান্য সময়ের কবিতা পাঠ এবং তার অভ্যাস এখানে স্থূলভাবে রয়ে গেছে। যা থেকে উত্তরণ খুব জরুরি।

১৩. কবির দৃষ্টিভঙ্গি থাকা চাই। এবং কবিতাকে প্রথম থেকে শেষ অবধি পৌঁছে দেয়া চাই। বাক্য যদি অর্থে, তাৎপর্যে আলাদা হতে না পারে তা হলে সবকিছু কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

১৪. নতুন প্রকরণ ব্যবহার করা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে তাকে সঠিক স্বরে তুলে ধরার চেষ্টা করা সফল কবিতার লক্ষ্য। এক্ষেত্রে তাত্ত্বিক বাস্তবতা নয়, আধ্যাত্মিকতা নয় বরং আত্ম আবিষ্কারই কবির কাজ। এক্ষেত্রে সে চেষ্টা কিছুটা লক্ষ করা গেল।

১৫. 'কবিতা কি' নয়? তবে চাতুর্যই শুধু কবিতা নয়, উপমাই শুধু কবিতা নয়। বাক্য, ধ্বনির ওপর নিয়ন্ত্রণ তৈরি করা, প্রয়োজনে এর কণাতরঙ্গ পর্যন্ত যাওয়ার চেষ্টাই বিষয় ও বক্তব্যকে দৃঢ়তায় পৌঁছে দেয়। যার চেষ্টা এখানে অনুপস্থিত।

১৬. ব্যবহৃত বাক্য স্থূল। বহুপরিচিত এবং একপেশে। সহজ, স্বাভাবিকতার ভেতরেই থাকে দ্বান্দ্বিক জগৎ। তাকে সৌন্দর্যের সাথে যৌক্তিক পরিণতি দিতে হয়। আর কবিই এর প্রথম শব্দশ্রমিক।

১৭. রিয়ালিটি ও আন-রিয়ালিটির জগৎ এখানে অসম্পন্ন। তাৎক্ষণিকতার মধ্যেই এর শুরু ও শেষ। এর মধ্যে ভ্রমণ করার সুযোগ নেই। থাকলে ভালো হত। কেননা, কবিতা পরম্পরার ধারা ও প্রকৃতিচালিত।

১৮. পুরোপুরি মৌলিক কিছু হতে হবে, এমন কোনো কথা নেই। কবিতাকে সৌন্দর্যের ভেতর আনা এবং এই চেষ্টা অনবরত করতে হয়। কারণ এর সাথে যুক্ত থাকে সমাজ বাস্তবতা। অতএব 'বেদেনী' হয়ে ওঠা কতটা স্বতঃস্ফূর্ততা বহন করে?

১৯. এটা একটা ন্যারেশন। এছাড়া আর কী? শুরুতেই বলেছি, কবিতার কিছু কৌশল অনুশীলন করতে হয় তা রপ্ত হলেই কবিতা সৃষ্টি করা সম্ভব। ভাষা ও চিন্তাকে পার্থক্য হিসেবে তুলে ধরাই কবিতার উদ্দেশ্য। যাই হোক, এ লেখা সম্পর্কে কিছু না-বলাই শ্রেয় মনে করি।

২০. অধিবাস্তবতাকে কাব্যিক করে তোলা এবং তাকে কল্পনার ভিতর চালিত করা এবং রহস্যমুখরিত রাখা শব্দের খেলা হতে পারে। কবিতা শব্দের খেলা হলেও শব্দের নৈরাজ্যেরও একটা শৃঙ্খলা সেখানে থাকে। যেখানে বিষয় অধিবাস্তবতার ভেতর প্রবেশ করলেও তার বাস্তবতাই প্রধান হয়ে ওঠে। যার ভেতর পাঠক, লেখক, সমালোচকের দৃষ্টিকোণটি একই সঙ্গে হাজির থাকে। এটা সেরকম একটা লেখা হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু এতে কী তৈরি হল সেটা ভেবে দেখা দরকার।

২১. বহুচর্চিত পণ্যায়িত স্বপ্নবাস্তবতার সাথে হাঁটাহাঁটি ছাড়া এ আর কি! দৈনিকের সাহিত্য সাময়িকীতেই এ ধরনের রমরমা কবিতা দেখা যায়।

কবীর চৌধুরী: তাঁর প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য

শফি আহমেদ

কবীর চৌধুরী চলে গেলেন। নিঃশব্দে, রাতের আঁধার আর ভোরের আলো ফোটার সন্ধিক্ষণে। অন্যতর ব্যঞ্জনায় বলা যায়, তিনি প্রস্থান করলেন একেবারেই নির্বিরোধে। শেষের বিশেষণটা ব্যবহার করলাম এমন ভাবনায় যে, যখন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, তখন বা তার কয়েক প্রহর আগে তিনি ভালোই ছিলেন বলে শুনেছি। শরীরের কলকব্জার সঙ্গে আর তাঁর তেমন বিরোধ লাগবার সম্ভাবনা নেই, সে কথা বুঝেই তো চিকিৎসকরা তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসার অনুমোদন দিয়েছিলেন। সারা জীবন নির্বিরোধ ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবন যাপনে অভ্যস্ত ও অনুরাগী ছিলেন, মরণেও তিনি সেটারই দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন। কবীর চৌধুরীর চলে যাওয়া আমাদের জন্য পরম বেদনার। একজন সত্যিকারে স্বজনকে হারিয়েছি আমরা। তাঁর নীরব প্রস্থান নিয়ে বারে বারেই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে, সেজন্যই বিষয়টা উল্লেখ করেছি। এমনকি ঘরের মানুষকেও সামান্য বিব্রত না করে পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবার সাধ আমাদের অনেকের মধ্যেই জাগে।

'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর সে কোথা কবে' অথবা পুত্রমৃত্যুতে শোকাহতা মায়ের প্রতি বুদ্ধদেবের যে নির্দেশ, এমন অনিবার্য সত্য বিষয়ে অবহিত থাকার পরও স্বজনের মৃত্যুকে মেনে নিতে বড়ই কষ্ট হয়। পরিণত বয়সেই কবীর চৌধুরী আমাদের ছেড়ে গেলেন। বিগত কয়েক বছরে আমাদের অগ্রজ অভিভাবকসকল, যেমন, কামরুল হাসান, মাহবুব-উল-আলম চৌধুরী, গাজীউল হক এবং কলিম শরাফীর বিদায়ের পর থেকে বার বারই নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেছি কবীর চৌধুরীসহ আরো কিছু প্রধান ব্যক্তির কথা। আমরা হয়তো আকস্মিকতায় হতবাক হইনি, দূরবর্তী বিচারে আমরা হয়তো অপ্রস্তুতও ছিলাম না, তবু তিনি যে চলে গেলেন তাতে বেদনাবোধের তেমন কোনো হেরফের হয়নি। বুকের অন্তঃস্থ কষ্ট গলা বেয়ে চোখের অশ্রুরেখায় মিশেছে। নশ্বর দেহের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের সময় পরস্পরের দিকে তাকিয়ে বুঝেছি আমাদের এক নিকটজন আর মর্ত্যলোকে নেই। পরিণত বয়সে জীবনাবসান আলাদা

করে কোনো সান্ত্বনা সৃষ্টি করতে পারেনি। 'আমাদের অপূরণীয় ক্ষতি হল'– এমন বিবৃতিকে যেন খুবই ম্রিয়মাণ মনে হয়।

কবীর চৌধুরী আমাদের সকলের কাছেই শিক্ষক হিসেবে সমধিক পরিচিত। তাঁর কাছে যারা পড়াশোনা করেছেন, তারা তো তাঁকে প্রকৃত অর্থে শিক্ষক হিসেবেই পেয়েছেন। তাঁর শিক্ষণপদ্ধতি ও কৌশলের সাক্ষী তারা। আমাদের সমাজে বিদগ্ধ শিক্ষকদেরকে সবাই নিজেদের শিক্ষক বলেই গণ্য করেন, তা তাদের অনেকেই আনুষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হলেও কিছু যায় আসে না। এমন ব্যক্তিরাই জানেন ও মানেন যে, এই প্রখ্যাত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে একাধিক প্রজন্মের শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করেছেন এবং তার মাধ্যমে ব্যাপক অর্থে সমাজে তিনি শিক্ষক হিসেবেই সকলের কাছে বিবেচ্য। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী এমন মানদণ্ডেই এদেশের আপামর মানুষের শিক্ষক বলে গণ্য হয়েছেন।

আমরা বহুজন তাঁকে কবীর স্যার বলেই উল্লেখ বা সম্বোধন করতাম। কিন্তু যখন তাঁর একটা প্রতিকৃতি রচনার চেষ্টা করছি, তখন ওই 'স্যার' শব্দটা আর যথার্থ বলে মনে হয় না। কারণ, উপনিবেশিকতার যে চেতন-অচেতন আচরণবৃত্তির মধ্যে ঘুরপাক আমাদের বাস্তব জীবনের অনিবার্য অঙ্গ হয়ে উঠেছে, তাতে ওই 'স্যার' কথাটার সঙ্গে সম্বোধিত ব্যক্তির কর্তৃপক্ষীয় বা উচ্চমার্গীয় অবস্থান এবং তারই আবশ্যিক সূত্র ধরে সম্বোধনকারীর হীনাবস্থার একটা সংকেত থেকেই যায়। সামরিক বাহিনী বা আমলাতন্ত্রের বৃত্তে এর প্রথাগত ব্যবহার তাকে একটা কায়েমি চরিত্র দিয়েছে। অধঃস্তন তার ওপরওয়ালাকে সবসময় 'স্যার' বলে সম্বোধন করেন। তা না-হলে অসদাচারণ বলে গণ্য হয়। কিন্তু যখন কবীর স্যার বলি, তখন নিশ্চয়ই আমরা তাঁর সমুন্নত মেধা ও আহৃত জ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। উচ্চ-নীচের কোনো তারতম্য তখন কোনোভাবেই প্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু আবার যখন তাঁকে 'শিক্ষক' বলে চিহ্নিত করতে চাই এবং যে পরিচয় তিনি নিজের জন্য সুনির্দিষ্ট করে গেছেন, তখন আমরা যা অনুধাবন করতে চাই, তা হল, তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির বিস্তৃত সীমানার বাইরেও তিনি তাঁর কর্মের ভেতর দিয়ে, বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে এবং অব্যয় অনুশীলনের মাধ্যমে যে জীবনাচরণের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তা থেকে আমাদের সকলেরই নিরন্তরভাবে শিক্ষণীয় বিষয়-আশয় আহরণের অবকাশ রয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কবীর চৌধুরীকে আর প্রচলিত অর্থে শিক্ষাদাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয় না। তাঁর যাপিত জীবন আমাদের কাছে একটা শিক্ষালয় হয়ে ওঠে।

পেশাগত জীবনে তাঁকে আমরা শিক্ষক হিসেবে দেখেছি। কর্মজীবনের বড়ো অংশটা জুড়েই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। প্রকৃতপক্ষে দেশের এই সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকতার দৈর্ঘ্য সাধারণ্যে তাঁকে অমন পরিচয়েও চিহ্নিত করলেও তাঁর এই পেশার জগৎ ছড়িয়েছিল দেশের অন্যান্য কয়েকটি জায়গায়, অনেকে সেকথা জানেন না বা ভুলে গেছেন। কিন্তু আমি যেকথা বলার চেষ্টা

করছি তা হল, কবীর চৌধুরীকে যখন জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে স্বীকৃত দেয়া হল, তখন আমাদের কাছে যা মুখ্য হয়ে ওঠে, তা কিন্তু তাঁর দীর্ঘদিনের অধ্যাপনা পেশা নয়, পেশাগত জীবনের বৃত্তের বাইরে বৃহত্তর সামাজিক পরিমণ্ডলে তাঁর সক্রিয় সংশ্লিষ্টতা এবং সার্থক বিচরণ তাঁকে ওই মর্যাদার যোগ্য করে তুলেছে এবং এমন এক সামগ্রিক মানদণ্ডে তিনি যথাযথভাবেই এবং জাতীয়ভাবে এদেশের সকল মানুষের জন্য অধ্যাপক হয়ে উঠেছেন। জাতীয় অধ্যাপক সম্মাননা শুধু তাঁর অমন ভূমিকারই স্বীকৃতি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গটার আর একটু বিস্তার ঘটাতে চাই। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র তিনি। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ফলাফলের ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্য দেখিয়েছিলেন। এই স্মৃতিতর্পণমূলক রচনাটি লিখতে গিয়ে একটা কথা মনে হচ্ছে, তাঁর সঙ্গে বহু বার বহু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে নানা আত্মজৈবনিক প্রসঙ্গ এসেছে। বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির পুরোধাদের যে শ্রুতিদর্শনমূলক (audio-visual) জীবনকথা ধারণের একটা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, তার আওতায় কবীর চৌধুরীর জীবনসায়াহ্নে এমন ইতিকথা ধারণে আমি সূত্রধরের ভূমিকা পালন করেছিলাম। তখনও জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি যে, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাবার পর পরই তিনি ইংরেজি বিভাগে কেন যোগদান করেননি, এর পেছনে কোনো আলাদা কারণ ছিল কি না। সেটাও হয়তো সম্ভবপর। তিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আজ আর তাঁর বয়সি এমন কেউ আমাদের মাঝে নেই, যাঁকে জিজ্ঞেস করলে কোনো প্রামাণিক উত্তর পাওয়া যাবে। তাঁর সঙ্গে কথার সূত্রে যা জেনেছিলাম তা হল, প্রথমে তিনি সরকারি দপ্তরে যোগদান করেন এবং এর কিছুকাল পরই সরকারি কলেজে পাঠদানের কাজে যোগদান করেন। অধ্যাপক চৌধুরী বিশেষভাবে তাঁর বরিশাল ব্রজমোহন কলেজ ও ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে শিক্ষা এবং প্রশাসনিক কাজে যুক্ত থাকার নানা অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন। সেসময় এমন সব জেলাশহরেও সংস্কৃতিচর্চার নানা কথা তাঁর কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম। তখনকার দিনে সরকারি চাকরিজীবী হিসেবে অধিকতর জনসংযোগের ক্ষেত্রে কিছু বিধি-নিষেধ ছিল। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ভেতরে নানা সাংস্কৃতিক কার্যক্রম গ্রহণে তিনি সবিশেষ উৎসাহ প্রদান করতেন।

আমার ব্যক্তিগত মূল্যায়নটা এমন যে, কবীর চৌধুরী নিজের মেধা, অগ্রাধিকার এবং যে কোনো কাজে নিজেকে সংযুক্ত করার বিষয়ে ব্যক্তিগত বিচারে একটা সুচিন্তিত অবস্থান গ্রহণে আগ্রহী ছিলেন, যার মধ্যে শুদ্ধ ও পরিমার্জিত রুচির সঙ্গে ন্যায়বোধের সমন্বয় ঘটে। তাই সরকারি কাজ করতে তিনি যেমন দ্বিধান্বিত বোধ করেননি, তেমনি বাঙালি ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি দায়বদ্ধতার ক্ষেত্রেও তিনি আজীবন সত্যসন্ধ ছিলেন। আবেগের সঙ্গে মননের যৌথতা রচনায় তিনি পারদর্শী ছিলেন বলেই মনে হয় আমার। আমরা অনেকেই যখন লঘু কোনো বিষয়েও ভয়ানক শ্রুতিযোগ্যভাবে উচ্চবাক হয়ে সবার কাছে নিজের অবস্থানটা পরিজ্ঞাত করার বিষয়ে বিশেষভাবে যত্নবান হই,

তখন অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর জীবন পর্যলোচনা করলে দেখব যে, গুরু-বিষয়ে তাঁর তীব্র প্রতিবাদ ও পর্যবেক্ষণ করার ক্ষেত্রেও তিনি স্বল্পবাক, কিন্তু যা বলছেন বা যে অভিমত দিচ্ছেন তা অত্যন্ত গভীর ভারবাহী, সুচয়িত শব্দের মোড়কে ভরা, কিন্তু তার অন্তঃস্থ শক্তিটাকে বুঝতে বেগ পেতে হয় না।

১৯৭১ সাল তো বির্তকাতীতভাবে আমাদের দেশের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। প্রকৃতপক্ষে, আমাদের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ ও বিজয় একদিকে যেমন আমাদের জীবনটাকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে পাল্টে দিয়েছিল, অন্যদিকে উপমহাদেশীয় রাজনীতির অঙ্গনে তা ভিন্ন সমীকরণ এনে দিয়েছিল। ১৯৭১ সাল কবীর চৌধুরীর জীবনেও একটা তাৎপর্যবহ বাঁক সৃষ্টি করেছিল বলে আমার মনে হয়। স্বাধীনতা অর্জন যেমন অনেক সাধারণ মানুষকে 'স্বাধীন' হবার কী অর্থ হতে পারে, তার ভাবনা ও অনুসন্ধানে তাড়িত ও বিহ্বল করেছিল, তেমনি স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে ষাটের দশকের দীর্ঘ রাজনৈতিক আন্দোলন, তদুপরি এই মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষের আত্মত্যাগ, পাকিস্তানী শাসকদের নয় মাসব্যাপী পৈশাচিকতা ইত্যাদি বিষয় বহু সংখ্যক সক্রিয়-রাজনীতি-নিরপেক্ষ মানুষকেও ভিন্নভাবে ভাবতে প্ররোচিত করেছিল। মুক্তিযুদ্ধ ও তার বিজয়ের মতো ঐতিহাসিক, জাতীয়তাবাদসংশ্লিষ্ট ও একই সঙ্গে প্রবল ভাবগত প্রভাব সৃষ্টিকারী ঘটনা তেমন প্রকরণের অনুভাবনার জন্ম দেয় সমাজের শরীরে-মনে।

কবীর চৌধুরী, আমার বিচারে, ১৯৭১ সালের পর, তাঁর মেধা ও বিবেচনা দিয়ে বাংলাদেশ ও এর সমাজকে নতুন দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করলেন। খ্যাতিমান ভ্রাতা অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীকে স্বাধীনতার সূর্যোদয়ের ঠিক প্রাক-ক্ষণে হারিয়েছেন, তাঁর চেনা বহু স্বজনও হারিয়ে গেছেন। ১৯৭১-র অভিজ্ঞতা তাঁকে বিশেষভাবে চালিত করেছিল তাঁর নতুন ও বলিষ্ঠ ভূমিকায়। স্বাধীনতা লাভের পরপরই অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বাংলা একাডেমীর পরিচালক পদে নিয়োগ পান। বাঙালি জাতির স্বাধীন সার্বভৌম আবির্ভাবে এই প্রতিষ্ঠানটির নাম ঐতিহাসিকভাবে যুক্ত। পাকিস্তানী আমলে এই সংস্থাটি স্বাভাবিক কারণে তার বিকাশ ঘটাতে পারেনি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায়। স্বাধীন দেশে, একদিকে আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর পাকিস্তানী অবদমন থেকে মুক্তি, অন্যদিকে বিশ্বসভায় আমাদের সাহিত্য ও ঐতিহ্যের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব করার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছিল। কবীর চৌধুরীর নেতৃত্বে সেই কাজটি সংগঠিত হবার সম্ভাবনা আছে এমন যুক্তিতেই তিনি ওই পদে নিয়োগ পান, এমনটা অনুমান করতে পারি। এবং তিনি এই নিয়োগের মর্যাদা রেখেছিলেন। কিন্তু তিনি এই পদে দীর্ঘদিন ছিলেন না।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন দেশের সরকারি প্রশাসনযন্ত্রে নতুন মাত্রা ও গতিশীলতা আনার জন্য কবীর চৌধুরীকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে নিয়োগ দান করেন। বহু দিন শিক্ষাদান ও প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন তিনি। যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশের তাৎক্ষণিক এবং দীর্ঘমেয়াদি চাহিদা নিরূপণ ও তা বাস্তবায়নের জন্য আমলাতন্ত্রের বাইরের একজনকে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গায় আনতে চেয়েছিলেন।

দুঃখ লাগে যে, আমি এই কথাটাও তাঁকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করব ভেবেছি, কিন্তু করা হয়নি। শিক্ষাসচিবের দায়িত্ব থেকে তিনি কেন সরে এলেন বা তাঁর ওই অবস্থানের জন্য প্রশাসনযন্ত্রে কোনো বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন কিনা। তবে তিনি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক পদে নিয়োগ লাভ করেন, সেই বিষয়টা এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমণ্ডলীর ভেতরে এক ধরনের অপ্রীতি, অস্বস্তি ও কিছুটা অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। ওই সময়কার পত্রপত্রিকায়, বিশেষ করে সাপ্তাহিক *বিচিত্রা*-য় নানারকম লেখালেখি হয়েছিল।

কিন্তু অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর চরিত্র মূল্যায়নে এই বিষয়টাও আমার কাছে জরুরি হিসেবে বিবেচিত হয়। তিনি এই নিয়োগ বিষয়ে কোনো বিতর্কে নিজেকে জড়াননি, কোনো রকমের উষ্মা প্রকাশ করেননি। সেসময় তাঁর সঙ্গে আমার এক ধরনের প্রান্তিক পরিচয় ছিল মাত্র। তাই এ নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে আলাদা করে কোনো মন্তব্য করতে পারব না। কিন্তু কাল পরিক্রমায় যা দেখেছি, তা হল, তিনি তাঁর মধুর ব্যক্তিত্ব দিয়ে সবাইকে আপন করে নিতে পেরেছিলেন। শোভনতায়, সদাচারণে ও মিষ্টভাষ্যে তিনি ছিলেন তুলনাহীন। তাঁর এই নির্বিরোধ অবস্থান সবাইকেই মুগ্ধ করেছিল। কবীর চৌধুরীর মধ্যে যে অতুলন ও সহজাত সহনশীলতা ছিল, তা বোধ হয় গণতান্ত্রিকতার এক আভিধানিক আদর্শ। তিনি সহজেই বুঝতে পারতেন, তাঁর নিজের বিভাগ বা অন্য বিভাগের সহকর্মীদের মধ্যে কতিপয় ব্যক্তি তাঁর প্রতি বীত-অনুরাগ ছিলেন, কিন্তু তিনি যখন তাদের সঙ্গে সাধারণ সৌজন্যবোধ প্রদর্শন করতেন বা কোনো বিষয়ে আলোচনা করতেন, তাঁর মুখে থাকতো সুমিষ্ট হাসি ও অভ্যর্থনার লক্ষণ। ভিন্নমতকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন, যুক্তিযুক্ত হলেও কখনও উত্তেজিত কণ্ঠে নিজের মত চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন না। শিক্ষক হিসেবে তিনি ছাত্রছাত্রীদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি পেশাদারিত্বের এক চমৎকার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। ক্লাস নেয়ার ব্যাপারে সর্বদাই অত্যন্ত নিয়মিত, শিক্ষাদানে অননুকরণীয়ভাবে নিয়মনিষ্ঠ ও সময়নিষ্ঠ ছিলেন। একদিনও কোনো অজুহাতে ক্লাসে ফাঁকি দেননি, ব্যক্তিগত গল্পের ঝুড়ি থেকে কাহিনীবর্ণনায় শিক্ষকতার সময় অপচয় করেননি, বিভাগীয় সভায় দেরি করে আসেননি, জ্যেষ্ঠ অধ্যাপক হিসেবে কোনো নতুন কোর্স দেয়া হলে তা নিয়ে আপত্তি করেননি। নিজের মন্তব্য বা প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে কোনো সহকর্মীর প্রতি রুষ্টতা প্রদর্শন করেননি, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র একেবারে সঠিক সময় বা তার আগে জমা দিয়েছেন, পরীক্ষার খাতা দেখে ফেরত দেবার ব্যাপারে সেই একইরকম পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কর্তব্যনিষ্ঠা ও পরিশীলিত আচরণের এসব বিষয় আমাদের সামনে সত্যিকারের আদর্শ। আজ যখন অনেক শিক্ষকের মধ্যে দায়হীনতা, কর্তব্যজ্ঞানহীনতা ও নিম্নতম সহনশীলতার অভাব লক্ষ করি, তখন প্রথমেই মনে পড়ে আমাদের এই অনন্যসাধারণ শিক্ষকের কথা, যিনি দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহিতার অসামান্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

আগেই বলেছি, তিনি আমাদের জাতীয় শিক্ষালয়ের প্রতীক। তার সঙ্গে কবীর চৌধুরীর পেশাগত শিক্ষকতাজীবনের যোগটা মুখ্য নয়। তবে সাম্প্রতিক কালে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে যে অপ্রত্যাশিত রুক্ষতা, বিরোধিতা ও স্বার্থপর দলাদলি দেখা যাচ্ছে, তখন আবার কবীর চৌধুরীর সেই গণতান্ত্রিক মুখশ্রী মনে পড়ে যায়। ঠিক এই সূত্রে একটা কথা মনে পড়ছে। বোধ হয়, তা এখানে লিপিবদ্ধ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রথম সামরিক শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে বিভিন্ন ডানপন্থী ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধীদের প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সমাবিষ্ট করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটে রেজিস্টার্ড গ্রাজুয়েট থেকে সদস্য নির্বাচন করার জন্য অভিন্ন ঠিকানায় অসংখ্য ভোটার নিবন্ধন করা হয় অত্যন্ত অনৈতিক পন্থায়। কিন্তু সেই সিনেটের মাধ্যমে যে তিনজনের নাম উপাচার্যের প্যানেলের জন্য তালিকাভুক্ত হয় তার প্রথম ব্যক্তিই ছিলেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। সামরিক শাসনকর্তার বিবেচনায় কবীর চৌধুরীর উপাচার্য পদে নিযুক্তির কোনো সম্ভাবনা অবশ্য ছিল না। 'আচার্য' জিয়াউর রহমানের অধীনে তিনিও কাজ করতে সম্মত হতেন বলে মনে হয় না।

বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা, গণতান্ত্রিক রাজনীতি হত্যা, সামরিক শাসন এবং দেশে পাকিস্তানি মনোভাবের পৃষ্ঠপোষণা ও মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের প্রতি রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে হুমকি প্রভৃতি আমাদের দেশ ও সমাজব্যবস্থায় ভয়াবহ প্রভাব বহন করে এনেছিল। গণতন্ত্রকামী মানুষ অসহায় বোধ করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় যেসব দেশ আমাদের স্বাধীনতালাভে সর্বাত্মকভাবে সহযোগিতা করেছিল, তাদের প্রতি রাষ্ট্রীয়ভাবে আমাদের বিরাগ প্রকাশ্য হয়ে উঠেছিল। এমন এক ক্রান্তিকালে এদেশের অগ্রগামী বুদ্ধিজীবীবৃন্দ ষাটের দশকের অনুরূপ ভূমিকা পালনে ধীরে ধীরে সংগঠিত হতে লাগলেন। এই সময় থেকেই অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে আমাদের নেতা হিসেবে পাশে পেয়েছি। দেশে রাজাকারশ্রেষ্ঠ গোলাম আযম ফিরে এসেছেন এবং তার রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামি শক্তি সঞ্চয় করছে এবং তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়ায় দেশে শুধু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে না, ইসলামি মৌলবাদী মওদুপন্থী চিন্তা-চেতনার বিস্তার ঘটেছে। জিয়াউর রহমান পবিত্র সংবিধান থেকে দুই স্তম্ভ– সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা কর্তন করলেন। এমন সময় সমাজের উদারবাদী চেতনা ও গণতান্ত্রিক বোধ সুদৃঢ় করার প্রয়াসে প্রগতিশীল ব্যক্তিদের সম্মিলিত মঞ্চ গড়ে তোলবার প্রয়োজন দেখা দেয়। সেই সম্মিলনী গড়ে তোলার প্রয়াসে আমরা যাদের সারথি হিসেবে বিবেচনা করেছিলাম, তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কবীর চৌধুরী। আমাদের সঙ্গে আরো ছিলেন সুফিয়া কামাল, কামরুল হাসান, কলিম শরাফী, সরদার ফজলুল করিম, বিচারপতি মাহবুব মুর্শেদ, ব্যারিস্টার ইশতিয়াক আহমেদ, শামসুর রাহমান, অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ, রেহমান সোবহান, আনিসুজ্জামান প্রমুখ।

দেশের বিভিন্ন জায়গায় আমরা বিভিন্ন উপলক্ষ ঘিরে ছোট আকারের সভার আয়োজন করেছি। রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী, একুশে ফেব্রুয়ারি, পহেলা বৈশাখ নানা

অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলেছি। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী সেসব সভায় এসেছেন, স্বল্পকথায় মূল বক্তব্য প্রদান করেছেন, লেখা দিয়েছেন। তাঁর উপস্থিতি আমাদের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন অনেকদিন ধরেই এমন ঝুঁকিপ্রবণ ছিল যে, কোনো আলাদা কর্মসূচি গ্রহণের কোনো সুযোগ ছিল না। অথচ বিভিন্ন বিরতিতে সরকারি উদ্যোগ অথবা প্ররোচনায় সমাজটাকে বিভক্ত ও ডানমুখী করার প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। আমাদের কাছে তখন মাত্র একটা অশাণিত অস্ত্র ছিল, যদিও সারা দেশের মানুষের কাছে বার্তা পাঠানোর জন্য তা ছিল এক অনস্বীকার্য জাতীয় হাতিয়ার, আর তা হল, বিভিন্ন বিষয়ে বিবৃতি প্রদানের মাধ্যমে আমাদের প্রতিক্রিয়া, প্রতিবাদ ও দাবি জ্ঞাপন। মনে পড়ে প্রতি সপ্তাহে তখন গড়ে দু'দিন আমাদের বিবৃতি প্রদান করতে হত। বাঙালির স্মৃতিশক্তির ওপর আমার তেমন আস্থা না থাকার জন্য মনে করিয়ে দিতে চাই, চলচ্চিত্র ও নাটকে 'জয় বাংলা' শ্লোগান নিষিদ্ধ, টেলিভিশনের নাটকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিকল্পে শুধুই হানাদার হিসেবে উল্লেখ, অমন নাটকে শশ্রুমণ্ডিত কোনো ব্যক্তি বা মাদ্রাসাশিক্ষককে অনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে উপস্থাপন করা যাবে না, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে নারীরা কপালে টিপ পরতে পারবে না, নাটক প্রযোজনার জন্য আগেই সরকারি ছাড়পত্র নিতে হবে, এমন অনেক কিছু। আরো মনে করিয়ে দিতে চাই আধুনিক মীরজাফর খোন্দকার মোশতাকের সরকারিভাবে টুপি পরিধানের আদেশ এবং সরকারি মদদে ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নিহত হবার দিনটিকে 'নাজাত দিবস' হিসেবে উদযাপন। আর তখন যেহেতু দেশে রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ (এই সময়সীমার মধ্যে জেনারেল এরশাদের শাসনামলও অন্তর্ভুক্ত), তাই তাৎক্ষণিক এবং যথাযথভাবে তৈরি করা বিবৃতির মাধ্যমেই জনমত সংগঠিত করার উদ্যোগ নিতে হত আমাদের। অধ্যাপক কবীর চৌধুরী সব সময় আমাদের এমন উদ্যোগ সমর্থন করেছেন, একাত্মতা ঘোষণা করেছেন। আর যে কথাটা জোর দিয়ে বলতে চাই, তিনি যখন বেশ কয়েক বছর গুলশানে বাস করতেন এবং সেকারণে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগে কিছু ঘাটতি ঘটত, তিনি বিশেষ করে আমাকে বলেছিলেন, বিবৃতির বিষয়টা যেন শুধু তাঁকে জানিয়ে দিই, অনেক সময় তাঁকে ফোনে সবটা পড়ে শোনাতে চাইলেও তিনি বলতেন, 'তুমি লিখেছ তো বা তুমি নিজে দেখে দিয়েছ তো'। আমার উত্তর হ্যাঁ-বাচক হলে তিনি বিনা প্রশ্নে তাঁর নাম সংযোজনের অনুমতি দিতেন। মনে পড়ে, সুফিয়া কামালও আমার প্রতি এমন আন্তরিক প্রশ্রয় ও আস্থা দেখিয়েছিলেন।

কয়েকটি ফোরামে অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর সঙ্গে একত্রে কাজ করেছিলাম। সামরিক শাসন যখন একটু একটু করে গা-সওয়া বা শিথিল উঠছিল, তখন আমরা আন্তর্জাতিক প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে বাংলাদেশে আফ্রো-এশীয় লেখক সংঘ সংগঠনটিকে চাঙা করার প্রয়াস নিই। বেশ কয়েকটি সভা হয়েছিল। কবীর চৌধুরীই এই সংগঠনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়া তিনি বাংলাদেশ শান্তি পরিষদ

ও আফ্রো-এশীয় গণসংহতি পরিষদের কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও শিল্পীদের অনেকেই এসব সংগঠনের কার্যক্রমে অংশ নিতেন। যে সংগঠনটিতে আমি কবীর চৌধুরীর সঙ্গে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছি এবং নানা সময়ে তার উপদেশ প্রার্থনা করেছি, সেটা হল বাংলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতি। তিনিই এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। এরশাদের শাসনামলের আগে অবশ্য এর কোনো কার্যক্রম শুরু করতে পারিনি। আমাদের তখন বেশ একটু নাজুক অবস্থা। অধুনালুপ্ত টঝঝজ দেশটির সঙ্গে সরকারিভাবে আমাদের সম্পর্ক শীতল। প্রতি বছর লেনিনের জন্মদিন ও ৬ নভেম্বর বিপ্লব দিবসের আয়োজন ছাড়া আমাদের প্রধান দু'ধরনের কর্মতৎপরতা ছিল। এক. প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত দরিদ্র পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের সোভিয়েত ইউনিয়নে বৃত্তি নিয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা এবং দুই. *মৈত্রী* নামে একটি মাসিক পত্রিকার প্রকাশনা। এই পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে কবীর চৌধুরীর নাম ছাপা হত, কিন্তু যাবতীয় দেখাশোনা, মুদ্রণ, বিতরণ ও লেখা সংগ্রহের কাজ করতাম আমি। এ বিষয়ে আমার ওপর তাঁর অগাধ আস্থা ছিল। আবদুল মান্নান খান, যিনি বর্তমানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের গণপূর্ত ও গৃহায়ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী, তিনিও এই সংগঠনের সক্রিয় কর্মী ছিলেন।

থিয়েটার ও নাট্যচর্চার সূত্রেও অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ও সখ্য গড়ে ওঠার সুযোগ ঘটে। সাহিত্যের নানা অঙ্গনের প্রতি তার দুর্বলতা থাকলেও আমার মনে হয়েছে নাটকের প্রতি তাঁর একটা স্বতন্ত্র আসক্তি ছিল। এই ব্যাপারে আমিও তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগী। তিনি বহু নাটক অনুবাদ করেছেন। মুনীর চৌধুরী শেকস্‌পিয়রের *ওথেলো* নাটকটির অনুবাদ শুরু করেছিলেন, শেষ করতে পারেননি। কবীর চৌধুরী ভ্রাতার পথ অনুসরণে তার অনুবাদ সমাপন করে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে প্রলুব্ধ বোধ করছি। এই কথাটা স্যার দু'এক বার আমাকে বলেছেন, এমনকি বাংলা একাডেমীর ধারণ করা তথ্য-ভিডিওতেও উচ্চারণ করেছিলেন যে, আফ্রিকার ব্রিটিশ উপনিবেশসমূহের কালো মানুষদের ইংরেজি রচনা পাঠ ও অনুবাদের বিষয়টির অবতারণা করেছিলাম আমি, স্যারকেও এ বিষয়ে আগ্রহী ও সক্রিয় হতে অনুরোধ করেছিলাম। এবং তিনি আমার প্রস্তাবনায় ইতিবাচকভাবে সায় দিয়েছিলেন। এদেশের অন্যতম প্রধান সারির নাট্যদল অখণ্ড **থিয়েটার** এবং পরবর্তীকালে বহুখণ্ডিত রামেন্দু-মামুন অংশের সভাপতি ছিলেন তিনি। এই দলের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল বা আছে। *থিয়েটার স্কুল* নামে বেসরকারি পর্যায়ে নাট্যশিক্ষার কাঠামোগত প্রশিক্ষণের যে সংগঠনটি প্রায় দু'দশক ধরে চলমান, তার অধ্যক্ষ ছিলেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই স্কুলের শিক্ষকতা ও শিক্ষাক্রমের সঙ্গে আমার যোগ রয়েছে। একবার দু'বার এমন হয়েছে, কবীর স্যার পাশ্চাত্য থিয়েটারের ইতিহাস পাঠনের প্রথমাংশ শেষ করেছেন, তারপর থেকে আমি শুরু করেছি।

আর একটা প্রসঙ্গ উল্লেখ করা একান্তভাবে প্রয়োজন। বর্তমানে নাটকের প্রধান বিশ্বসংস্থা International Theatre Institute-এর সভাপতি রামেন্দু মজুমদার। তিনি পরপর দু'বারের জন্য এই পদে নির্বাচিত হয়েছেন। এই সংগঠনটির বাংলাদেশ কেন্দ্রের প্রথম যে কমিটি গঠিত হয় তার সভাপতি নির্বাচিত হন কবীর চৌধুরী। আমি নির্বাহী পরিষদের সদস্য। অদ্যাবধি আমিও এই সংগঠনের একজন কর্মকর্তা এবং পরবর্তীকালে বয়সের কারণে অতটা সংশ্লিষ্ট থাকা সম্ভবপর না হওয়ায় অধ্যাপক চৌধুরী আমৃত্যু এই সংস্থার অন্যতম President of Honor হিসেবে যুক্ত ছিলেন। প্রতি দু'বছরের বিরতিতে এই সংগঠন আন্তর্জাতিক সেমিনার ও নাট্যোৎসবের আয়োজন করে থাকে। কবীর চৌধুরী এ পর্যন্ত আয়োজিত দশটি বিশাল উদ্যোগে নানাভাবে ভূমিকা পালন করেছেন। কাজের এই সূত্রটাও আমার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগটাকে অক্ষুণ্ন রেখেছিল।

আর একটি সংগঠনের কথা সলজ্জভাবে উল্লেখ করতে চাই। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের উদ্যোগে বিগত মধ্য-আশিতে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠদানদারী ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষকদের একটি মাঝারি মাপের সম্মেলন হয়েছিল এবং সেখান থেকেই গঠিত হয়েছিল The English Association of Bangladesh। সাংগঠনিক ক্রিয়াকর্ম দক্ষভাবে চলেনি বিবিধ কারণে। প্রধানত দেশের বিভিন্ন অংশে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি শিক্ষকদের সম্মিলিত হবার নানান অসুবিধার জন্য। তা-ও বার কয়েক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে চট্টগ্রাম ও ঢাকায়। সর্বশেষ যে নির্বাহী পরিষদ গঠিত হয়, সে-ও বিগত শতাব্দীর শেষ ভাগে, তার সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী। আমি এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পাই। আমাদের ব্যাংক হিসাবে কিছু টাকা ছিল। সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধাবলি নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশের কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড এ বিষয়ে আমাদের সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছিল। আমি এবং আর একজনের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশনাটা বেরোনোর কথা ছিল। একেবারে শেষে এসে গড়িমসি ও দু'জনের সময় আর কার্যকরভাবে যূথবদ্ধ না হওয়ায় এই মুল্যবান প্রকাশনাটি আর আলোর মুখ দেখেনি। নিজেকে বার বার তিরস্কার করেছি এই কাজটা সফলভাবে সমাপন করতে পারিনি বলে। কবীর স্যার কয়েকবার আমাকে বলেছিলেন, 'শফি বইটা বার করো, তারপর এর একটা প্রকাশনা অনুষ্ঠান করে let us announce the decent death of the organization'। ওই কাজটি আর হয়নি। বেদনার সঙ্গে তার দায়ভার নিজের কাঁধে তুলে নিচ্ছি, যদিও অন্যান্য কিছু উপাদান নানাভাবে বাদ সেধেছিল।

অধ্যাপক কবীর চৌধুরীকে আমরা এদেশের সকল প্রগতিশীল আন্দোলনের সক্রিয় সাথী হিসেবে পেয়েছি। তিনি শহীদ মিনারে নানা দাবি আদায়ের সংগ্রামে মিলিত হয়েছেন। একটা বিষয় আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। সাধারণ অভিজ্ঞতায় দেখি শুধু আমাদের এই প্রাচ্যদেশসমূহে নয়, পাশ্চাত্যেও কোনো ব্যক্তি যতই বার্ধক্যের দিকে ধাবিত হন, তখন সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিষয়ে ধীরে ধীরে তাঁর যৌবন বা মধ্যবয়সের উচ্ছ্বাস কমে আসে, তিনি ক্রমবর্ধমানভাবে তাঁর নিজের পরলোকের সঞ্চয় বিষয়ে হিসাব-নিকাশ করতে থাকেন। কবীর চৌধুরী অসাধারণ যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল ও মুক্তবুদ্ধি চর্চার মানুষ ছিলেন বলেই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরো দৃঢ়বাক, প্রতিবাদমুখর ও আপোসহীন হয়ে উঠেছেন। মৌলবাদী শিবির তাঁকে 'মুরতাদ' আখ্যা দিয়ে জীবননাশের হুমকি দিয়েছে। তিনি ভয় পাননি। 'একাত্তরের ঘাতক-দালাল-নির্মূল কমিটি'-র নির্বাহী সভাপতির কাজ করেছেন আমৃত্যু, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। মৌলবাদবিরোধী ও সম্প্রদায়বিভেদবিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অশীতিপর হওয়া সত্ত্বেও এসব কাজ থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করেননি। স্পষ্টভাষায় নিজের মত প্রকাশ করে গেছেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নিজেকে কর্মরত রেখেছেন। প্রাত্যহিক অনুবাদ কর্ম হোক, বাংলা একাডেমীর সভাপতির দায়িত্ব হোক অথবা যে কোনো সামাজিক দায়বদ্ধতার আহ্বান হোক, তিনি শরীরের প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে, যতদূর সম্ভব সবকিছুতে দায়বদ্ধভাবে সাড়া দিয়েছেন।

মানুষের প্রতিপক্ষ ঘুণপোকা
ঘুণপোকার প্রতিপক্ষ মানুষ মানুষের প্রতিপক্ষ মানুষ

....

তা রে ক শা হ রি য়া র

[২০০৩ সালের ৫ জুন-এ মহেশখালিতে তারেক শাহরিয়ার-এর অকাল মৃত্যু হয়। জন্ম: ১৫ আগস্ট ১৯৬২। ছোটগল্প এবং চলচ্চিত্র নির্মাণ–উভয় মাধ্যমেই তাঁর ছিল শ্রেণীগত অবস্থান; নিপীড়িতের পক্ষে হাতেগোনা শিল্পীদের মধ্যে তিনি বড় প্রভাবক হয়ে উঠেছিলেন; সকল যোগ্যতা যখন হাতের মুঠোয় ঠিক তখনই সমাপ্ত না-করতে পারা অনেক কাজ আর স্বপ্ন রেখে মৃত্যুর ডাকে চলে যেতে হয় তাঁকে। মৃত্যুর কাছাকাছি কোনো এক সময়ে, শাহবাগ আজিজ সুপার মার্কেটের নিচতলার একটি কক্ষে আয়োজিত, কবি শান্তনু চৌধুরীর কবিতা পাঠ ও আলোচনাসভায় আমি শান্তনু দা-র কবিতার বিরূপ সমালোচনা করলে, তারেক ভাই আমার ওপর ভীষণ ক্ষেপে গিয়েছিলেন– তার সঙ্গে সে-ই আমার শেষ দেখা। তার সৃষ্টির প্রতি আমার দুর্বলতা আর আমার ওপর তাঁর সেই রাগ– এই দুই-ই তাঁর অনুপস্থিতিকে ম্লান করে রাখে আমার কাছে। 'কালিঘর', 'জল ও চাকা', 'প্রজাপতির ডানা', 'বিহাইন্ড দি গ্রীন রেভুলেশন', এবং 'আমা'-র মতো উল্লেখযোগ্য কাজ রেখে গেছেন; কিন্তু এসব কাজকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দেবে কে?... মানুষ যায় মানুষ আসে; যে যায় সে তো আসে না! যেই রূপ শুরু হয় সেই রূপ শেষ হয় না... । এই জুনে তাঁর একটি গল্প প্রকাশ করে তাঁকে আমরা স্মরণ করছি। – **শওকত হোসেন, সম্পাদক, গোলাঘর**]

ক.

বাল্বটা নিভিয়ে দিলে দেয়ালে চারকোণা আলো পড়ে। তখন মনে হয়, আসলে কেবলমাত্র অন্ধকার বলে কিছু নেই।

জীবনটাকে চারকোণা আলোর মধ্যে ছুঁড়ে দিতে কি-না ভালো লাগে। যেন পৃথিবীর তাবৎ আলো ঘনীভূত হয়ে ওই দেয়ালে পড়েছে, আর জীবন সেখানে আনন্দে হাততালি দিচ্ছে।

তারপর–

ভাবনা ক্রমাগত এলোমেলো হতে থাকে। নিজেকে খুঁড়তে খুঁড়তে ঘুমিয়ে পড়ি, কোনও কোনও দিন ঘুম আসে না।

খ.

দু-একটি রাত টিকটিকির খসে পড়া লেজের মতো কাঁপতে থাকে, ঘুমের ভেতর। শাদা কাপড়ের আব্রু ভেদ করে, আমি নিজের শবযাত্রা নিজেই প্রত্যক্ষ করবার চেষ্টা করি। আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সেখানে, যেখানে আমার পূর্ব-পুরুষের হাড়গোড়ের চিহ্ন মাটি হয়ে গেছে।

পথচারীদের একজন, যে সম্ভবত আমার পূর্ব-পরিচিত, আস্তে আস্তে বলে, 'আহা ছেলেটা শেষ পর্যন্ত মরে গেল!'

শবযাত্রীদের মধ্যে থেকে একজন বলে ওঠে, 'ব্যক্তির মৃত্যু আছে, কিন্তু মানুষের মৃত্যু নেই।'

কর্পূরের গন্ধে ভারি বাতাসের কণ্ঠনালী চিরে গুলির শব্দ কানের পাশ দিয়ে চলে যায়। আমি ধবধবে আব্রু ভেদ করে লোকটাকে দেখবার চেষ্টা করি, কারণ, তার উচ্চারিত বাক্যটি এর আগেও আমি কোথায় যেন শুনেছি।

অসংলগ্ন ঘটনা ঘুরে ঘুরে আসে, আর টিকটিকির খসে পড়া লেজের মতো কাঁপা রাত মাথা আছড়াতে থাকে মাটিতে।

গ.

ঘুমোবার আগে বই পড়া আমার প্রতিদিনের কাজ। নইলে কেমন জানি খালি খালি লাগে।

বই খুলি–

কালো পিঁপড়ের মতো অক্ষর। সারিবদ্ধ।

একটু পর যা মগজের মধ্যে বিড়বিড় করে হাঁটতে থাকবে।

পড়তে নিই,

কিন্তু থেকে যাই। থামতে বাধ্য হই।

: তুমি কখনও ঘুণপোকা দেখেছ?

: না।

আমি রুনাকে প্রশ্ন করেছিলাম, গত পরশু।

: তারপর, তোমার বিবাহিত জীবন কেমন চলছে–

: ভালো না–

আমি নিজেও কোনও দিন ঘুণপোকা দেখিনি, রুনাকেও প্রশ্ন করেছিলাম। কোনও প্রশ্নই হঠাৎ আসে না। প্রতিটি প্রশ্নই দীর্ঘদিন ধরে ভেতরে ভেতরে তৈরি হতে থাকে।

ঘ.

আজ অমাবস্যা। বাইরে ত্রিশূলের তিন ফলার ওপর অন্ধকার দাঁড়িয়ে আছে। স্থির। পাশের ঘরে মাহমুদা 'আজ জোছনা রাতে সবাই গেছে বনে' শুনছে। বাবা-মা এতক্ষণে নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছে।

পড়তে চেষ্টা করি।

কিন্তু থেমে যাই। থামতে বাধ্য হই।

ঙ.

আমি হামিদ উদ্দিন (বি.এ) চাকরি খুঁজছি। যে কোনও ধরনের চাকরি। চাকরির ভীষণ প্রয়োজন আমার।

নইলে একটা উটকো কৃমিতে রূপান্তরিত হচ্ছি আমি।

চেনাজানা অনেকের সঙ্গে দেখা হয় না আজকাল। নাকি নিজেকেই নিজে আড়াল করে রাখি।

নিজের সঙ্গে নিজের দেখা হয় কি?

সরু গলিটার ভেতর দিয়ে কুয়াশা হামাগুড়ি দিতে দিতে, দেয়ালের বাইরে মাকড়সার জালে আটকে যায়।

মাহমুদা, তুই কিন্তু আজকাল মোটেই লেখাপড়া করছিস না।

বুবুর জন্য তোর খারাপ লাগে না। এ বাড়ির মেয়ে ছিল, সে এক দিন।

তোর চেয়ে অনেক বেশি সুন্দরী ছিল সে। কাকতালীয়ভাবে এক ধনী লোকের সাথে বুবুর বিয়ে হয়ে গেল।

চ.

টিনের চালে কুয়াশা জমে আছে। এ ঘরের দেয়ালে কোনও মহামানব বলে কি কিছু আছে?

আজকাল মাঝে-মধ্যেই আমার শরীরের ভেতরে নাকি বাইরে অন্যরকম এক কষ্ট দাপাদাপি করে। সে কষ্টটাকে হাতের মুঠোয় ধরা যাক। ইচ্ছা করে ছিঁড়ে ছুড়ে ফেলে দিই কষ্টটাকে।

ঘৃণা করতে শুরু করেছি, না কি আমি আগে থেকেই ঘৃণা করতাম। এত মানুষের ভিড়ে আমি কোথায়?

না কি আমি নেই। আমার থাকার কোনও প্রয়োজন নেই।

ছ.

গত পরশু প্রায় দেড় বছর পর, রুনার সাথে হঠাৎ দেখা হল।

রুনার প্রথম প্রশ্ন ছিল : আমি এখন কী করছি?

যে প্রশ্নটাকে ভয় পাই, সেটাই করে বসল সে।
: তুমি ঘুণপোকা দেখছ?
আমার পাল্টা প্রশ্নে রুনা চমকে যায়। আমি আসলে পালাতে চাচ্ছিলাম। যদিও কোনও প্রশ্ন হঠাৎ করে আসে না।
রুনাকে খুব একটা মনে পড়ে না। সে দিন নক্ষত্রের পতন দেখে ওর কথা মনে পড়েছিল।
রুনা আসলে আমার সাহস নেই। তাই নক্ষত্রের পতনের সাথে তোমাকে তুলনা করে নিজের খোঁড়া সান্ত্বনার শর্তে নিজেই লুকিয়ে থাকি।
তুমি প্রায়ই বলতে : আমি নাকি খুব ভালো–
'খুব ভালো' 'মহৎ' এসব বলে কিছু নেই। শরীরে জোরে ফুঁ দিলে চামড়ায় ঢেকে থাকা কঙ্কাল বেরিয়ে আসবে সবার।
তবুও ঘরের বাতি নিভিয়ে দিলে দেয়ালের চারকোণা আলো দেখে মনে হয়, পৃথিবীতে কেবল মাত্র অন্ধকার বলে কিছু নেই।

জ.
চাকরি খুঁজছি। একটা চাকরির খুব প্রয়োজন।
নইলে দিন দিন উটকো কৃমিতে রূপান্তরিত হচ্ছি।
মা খাবার এগিয়ে দিতে দিতে প্রায়ই বলেন : তোর বাবার চাকরি তো আর বেশি দিন নেই, বাড়িওয়ালা ভাড়া বাড়াতে বলেছে–।
আমি মায়ের মুখের স্বচ্ছ সরল পর্দার আড়ালে কঠিন পাথর দেখতে পাই। এ সব কথার মধ্যে লুকিয়ে থাকা অর্থগুলো বুঝে নিতে পারি।

ঝ.
পড়তে চেষ্টা করি। কিন্তু থেমে যাই। থামতে বাধ্য হই। বুবুর বিয়ের মাসখানেক পর তোকে একটা ছোট ক্যাসেট রেকর্ডার কিনে দিয়েছিল, যাতে তুই এখন গান শুনছিস। আমি কিছু নিতে চাইনি, বুবু প্রায় কেঁদে ফেলেছিল। অবশেষে চৌদ্দশো টাকা নিয়েছিলাম একসেট মানিক রচনাবলি কিনব বলে।
কেনা হয়নি।
পাড়ার চা আর সিগারেটের দোকানদার যাদের সামনে দিয়ে মাথা নিচু করে ঘরে ফিরতাম তাদের সমস্ত বাকি শোধ করেছিলাম। সেইসব বন্ধু যারা একশ দুশো টাকা পাবে বলে অনেক দিন দেখা করিনি, তাদেরকে দেখা দিয়েছিলাম। সেদিন সন্ধ্যায় পাড়ার সিগারেটের দোকানদারের সামনে বুক উঁচিয়ে বলেছিলাম : দশটা ফাইভ দাও। সিগারেট টানতে টানতে আমাদের গলিতে ঢুকেছিলাম।

বাসার সামনে বুড়ো লাইটপোস্টটা ঝিমুচ্ছিল আগের মতোই। বুবু অনেক দিন আসে না। নাকি আসতে দেয় না।
হয়তো সে আর নিজে থেকেই আসতে চায় না। সে মানুষ এবং পরিবর্তমান প্রাণীদের একজন।

ঞ.
বাইরে অমাবস্যার জমাট অন্ধকার। তুই বার বার রিওয়াইন্ড করে আজ জোছনা রাতে ... ... শুনছিলি এতক্ষণ। এখন বন্ধ করে দিয়েছিস। নাকি ঘুমিয়ে পড়েছিস।
বুবুর যে লোকটার সাথে বিয়ে হয়েছে, তাকে প্রথম থেকেই আমার পছন্দ হয়নি। কিন্তু যে ছেলেটি উটকো কৃমিতে রূপান্তরিত হচ্ছে, তার মতামতের কী দাম আছে। লোকটার বিয়ের বয়স পার হয়েছে অনেক আগেই। তার বাপজান আয়ুব-মোনায়েমের নুনু চুষে অনেক ধন-সম্পত্তি আর ধানমণ্ডিতে মহল তৈরি করে ইন্তেকাল করেছে। ছেলে তার ওপর দাঁড়িয়ে দিব্যি এগিয়ে যাচ্ছে। লোকটা ইত্তেফাকে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রতি বৎসর বাপজানের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে, মৌলভি হায়ার করে কোরআন খতম দেয়। লোকটা খায় আর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে। মাঝে মাঝে চ্যাংড়া চ্যাংড়া মেয়েমানুষ ভাড়া করে ফর্সা শরীর চাটে।
বুবু আর আসে না। নাকি আসতে দেয় না।
ঐ লোকটাকে আমার খুন করতে ইচ্ছা করে।
আচ্ছা, আমিও কি রুনার সাথে এরকম ব্যবহার করতাম? মাহমুদা, আজকাল তোকে খুব অচেনা লাগে। তুইও কি একই পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিস?

ট.
হাঁটতে থাকলে মাঝে মাঝে মনে হয়, পায়ের পাতা উধাও হয়ে গেছে। তখন হাঁটতে খুব কষ্ট হয়। তবুও হাঁটি। মাথার উপর হাতুড়ি পেটাতে থাকে রোদ।

ঠ.
আজ বিকালে বাবার মুখোমুখি হয়েছিলাম। ঠিক মুখোমুখি নয়, কারণ আমি সারাক্ষণ মাথা নিচু করে ছিলাম।
বাবা বলল : আমি জামাইয়ের কাছে চিঠি লিখে দিচ্ছি; তুই যা। নিশ্চয়ই একটা ব্যবস্থা হবে।

আমার উত্তর ছিল : বাবা, আমার সাথে আরিফ নামে একটা ছেলের খুব বন্ধুত্ব হয়েছে। ওর দুলাভাই একজন হাই অফিসিয়াল। উনি আমাকে চাকরি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।
এই ঢাকা শহরে একজন আরিফ এবং তার হাই অফিসিয়াল দুলাভাই হয়তো আছে কিংবা নেই। কিন্তু আমি তাদের চিনি না, কোনওদিন চিনতাম না।

ড.
মাহমুদা, তুই কি ঘুমিয়ে পড়েছিস?
বুবু তুমিও কি ঘুমে? রুনা তুমি ...
আচ্ছা, ঈশ্বর বলে আদৌ কি কিছু আছে?
ঘুণপোকা দেখতে কেমন?
কোনও প্রশ্নই এমনি এমনি আসে না। প্রতিদিন ভেতরে ভেতরে প্রতিটি প্রশ্ন বেড়ে ওঠে গোপনে। সিগারেট ধরাই। ধোঁয়া ছাড়ি। মশারির মধ্যে সিগারেটের ধোঁয়া উড়তে থাকে, হঠাৎ ঢুকে পড়া মশার মতো।
পড়তে চেষ্টা করি। কিন্তু থেমে যাই। থামতে বাধ্য হই।

ঢ.
আমি এবার পড়ার টেবিলের পেটের মধ্যে ঢুকে থাকা চেয়ারটার দিকে তাকাই। এই চেয়ারটা, ঠিক চেয়ারটা নয়, চেয়ার থেকে আসা শব্দ নয়, চেয়ারের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ঘুণপোকা বারবার আমার মনোযোগ নষ্ট করছে।
বেশ কদিন ধরেই আমি শব্দ শুনতে পাচ্ছি, কিন্তু আজ শব্দের তীব্রতা এত বেশি যে, তার আমার সমস্ত মনোযোগ চুরমার করে দিচ্ছে। অথচ রাতের এ সময়টুকু আমার কাছে খুব মূল্যবান। আমি জানি না ঘুণপোকা দেখতে কেমন, তারা সংখ্যায় কত এবং চেয়ারের ঠিক কোথায় লুকিয়ে আছে।
আমি চেয়ারটা টুকরো টুকরো করে ভেঙে ঘুণপোকা খুঁচিয়ে মারার সিদ্ধান্ত নিই। কিন্তু মায়ের কথা মনে পড়ে, খাবার এগিয়ে দিতে দিতে তিনি শান্ত গলায় বলেন : তোর বাবার চাকরি আর বেশি দিন নেই।
কাল সকালে মা হয়তো তেমনি শান্ত গলায় বলবেন : চেয়ারটা ভেঙে ফেললি। আমি তখন মায়ের মুখের স্বচ্ছ সরল পর্দার আড়ালে কঠিন পাথর দেখতে পাব। সিদ্ধান্ত বাতিল করে, আমি চেয়ারটাকে আধ হাত উপরে তুলে চার পায়ের উপর মেঝেতে ছেড়ে দিই। হঠাৎ রতের নীরবতা খান খান করে আমাদের গলি দিয়ে চেয়ার আর মেঝের সংঘর্ষের শব্দ দৌড়াতে দৌড়াতে বড়ো রাস্তায় চলে যায়।
কান পাতি, চেয়ারের ভেতর থেকে আসা বিরক্তিকর শব্দটা আর শোনা যায় না।

গ.
কষ্টার্জিত নীরবতার মধ্যে আমি পড়তে শুরু করি।
যে দাস নিজের দাসত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং নিজের মুক্তির জন্য সংগ্রামে উদ্যোগী তার অর্ধেক দাসত্ব ইতিমধ্যেই অবলুপ্ত। বৃহদায়তন ...
আবার থেমে যাই। থামতে বাধ্য হই।

[উৎস: গল্পগ্রন্থ: পাপ কিংবা সম্ভাবনা। রচনাকাল : ১৯৮৬]

অ র্থ নী তি / প্র ব ন্ধ

নৈতিকতা, ব্যাংকিং ও পেশাজীবীর দায়বদ্ধতা

....

মো জা ফ্ ফ র আ হ ম দ

নীতিশাস্ত্র মানুষের আবির্ভাবের সাথে অন্বিত হয়ে রয়েছে, যে কারণে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার বিবেকের দোলায় নানা সময়ে মানুষের বিবেচনায় উঠে এসেছে গল্পে, কবিতায়, প্রবন্ধে ও দর্শনের বিষয় হিসেবে। ধর্ম মতে স্বর্গচ্যুত মানব-মানবী এই ন্যায়-অন্যায় অর্থাৎ বিধিবিধান লঙ্ঘনেরই ফল। মিকেলএঞ্জেলোর যে অমর চিত্র সিস্টিন চ্যাপেলে উৎকীর্ণ হয়ে আছে সৃষ্টির ধারণাকে বিমূর্ত করে, সেখানেও বিবেকী ধারণা আমরা দেখতে পাই। সমস্ত খ্রিস্টধর্মে যিশুর যে জীবনসংগ্রাম ও ত্যাগ তার মাঝে তো সত্য ও ন্যায়ের কাহিনী ছড়িয়ে আছে নানাভাবে। ইসলামের রসুল (দ.)-এর সমস্ত জীবন সততা, স্বচ্ছতা ও সমতার সংগ্রামী ঐতিহ্য মানুষের জন্য রেখে যাওয়া এক উত্তরাধিকার। ইহুদিধর্মে হযরত মুসারও ছিল অন্যায় প্রতিরোধী বিবেকী শক্তির এক অপরূপ প্রকাশ। হিন্দুধর্মের নানা দেবদেবতার আখ্যানেও ফুটে উঠে ন্যায় ও অন্যায়ের প্রতিচিত্র। বুদ্ধদেবের জীবনআখ্যান ও শিক্ষাও তেমনি সত্যের ও ন্যায়ের অনুসন্ধান ও

শিক্ষার এক আশ্চর্য দলিল। সকল দেশেই এমন চিন্তানায়কের সন্ধান মেলে কারণ তাদের শিক্ষাই মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নিয়েছে। এছাড়া মানবসভ্যতার ইতিহাসে আছে ঈশপের গল্প, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্রসহ নানা আলেখ্য। আমরা যদি লোকগাথার বিশ্লেষণ করি তাহলেও ন্যায় ও অন্যায়ের নানা তর্ক ও মীমাংসার সন্ধান পাই। এই অর্থে ন্যায়শাস্ত্র নানাভাবে দৃশ্য ও অদৃশ্যমান থেকে আমাদের প্রভাবিত করে পারিবারিক, সামাজিক ও কর্ম-পরিবেশে। সমাজের উন্নয়নের ভিত রচনা করে ন্যায়ের বিমূর্ত বিকাশ। আইনের শাসন অথবা সবার জন্য একই আইন যখন আমরা উচ্চারণ করি তার মধ্যে সুশাসনের যে ধারণা তার ভিত্তিও রচিত হয় ন্যায়কে সমুন্নত রাখার অঙ্গীকারে।

ন্যায়শাস্ত্র তাই নানা সময়ে নানা দার্শনিকের চিন্তায় নানারূপে বিবেচিত হয়েছে। যে শাস্ত্রে তার প্রত্যক্ষ বিবেচনা নেই সে শাস্ত্রে তার প্রয়োগিক ক্ষেত্রে ন্যায়-অন্যায়ের বিচার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসেছে। সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাস, বিজ্ঞানের প্রায়োগিক যে বিষয়, ইতিহাসে রাজ্যশাসনের যে প্রজাতান্ত্রিক বিচার সেখানেও ন্যায়-অন্যায়ের বিষয়টি নানাভাবে দেখতে পাই। আইনশাস্ত্রের বিবেচনার ভিত্তিই হল ন্যায়ের সমুন্নয়ন। সমাজবিজ্ঞানে যখন মানুষের সামাজিক স্তরবিন্যাস, বিভাজন, বিবর্তন, ক্ষমতার স্তর বিবেচিত হয় সেখানেও ন্যায় ও অন্যায়ের বিবেচনা বিমূর্ত থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও যখন মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক ও নানা সম্পর্কের বিবেচনা হয় সেখানেও মূল্যবোধের প্রাসঙ্গিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। ধনবিজ্ঞানে যদিও মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ ধারণা নিয়ে সাম্প্রতিককালে উচ্চকণ্ঠ নানা আলোচনা আমরা শুনেছি যার ফলে কল্যাণধর্মী ধনবিজ্ঞানের আর্থসামাজিক বিবেচনা অঙ্ক ও পরিসংখ্যানের প্রয়োগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল, তা সত্ত্বেও যখন আমরা টেকসই উন্নয়নের কথা বলি, যখন দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়ে আলোচনা হয়, যখন আন্তঃদেশীয় সম্পদের ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচিত হয় তখন কিন্তু অর্থনৈতিক বিবেচনায় যে মূল্যবোধ উচ্চকিত হয়ে উঠে সেটি কিন্তু ন্যায়শাস্ত্রের প্রায়োগিক মানবকল্যাণ চিন্তারই একটি

বিচিন্তার বিকাশ মাত্র। ব্যবসা ও ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রে যখন আমরা মানব-প্রণোদনা ও মানবিক কল্যাণকে যুক্ত করে গাণিতিক বা কৌশলগত সীমিত ধারণার বাইরে অবস্থান নিতে পারি তখনই কিন্তু ন্যায়-অন্যায়ের বিবেচনা আমাদের বিবেচনায় যুক্ত হয়। আজকাল ব্যবসায় সামাজিক দায়িত্ব তারই একটি মাত্র প্রকাশ।

ব্যাংকিং ক্ষেত্রে ন্যায়শাস্ত্রের স্থান বিবেচনার আগে আমাদের ন্যায়শাস্ত্রের কিছু মৌলিক ধারণা নিয়ে আলোচনা প্রয়োজন আছে বলে মনে হয়। ন্যায়শাস্ত্রে যৌক্তিকভাবে ভালো ও মন্দের পার্থক্য নিয়ে বিবেচনা রয়েছে, যেমন রয়েছে ঠিক ও বেঠিক নির্ণয়ের যৌক্তিক নির্দেশনা, এছাড়াও আছে অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে বিভিন্ন দিকের যুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক আলোচনা। কিন্তু ন্যায়শাস্ত্র সব রকমের ভালোমন্দ, ভুল ও

নির্ভুলতা, গুণ ও নির্গুণ নিয়ে আলোচনা করে না। যেমন অনেক কিছুই দেশের আইনে সঠিক হলেও ন্যায়-বিচারে তেমন না-ও হতে পারে। আইনের গণ্ডি আর ন্যায়বিচারের গণ্ডি সমার্থক নয়। অনেক সময় ভালো ব্যবহার ন্যায়সিদ্ধ হয় কিন্তু সবসময়ই বিনম্র-বিনয়ী ব্যবহার ন্যায়ভিত্তিক হয়ে উঠে না। অনেক সময় চতুরতা আমাদের কাজের সঠিকতাকে প্রভাবিত করে থাকে। অনেক দক্ষকর্মের ভিত্তিতে ন্যায্যতা থাকে না। আমাদের অনেক কাজের কার্যকারিতা বিবেচনা করি, কিন্তু কার্যকর হলেই তা সর্বসময় ন্যায়ভিত্তিক হয় না। ন্যায়বিবেচনা দূরদর্শিতার বিবেচনা নয়, বিচক্ষণতার বিবেচনা নয়। এ কারণে অনেক দক্ষ, কার্যকর এমনকি বিচক্ষণ বিনম্র কর্মী যখন ক্ষুদ্র বিবেচনায় আবদ্ধ হয়ে পড়েন তখন আইনসিদ্ধ কর্ম করেও তিনি ন্যায়ভিত্তিক কাজ করেছেন বলে বিবেচিত না-ও হতে পারেন। যে জন্য মুনাফার সর্বোচ্চ শিখরে উঠে একজন দক্ষকর্মী হতে পারেন কিন্তু তার কর্মে মানবতা ও ন্যায্যতা সম্পর্কিত না-ও থাকতে পারে।

তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে ন্যায়শাস্ত্র কীভাবে আমাদের জীবন ও কর্মকে নির্দেশনা দিতে পারে? এর উত্তর সহজ নয় এবং এর উত্তরে সবসময়ে ঐকমত্য নেই। কেবলমাত্র ন্যায়শাস্ত্রের বিচিন্তার ইতিহাস ন্যায়ভিত্তিক মূল্যবোধের বিবেচনা এবং অন্যবিধ সিদ্ধান্ত থেকে তার পার্থক্য-বিবেচনা থেকেই ন্যায়শাস্ত্র সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যয়নে অনেক সময় মানুষের আচার-আচরণের বা সিদ্ধান্তের বিবেচনা বিবরণমূলক হতে পারে। যেমনটি আমরা ‘পঞ্চতন্ত্র’ বা ‘এসোপস ফেবলস’-এ পেয়েছি। এসব আলোচনায় আমরা সন্ধান করেছি কোন কর্ম থেকে মূল্যবোধের সন্ধান পাওয়া যায়, সিদ্ধান্ত নিতে কোন নীতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং কোন চরিত্র এমনভাবে সমুজ্জ্বল যা বিতর্কহীনভাবে অনুকরণীয়, ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে এমনি বিবরণ-নির্ভরতা পরিহার করে আমরা মান বা আদর্শ স্থির করে মানুষের কী করা উচিত, কোন নীতি অনুসরণ করা উচিত, কোন চারিত্রিক গুণাবলি একজনকে বিশিষ্ট করে তোলে তার বিচার করা যেতে পারে। তাকে আদর্শিকভাবে বিবরণী ও মান-এর একত্র বিবেচনা যথার্থ বলে ধারণা করা হয়। অবস্থাভেদে ঔচিত্য ও করণীয় দুটিকে সমার্থক বলে ধরে নেওয়া সঠিক না-ও হতে পারে। আমরা যা করি তা সর্বত্র বা সর্বদা করণীয় না-ও হতে পারে অথবা করণীয় বলে যা বিবেচিত তা উচিত বলে ধরে নেওয়া সঠিক না-ও হতে পারে। যে আদর্শে আমাদের কর্মকে প্রবহমান রাখা উচিত বলে আমরা ধারণা করি আমাদের কর্মবিবরণীতে তার পূর্ণ প্রতিফলন সবসময় ঘটে না। আমাদের কর্মবিবেচনায় আমরা বিভিন্ন ধারণার উপস্থিতি দেখতে পাই। প্রথমত, ঔচিত্যবোধ, না হলে অন্যের ক্ষতি হতে পারে; দ্বিতীয়ত, সাধারণ নীতিবোধ যা করণীয়কে নির্দিষ্ট করে এবং তৃতীয়ত, সাধারণ করণীয়-নির্ভর না হয়েও একটি স্বকীয় চিন্তা। আমাদের সব কাজে যে ঔচিত্যবোধ থাকে তা নয়, অনেক সময় আমাদের ব্যক্তিক স্বকীয়তা অথবা করণীয় সম্পর্কে সাধারণ ধারণা আমাদের কর্মকে প্রভাবিত করে থাকে। করণীয় সম্পর্কে সাধারণ ধারণাগুলোই আহরিত ধারণা। পরিবার, পরিবেশ, পাঠ, ধর্ম

পর্যবেক্ষণ এসব থেকেই এর উৎপত্তি। এর নীতিগত মূল্য অন্য স্থান-কাল-পাত্র থেকে এসেছে। কিন্তু সব মূল্যবোধ তো এমনভাবে পাওয়া যায় না। মূল্যবোধের সামগ্রিকতা সীমাহীন প্রত্যাগতির ওপর নির্ভরশীল হয় তাহলে সে সামগ্রিকতা ও মূল্যবোধ এক সময় ভেঙে পড়বে বা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে। এ কারণেই আমরা মূল্যবোধের কিছু বিষয়কে মৌলিক বলে গণ্য করি, যা স্বতঃসিদ্ধ, স্বয়ম্ভু; এদের নীতিমান্যতা তাদের অন্ত্যজ। আমাদের বিচারিক বা সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ থেকে আমরা এ সম্পর্কিত কিছু ধারা ও ধারণা পেতে পারি। নীতিশাস্ত্রে এ বিষয়ে বিতর্কের কিছু কমতি নেই। সে তর্ক ও সিদ্ধান্তের বিস্তৃত অঙ্গনে না গিয়েও মৌল মূল্যবোধের উৎস হিসেবে চারটি বিভাজন দেখতে পাই। প্রথমত, আমরা কোনো ঘটনা, অবস্থা, বিষয়কে ভালো বা মন্দ বলি। সুস্বাস্থ্যকে আমরা ভালো ও কাম্য বলে গণ্য করি, সুন্দর পরিবেশকেও তেমন ভেবে থাকি। প্রাকৃতিক নিসর্গেও আমরা মনোমুগ্ধকর কিছু পাই। অন্যদিকে মৃত্যু, অন্ধকার, অসুস্থতা, জরা, দুঃখকে আমরা মন্দ বলে বিবেচনা করে থাকি। দ্বিতীয়ত, আমরা আচরণবিধিতেও ঠিক-বেঠিক খুঁজে পাই। প্রতিবেশীর প্রতি সম্প্রীতি, ভাইবোনদের জন্য ভালোবাসা, সমাজকর্মে আত্মনিবেদন, স্বার্থহীন পরোপকার এসবই ভালো বা সঠিক আচরণের উদাহরণ। সত্য কথা বলা, কথা দিয়ে কথা রাখা, পরস্ব হরণ না করা, রাষ্ট্রীয় ও জনসম্পদ লুণ্ঠন না করা, প্রতারণা না করা এগুলো সবই ভালো আচরণেরই অংশ। তৃতীয়ত, আমরা মানুষের, জীবের, প্রাণীর, প্রকৃতির মৌলিক অধিকার স্বীকার করেছি। এ পর্যায়ে যেমন জীবনের অধিকার রয়েছে তেমনি রয়েছে সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক অধিকার। যেমন শিক্ষার অধিকার, কর্মের অধিকার, স্বীয় ধর্মপালনের অধিকার, সংগঠন গড়ে তোলার অধিকার, গণতান্ত্রিক বিধিবিধান দিয়ে প্রজাতন্ত্র গঠনের অধিকার, ন্যায়বিচারের অধিকার, সুস্থ পরিবেশের অধিকার এমনি নানা বিষয় এখানে নিয়ে আসা যায়। জাতিসংঘ মানবাধিকারসহ অন্যান্য যে সমস্ত বিষয়ে আন্তর্জাতিক ঐক্যমত বা বিশালগোষ্ঠীর মত গঠিত হয়েছে। চতুর্থত, কোনো কোনো মানুষকে তার জীবনধারার জন্য, তার মূল্যবোধের প্রকাশের জন্য, তার ব্যবহারিক প্রত্যয়ের জন্য আমরা তাকে আদর্শ বলে মান্য করি। পঞ্চমত, চরিত্রের কোনো কোনো প্রলক্ষণ, ব্যবহারিক কোনো বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তিত্বের কোনো কোনো দিক, প্রবচনের কোনো কোনো বিষয় আমাদের হৃদয় ও মনকে নাড়া দেয় সত্য ও সুন্দরের প্রকাশ ও বিকাশ হিসেবে। সেগুলোই আমাদের মৌল নীতিবাদের সূত্র হয়ে দাঁড়ায়। আমরা সাধারণভাবে এমনভাবে নিজেকে জাহির করতে চাই যেন আমরা ন্যায় ও নীতির ধারক। কিন্তু আমাদের নিত্যকার কর্মে ও ব্যবহারে তা কি সবসময় প্রকাশ পায়? আমরা নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে কোনো কোনো সময় মিথ্যে বলি। মিথ্যে কেন বলব না, এর উত্তরে কি আমরা সবসময় বলি এটা মৌলনীতির একটি? আমরা সত্য বলার পক্ষে নানা যৌক্তিকতা তুলে ধরি বা ধরতে পারি, তেমনি সময় সময় ছোটখাট মিথ্যে বলার পক্ষেও নানা কথা বলা সম্ভব। সত্য বললে যদি সৌহার্দ্য নষ্ট হয় তা হলে

একটু ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে অর্ধ-সত্য অর্ধ-মিথ্যা বলা তো হরহামেশাই ঘটছে। এসব থেকে প্রতীয়মান হয় অনেক মৌলিক ন্যায়তা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার মৌলিকত্ব হারিয়ে বসে। আমাদের অনেক কর্মে, বিশেষ করে ব্যবসায় এমন সত্য-মিথ্যার মিশ্রণ হরহামেশাই ঘটে।

ন্যায়শাস্ত্রে নানা মতবাদ দেখা যায়। যারা মনে করেন মৌলনীতির মাধ্যমে ভালো-মন্দের বিভাজন সম্ভব এবং কর্মের ফলে যে ভালো বা মন্দ ঘটে, এরকম তাত্ত্বিকতায় আপেক্ষিকতার দিকে দৃষ্টি আবদ্ধ বলেই পরিণতির পরিমাপে সাদাকালোর বিচার হয়, অনুবর্তিতাই এখানে প্রধান হয়ে উঠে। এ-জাতীয় নীতিবাদীরা কর্ম ও কর্মফল এরই বিবেচনা করে ভালোকে স্থাপনা ও মন্দকে বিতাড়নের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন এমনি নীতি-মতবাদেরই অঙ্গ হয়ে উঠে যদিও দুষ্ট ও শিষ্ট আপেক্ষিকতায় আক্রান্ত থাকে। ন্যায়শাস্ত্রে অপর তত্ত্বটিকে উপযোগতত্ত্ব বলা যায়। উপযোগবাদীরা মানুষের সুখ, প্রয়োজন আনন্দ, পরিতৃপ্তি, এ সমস্তকেই মৌলিক ভালো বলে বিবেচনা করে; অন্যদিকে মানুষের অসন্তোষ, অতৃপ্তি, দুঃখ, বেদনা, শোক এ সমস্তকে মন্দ বলে বিবেচনা করে থাকে। তাহলে কোনো কর্মের ভালো-মন্দের বিচার, সুন্দর-অসুন্দরের ধারণা মানুষের ভালো অর্থাৎ সন্তোষ, পরিতৃপ্তি, আনন্দ এ সমস্তের সাথে অন্বিত হয়ে যায়। কিন্তু একের আনন্দ অন্যের দুঃখের কারণ তো হতে পারে। ব্যাঙের সে উক্তি স্মরণীয়, বালক তোমরা যাকে খেলার আনন্দ বলে ধরে নিয়েছ তা আমাদের দুঃখ ও মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপযোগবাদ তাই নানা প্রশ্নে আকীর্ণ। কর্মফলবাদও কিন্তু আপেক্ষিকতার কারণে নানা প্রশ্নের অবতারণা করে। নীতিশাস্ত্রের অদ্বৈতবাদী দার্শনিকেরা যে তাত্ত্বিকতায় বিশ্বাস করেন সেখানে মৌলনীতির অবস্থান অত্যন্ত দৃঢ়। এখানে আপেক্ষিকতা নেই। তবুও অদ্বৈতবাদী নীতিতাত্ত্বিকেরাও সঠিকের সন্ধান করেন। নীতিবাদী তাত্ত্বিকেরা মৌলিক ন্যায় বা সত্য থেকেই কিছু সঠিক ব্যবহারিক নীতি বা নীতিমালার ধারণা দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই অদ্বৈতবাদীরাও স্বীকার করেন একটি সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়, কখনও কখনও এটা অস্বচ্ছ থেকে যায়। অদ্বৈতবাদী নীতির ধারকদের অনেকেই অনড় বলে সমালোচনা করেন, কিন্তু সত্য ও ন্যায় অনঢ় না হলে আপেক্ষিক ভালো ও মন্দে পৃথিবীতে নানা মত, নানা পথের একটি অস্থির অবস্থান সৃষ্টি হবার সম্ভাবনাও থেকে যায়। স্মরণীয় যে, নীতিশাস্ত্র অনুযায়ী ব্যক্তির চারিত্রিক উৎকর্ষ এমনই অর্জন যা তার ব্যক্তিতে সম্প্রীতি ও শান্তির স্থাপনা করে। সাংগঠনিক বিচারেও সমন্বয় এমন এক অবস্থানের সৃষ্টি করে যেখানে উদ্দেশ্য অর্জন সহজ ও সম্ভব হয়ে উঠে। তেমনিভাবে চারিত্রিক অপকর্ষ অশান্তি ও সৌহার্দ্যহীনতার জন্ম দেয়। সাংগঠনিকভাবে অপকর্ষ সমন্বয়হীনতা ও অসঙ্গতির সৃষ্টি করে। নীতিবিচারে তাই কর্ম ও কর্মের প্রতিক্রিয়া যদি মূল্যবোধীয় অবস্থানকে দৃঢ় করে এবং মূল্যবোধের বিকাশের সহায়ক হয়, তাহলেই অর্জনটি সমর্থনীয় বলে বিবেচিত হয় বা হতে পারে।

দুই.

ব্যাংকিং একটি ব্যবসা এবং ব্যাংকার একজন পেশাজীবী। ন্যায়শাস্ত্রের যে বিবেচনা উপরে উল্লেখিত আছে, তারই আলোকে আমরা ব্যবসায় নীতিশাস্ত্রের অবস্থান ও পেশাজীবীর নৈতিকতা এ বিষয়ে আলোচনার প্রচেষ্টা পাব। কোরান শরীফে সৎভাবে ব্যবসা করার নসিহত আছে। রসুলের জীবনের প্রথম যৌবন কেটেছে সৎ ব্যবসায়ী হিসেবে। এ থেকে ধারণা করা সম্ভব অসৎভাবে ব্যবসা চলে, ব্যবসায়ীরা সততার পথ মেনে না-ও চলতে পারেন। শাইলকের সুদি ব্যবসায় প্রতিহিংসার যে চিত্র সেখানে ব্যক্তিক রোষ ও অসততার এক সচিত্র নাটকীয়তা ফুটে উঠেছে। লোকায়ত জ্ঞানের যে প্রবচন আমাদের জানা আছে, সেখান থেকে দুটোর উল্লেখ করা যায়। একটি হল ব্যবসা ও নীতিশাস্ত্র জল-তেলের মতো, এ দুটো মেশে না কারণ ব্যক্তিক মুনাফা ও মানবিক কল্যাণ কখনও সমন্বিত হয় না। আমাদের দেশে ভেজাল খাবার ও নানা ক্ষুদ্রঋণের মহাজনি ব্যবসা এর উদাহরণ। অন্যটি হল ব্যবসায়ীদের স্বর্গে স্থান হয় না, নরকেই তাদের কর্মফল জায়গা করে দেয়। এ প্রবচন দুটি সব মহাদেশের প্রায় সবদেশেই নানাভাবে নানা কথা উপকথায় পাওয়া যায়। অবশ্য অনেকে এই প্রবচন দুটিকে এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন যে ব্যবসা অনৈতিক নয় বরং নৈতিকতার বিধিবদ্ধ অবস্থানের সাথে সম্পর্কহীন, এজন্য কখনও কখনও কোথাও কোথাও কোনো কোনো ব্যবসায়ী অনৈতিক অবস্থান নিয়ে বৃহত্তর কল্যাণকে উপেক্ষা করে। সেজন্য ধর্ম পালন করেও সম্পূর্ণ নৈতিকভাবে ব্যবসা করতে খুব কম ব্যবসায়ীকে দেখা যায়। তারা নীতিধর্ম ও ব্যবসায়িক বাস্তবতাকে পৃথক পরিমণ্ডলের বিষয় বলে গণ্য করে থাকেন। এজন্য শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি, কাঁচামালের মান, পণ্যপ্রস্তুতির প্রক্রিয়া, ক্রেতার স্বার্থ, উৎপাদিত পণ্যের যথার্থতা এগুলো মুনাফার মানদণ্ডেই তারা বিচার করেন, নীতিশাস্ত্রের বাধ্যবাধকতায় নয়। এজন্য নানা দেশের ব্যবসার নানা খবরের মাঝে অনৈতিকতার খবর অনেক সময়ই প্রাধান্য পেয়ে থাকে। ব্যবসায়ীরা পণ্যকে যথার্থভাবে উপস্থাপন করে না, কথার মারপ্যাঁচে ক্রেতাকে বিভ্রান্ত করে, ভেজাল পণ্যতো আদিকাল থেকে ব্যবসায় স্থান করে নিয়েছে, নকল পণ্যও তেমনি বাজারে বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়, বাজারকে গোষ্ঠীগতভাবে প্রভাবিত করার প্রবণতা মুনাফাকারীর এক সহজাত প্রবণতা। শেয়ারবাজারে অথবা কোম্পানির বোর্ডে 'ইনসাইডার ম্যানিপুলেশন' অনেক দেশেই বেশ প্রচলিত, ব্যবসা পেতে ঘুষ তো এক চলমান প্রথা, সিন্ডিকেশন বিশ্ববাজারের একটি জানা প্রবণতা, পরিবেশদূষণ ব্যবসায়ীর এক নির্মম কর্মপ্রক্রিয়া, জনকল্যাণের প্রতি উদাসীনতাও ব্যবসায়ীদের মধ্যে লক্ষণীয়; ঋণখেলাপি, করখেলাপি, বিলখেলাপি, অবৈধ গ্যাস ও বিদ্যুতের সংযোগ ব্যবসায়ীদের মুনাফাবৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় যুক্ত হয়ে আছে। ব্যবসায়ী তাই নীতিশাস্ত্র মেনে, এমনকি দেশেই আইন মেনে, ব্যবসা করেছেন একথা

বলা দুষ্কর হয়ে উঠে। ব্যবসায়ীর কাছে মুনাফার চাইতে বড় দেবতা নেই। সততা, স্বচ্ছতা তাই তার বিবেচনায় আসে না। ব্যাংকও ব্যবসায়ীদের ঋণ দিতে মুনাফার দিকেই তাকায়, তার সততার বিচার সে করে না। পরিবেশবাদী বা ভোক্তার অধিকারবাদী ও ব্যবসায় সামাজিক দায়বদ্ধতার ধারণা ব্যবসায় নীতিশাস্ত্রকে সামান্যতম বিবেচনায় নিয়ে আসতে প্রয়াস পেলেও, সার্বিকভাবে ব্যবসা নীতিশাস্ত্রের পরিমণ্ডলে নিজেকে স্থিত করেনি। অথচ ব্যবসার সাথে নীতিবাদিতার সম্পর্ক বেশ নিবিড় ও বহুমাত্রিক। ব্যবসার বিস্তৃতি আজ দেশের সর্বপর্যায়ে। ব্যবসা তাই সমাজের সাথে সম্পর্কিত এবং এটি সমাজের ওপরে চাপিয়ে দিয়ে তার ফল ভালো হয় না। সরকারি ব্যাংকের টাকায় যখন আমরা বেসরকারি ব্যাংক চালু করেছি, তার ফল ভালো হয়নি। বিদেশি ঋণে যখন আমরা পাটব্যবসা বেসরকারিকরণ করেছি ভালো ব্যবস্থাপনার পরিবর্তে তার ফল ভালো হয়নি। বিদেশি পুঁজির মোহে যখন আমরা কয়লাখনি খননে এগিয়েছি, সেটা স্থানীয় সমাজ গ্রহণ করেনি। কৃষিজমি কেড়ে যখন শিল্পায়ন করার চেষ্টা হয়েছে তখনও সামাজিক রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলেছে। সুদি ঋণ কারবারিতে দরিদ্র দরিদ্রতর হয়েছে, শত প্রশংসায়ও এর গ্রহণযোগ্যতা ন্যায়ভিত্তি পায়নি।

নীতিবাদিতা সমাজ-সঞ্চালনের মৌল ক্ষেত্র। নৈতিকতা তাই মানুষের, সমাজের, সরকারের সঙ্গত ও অসঙ্গত আচরণকে নির্দেশ করে। সমাজকে ঘিরেই নীতিবাদীর আবর্তন, সমাজ-সম্পর্কেই এর বিকাশ। আধিপত্যবাদী সমাজে বা সামন্তবাদী সমাজে মানবতাবাদী নীতিবাদের বিকাশ ঘটে না। আমাদের দেশে মানবতাবাদী ধারণার নানা অবতার নানা শিক্ষা দিয়েছেন। কিন্তু সমাজ সম্পর্কে যে আধিপত্যবাদ বা সামন্তবাদ আমাদের ব্যবসায়ী মানসিকতার বিকাশ ঘটিয়েছে সেখানে নীতিবাদ ব্যাহত হয়েছে। সেজন্য দরিদ্রের কথা বলে যারা মহাজনি ব্যবসায় নেমেছেন এবং তার সাথে অন্যান্য ব্যবসার সংযোজন করেছেন সে সমস্ত বেসরকারি উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানেও মানবতাবাদী নীতিবাদের পরিবর্তে আধিপত্যবাদী বা সামন্তবাদী দাতা-গ্রহীতা সম্পর্কের মাধ্যমে অমানবিকতার বিকাশ ঘটেছে। ক্ষুদ্রঋণ ব্যবসায় এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ, যে কারণে দারিদ্র্য-বিমোচনের চাইতে দরিদ্র-নিষ্পেষণ অনেক সময়ই দারিদ্র্য দুষ্টচক্রের সত্যতা আবারও প্রমাণ করেছে।

আমাদের পোশাকশিল্পে মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক মানবতাবাদী হয়ে উঠেনি মুনাফাবাদী মনোবৃত্তির কারণে। সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্ব অবশ্যই মালিকের আছে কিন্তু শ্রমিকের সম্ভ্রমরক্ষা করাও কি তার দায়িত্ব নয়? শ্রমিক-মালিকের সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহমর্মিতার না হলে যে সাংঘর্ষিক অবস্থার সৃষ্টি হয় তা আর্থ-সামাজিক নীতিবাদকে বিনষ্ট করে। আমাদের ক্ষুদ্রঋণের ক্ষেত্রে, বিশেষায়িত ঋণের ক্ষেত্রে ব্যাংক অধিকর্তা ও ঋণগ্রহীতার সম্পর্ক কি সৌহার্দ্যপূর্ণ? তাহলে এতবার ঘোরানো হয় কেন তাদের? ঋণ

দিয়েই কিছু অর্থ রেখে দেয় কেন কর্তারা? ব্যাংকে টাকা জমা দিতে গিয়ে বা বিল পরিশোধ করতে গিয়ে বয়স্কদের জন্য বিবেচনা কি আমরা দেখতে পাই? এমন অবস্থায় রোদবৃষ্টিতে গ্রাহকের যে গঞ্জনা সেটা কি নীতিবাদিতার পরিচয়? ব্যাংক থেকে যখন জাল নোট গ্রাহক পায় তখন কি নীতিহীনতার পরিচয় ফুটে ওঠে না? ঋণ না দিয়েও ঋণের খাতায় যোগসাজসে অসহায় মানুষের নাম ওঠে, যখন বিশেষায়িত ঋণ কৃষক, তাঁতি বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তার নামে প্রভাবশালীরা কর্মকর্তার যোগসাজসে নিয়ে যায় তখন নৈতিকতার যে প্রকাশ তা সমাজকে হীনমন্যতার পথে ঠেলে দেয়। কর্মের মাঝে নীতিহীনতার সন্ত্রাস তো ইউনিয়ন কর্মকর্তাদের দৌরাত্ম্যে প্রকাশ পেয়েছে, সেখানেই নীতিবাদের মৃত্যু আমরা দেখতে পেয়েছি। বেনামি ব্যক্তি ও সংগঠনের নামে যখন আমানত দেখিয়ে ঋণ দিয়ে ঋণখেলাপি অবস্থার সৃষ্টি করা হয়, বোর্ডের বা ইউনিয়নের দৌরাত্ম্যে যার খরচ যেয়ে পড়ে নিরীহ আমানতকারীদের ওপর, তখন কি ব্যাংকিংব্যবসা নীতিবাদকে উচ্চে তুলে ধরে? যখন ব্যাংকে মেয়াদউত্তীর্ণ ডিরেক্টরগণ তাদের আধিপত্য ধরে রাখতে তদ্বির করেন, অথাবা বেনামে শেয়ার কিনে আধিপত্য বজায় রাখার প্রয়াস পান অথবা নিজের আত্মীয়কে নিজের স্থানে বসিয়ে পিছন থেকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন তখন কি নীতিবাদের ধ্বজা লুণ্ঠিত হয় না? ব্যাংকও আজ নানা পণ্য বিক্রয় করে, সেবাপণ্য। পণ্যের বাজারে আমরা হরেক রকমের বেসাতি দেখতে পাই। ক্রেতাকে পণ্য সম্পর্কে যথাযথপূর্ণ তথ্য দেই নাকি তার মনে প্রলোভনের টান সৃষ্টি করতে নানা রকমের অর্ধসত্যের আশ্রয় নেই? আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে ক্রেতা-বিক্রেতা, উৎপাদক, মধ্যস্বত্ব, ব্যবস্থাপনা, কর্মী, ভোক্তা সবার যে নৈতিক অধিকার ও দায়িত্ব আছে সেটি আমাদের বাজারব্যবস্থায় আজ উদ্ভাসিত হয়? ক্রেতা ঠকে, ভোক্তা ঠকে, শ্রমিক ঠকে, এমন অবস্থায় উন্নয়নের পথচলা দুরূহ হয়। পুঁজিবাদের 'চৌর্যবৃত্তির রাজপুত্র' আজও এদেশে আধিপত্যবাদের যে জাল বিস্তার করেছে তাতে নানা ব্যবসা বিভিন্নভাবে একীভূত হয়ে নানা প্রতারণা বিভিন্ন রকমে বিকশিত হয়ে দেশজ পুঁজির সৃষ্টিকে বিঘ্নিত করছে, সেই সাথে নীতিসিদ্ধ সামাজিক পুঁজিও গঠিত হতে পারছে না।

নৈতিকতা (যার বিষয়ে এডাম স্মিথ তার জাতীয় সম্পদ বিষয়ক বইতে আলোচনা করেছেন এবং যে বিষয় নিয়ে সাম্প্রতিককালে অমর্ত্য সেনসহ অনেকেই যুক্তিসহ আলোচনায় নিরত হয়েছেন) হল ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে উৎপাদন ও বিনিময়-সম্পর্ক গড়ে তোলার ভিত। এটি ক্রমাগত লঙ্ঘিত হলে উৎপাদন ও বিনিময়ে ধস নামে, ধস নামে ব্যাংক ব্যবস্থায়, অর্থনৈতিক অবস্থায়। প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থা যেখানে আধিপত্যবাদ, একচেটিয়া অবস্থা, সিন্ডিকেশন, ইত্যকার ক্ষতিকর অবস্থা বিরাজ করতে পারে না সেখানেই নীতিবাদিতার কারণে ব্যবসা-বাণিজ্য সচল থাকে। বলা হয় নৈতিকতা হল সে তেলজ এবং আঠালো পদার্থ যা সমাজ ও ব্যবসাকে সম্পর্কিত ও সঞ্চালনের সুব্যস্থার সৃষ্টি করে। নীতিহীনতার প্রসারই ব্যবসা ও ব্যাংকিং-

এ দুর্বৃত্তায়নের সৃষ্টি করে। নীতিহীন দুর্বৃত্তায়ন যতদিন মুনাফার পিচ্ছিল পথ মসৃণ করে, যতদিন 'ফরেনসিক অডিট' এগুলোর উদ্ঘাটন না করে, ততদিন সৎ উদ্যমী ব্যাংকার নীতিসিদ্ধ সেবা দিতে ব্যর্থ হন। মিথ্যার জয় তখনই ঘটে যখন সত্য অবমূল্যায়িত হয়। ভেজালের থেকে মুক্তি পাওয়া দুরূহ হয় যখন নির্ভেজালের উপস্থিতি উচ্চকিত হয় না। বর্তমান বিশ্ব-আর্থিক-সঙ্কট এর এক ধ্রুপদী উদাহরণ।

আমরা ব্যবসায়-ব্যাংকে সেবা সপ্তাহ, গ্রহীতা সম্মাননা এ সমস্ত বাজারিকরণের উপস্থিতি দেখতে পাই কিন্তু গ্রহীতার কাছে যে স্বচ্ছতা নীতিবাদিতা ব্যবসার জন্য মূল্যবান সুনাম ও ভাবমূর্তি সৃষ্টি করে তা বিজ্ঞাপনের প্রতিচিত্র কখনই ধারণ বা সৃজন করতে পারে না। অথচ আমাদের ব্যবসায় গ্রহীতার চাইতে অভিনেতার মূল্য অনেক বেশি। সামাজিক গবেষণা আমাদের এ ধারণা দেয়, ব্যক্তিজীবনে নৈতিকতা দৃঢ় হলে ব্যবসায়িক কর্মেও সে নৈতিকতার প্রতিফলন ঘটে। আমাদের দুর্ভাগ্য আমাদের ব্যাংক-ব্যবস্থাপনায় ব্যক্তিক নৈতিকতা আজ অবদমিত এবং ব্যাংক ও ব্যবসা-ব্যবস্থাপনায় ধর্ম, শিক্ষা, পারিবারিক মূল্যবোধ আনুগত্য ও আধিপত্যের কাছে আজ পরাজিত। সমাজে যদি নৈতিকতা দুর্বৃত্তায়িত ব্যবস্থাপনার কাছে পরাজিত হয় সে সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্য-বিনিময় নৈতিকতার মানে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠে না। সমাজ যখন দুর্বৃত্ত-ব্যবসাকে ব্যাংকিং-ব্যবসাসহ, ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যানের দৃঢ়তা দেখাতে পারে, সেখানেই নীতিসিদ্ধ ব্যাংকিং ও অন্যান্য ব্যবসার বিস্তার ঘটে।

ইংরেজিতে একটি কথা আছে, The business of business is business. ব্যবসাই হল ব্যবসার প্রাণ, এখানে নৈতিকতার কথা নেই। ব্যবসার সাথে সরকারের সম্পর্ক আইনের ও নিয়ন্ত্রণ ও সমন্বয়নের। যখন ব্যবসা সরকারকে নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগী হয় তখন সরকার ও ব্যবসা দুটিই কলুষিত হয়। আমরা বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ অনেক ব্যবসাতেই এমন উদ্যোগ সম্প্রতি লক্ষ করেছি। ব্যবসার কাজ দয়াদাক্ষিণ্য নয়। ব্যবসায়ীর দানকে ব্যবসা থেকে পৃথক করে রাখাই সঙ্গত। আমাদের অনেক ব্যবসায়ীর দয়াদাক্ষিণ্যের মাধ্যমে যে আধিপত্যবাদ ও সামন্তবাদের সৃষ্টি করে রাজনীতি ও অর্থনীতিকে কলুষিত করেছে সেটা আজ অজানা নয়। কিন্তু ব্যবসা-ব্যবস্থাপনায় দেশজ সংস্কৃতির কারণে অথবা রাজনৈতিক আদর্শিক কারণে বিভিন্নতা দেখা যায়। জাপানি ব্যবস্থাপনায় আমরা একাত্মতা, আনুগত্য ও দক্ষতা সৃষ্টিতে পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার প্রকাশ দেখি এবং নীতিবোধ এরই মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। রাষ্ট্রীয় আধিপত্যবাদে ব্যবস্থাপনায় শাস্তির প্রাবল্য ও আদর্শিক আনুগত্য আমরা সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের উন্নয়নের কয়েক দশকে প্রত্যক্ষ করেছি। বর্তমানে সে সংস্কৃতির বিলুপ্তি না ঘটলেও, নীতিবাদের বিকাশ তেমন লক্ষণীয় নয়। তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুরেও এর উপস্থিতি লক্ষণীয় ছিল। আমেরিকায় উৎপাদনে মুক্ত অবস্থার সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষণীয় হলেও ক্রেতাস্বার্থ রক্ষায় নানা বিধান ও নিয়ন্ত্রণ রাষ্ট্রকে

নীতিনির্ধারকের অবস্থানে বসিয়েছে। ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কেও এটি সত্য। নিয়ন্ত্রণে মার্কিন রাষ্ট্রের সংবিধানে যে মৌলিক নীতি বিবৃত হয়েছে, সে নীতিমান্যতাই এখানে প্রকাশ পেয়েছে। আমরা চলছি উপনিবেশের আইন নিয়ে, দাতাদের পরামর্শে আমাদের লোকজ ও দেশজ ন্যায্যতা প্রাতিষ্ঠানিকতা পায়নি। যে কারণে সুবিধাবাদ ও আধিপত্যবাদ আমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের দেশে ভোক্তার সার্বভৌমত্ব অস্বীকৃত বিধায় নীতিমান্যতা এদেশে ব্যাংকিংসহ ব্যবসা ও সেবাখাতে প্রস্ফুটিত হতে পারেনি।

ব্যাংকসহ সকল ব্যবসাই সামাজিক পরিমণ্ডলে কাজ করে। তাহলে এর কর্মপরিধি ও কর্মক্ষেত্র সমাজ দিয়েই নিয়ন্ত্রিত হবার কথা। সমাজ সুষম হলে সামাজিক মূল্যবোধ এ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হয়। বিষম সমাজ যেখানে আয়-বৈষম্য ও সম্পদ-বৈষম্য সামাজিক বিভাজনের সৃষ্টি করে, সেখানে বিত্তশালীর আধিপত্যবাদী অনৈতিকতা ব্যবসা, বাণিজ্য ও ব্যাংককে নিয়ন্ত্রিত করে। যখন যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসা ছিল ছোট, ব্যাংক বাণিজ্যের যৌক্তিকতা, মানসিকতা ও কর্মসংস্কৃতির ভিত্তি রচনা করত। কর্মদক্ষ উদ্যোক্তা, সমাজ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ উদ্যোক্তা সফলতার মুখ দেখত। সে যুগের অবসান হয়েছে। এখন যখন ব্যবসার ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়েছে, প্রযুক্তি উৎপাদনের বিস্তার ঘটিয়েছে তখন কিন্তু প্রোটেস্টান্ট নীতিবোধ বিনষ্ট হয়েছে। মালিকানা ও ব্যবস্থাপনার দূরত্ব নীতিবোধকে দুর্বল করেছে। আগে আইন ও নিয়ন্ত্রণ বিধিমালায় যেহেতু সামাজিক মূল্যবোধের ভিত ছিল, সেজন্য আইন ও বিধি মেনে চললে সামাজিক নৈতিকতা মেনে চলাও সহজ হত। আজকালকার মূল্যবোধ-নিরপেক্ষ ইতিবাদী (Positive) অর্থনীতির আদলে মুনাফার প্রাধান্য সে সামাজিক নীতিবোধভিত্তিক 'নরমাটিভ' অর্থনীতির ভিত দুর্বল করেছে। আইনের ফাঁক-ফোকর ছাড়াও ব্যক্তিক মূল্যবোধে সামাজিক নীতিপ্রত্যয় আজ প্রতিভাত নয়। তাই নীতিমালা ব্যক্তিক হয়ে উঠেছে, এর প্রাতিষ্ঠানিকতা দুর্বল হয়ে পড়েছে। ফলে আমেরিকার ব্যাংক-ব্যবস্থাপনায় আজ নানা বিপর্যয় লক্ষণীয়। নীতিমান্যতা ব্যক্তিক ক্ষেত্র থেকে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে সমন্বিত না হতে পারলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হবে যা কেবল আইনের শাসনের ফলে সমাধান হবে না। সব আইন কিন্তু নৈতিকতায় ঋদ্ধ নয়, যেমন ধরুন শ্বেতাঙ্গ-প্রাধান্য নিয়ে যে আইন ছিল আমেরিকায়, দক্ষিণ আফ্রিকায়। আইন কেবল নীতিমান্যতা সৃষ্টি করবে এমন আশা করা সঠিক নয়। নীতিমান্যতা ধারণ করতে হয় মন, মনন ও সংস্কৃতিতে, একে সমন্বিত করতে হয় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকতায়। ব্যবসায় যে সমস্ত নৈতিকতার প্রশ্ন ওঠে তা কেবল আইনমান্যতায় সমাধান করা যায় না। নীতিমান্যতাকে আইনমান্যতারও উচ্চে স্থান দিতে হয়। তাহলেই কর্মক্ষেত্রে মূল্যবোধের প্রস্ফুটন ঘটে। সব আইনকে নৈতিকতার মানদণ্ডে সঠিক বলে মেনে নেয়া যায় না কারণ অনৈতিকতার বিষয় বিবেচনা করেই কিন্তু সব আইনের সৃজন হয়নি। আইনের বিধান দিয়ে যা অনৈতিক তাকে নৈতিক করা যায় না। নৈতিকতার সঠিক বিবেচনা এবং নীতিশাস্ত্রের

বাস্তব যুক্তিবাদিতাই নৈতিক মূল্যবোধের আলোকে আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এবং ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডকে নৈতিক বিষয়াবলির জটিল অবস্থানের নীতিসিদ্ধ অবস্থান নির্দেশ করতে পারে। যেহেতু আইনসিদ্ধ হলেই নীতিসিদ্ধ হয় না সেজন্য ব্যবসা-ক্ষেত্রে নৈতিকতার যুক্তিবাদী অবস্থানের অনুধাবন ও তাত্ত্বিক জ্ঞানভিত্তিক পর্যালোচনা আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। ব্যাংকিং-ক্ষেত্রেও অনেক আইনসিদ্ধ অবস্থান রয়েছে যেগুলো নীতিসিদ্ধ নয়। সহজ উদাহরণ হল অবৈধ অর্থের গোপনীয়তা সম্পর্কীয় ব্যাংকব্যবস্থার আইনসিদ্ধ অবস্থান অথবা ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মানুষের আমানত গ্রহণে ব্যাংকের অস্বীকৃতি।

ব্যবসায় আইনসিদ্ধ কর্ম সমাজসমর্থিত না-ও হতে পারে। সাধারণভাবে বলা যায় সহনীয় দরে নিত্যপ্রয়োজনীয় মানসম্পন্ন দ্রব্যের সরবরাহ ব্যবসার জন্য একটি সামাজিক বাধ্যবাধকতা। চাহিদা ও বাজারের জটিলতায় ব্যবসা-ক্ষেত্রে জনসাধারণের এমন একটি সামাজিক অধিকার নিত্যই লঙ্ঘিত হয়। এমনি অবস্থার উদ্ভব হয় কারণ ব্যবসায় মুনাফার প্রাধান্য সামাজিক দায়বদ্ধতাকে উপেক্ষা করার একটি যৌক্তিকতা সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়। ব্যবসা-ব্যবস্থাপনার আর্থিক দিক যত আদৃত, নৈতিক দিক তত সমাদৃত নয়। ব্যবসার মালিক ও ব্যবস্থাপকেরা হরহামেশাই নৈতিক বিষয়কে যৌক্তিক বলে বিবেচনা করে না। এজন্য ব্যাংকে অনেক অবৈধ বেনামি লেনদেনের উপস্থিতি লক্ষ করা যায়, ব্যাংকের পরিচালনায় প্রান্তিক জনগণের উৎপাদন সহায়ক আর্থিক ব্যবস্থার অনুপস্থিতি লক্ষণীয় হয়। এ সমস্ত ব্যবসায় যদিও সরকারের আইনি নিয়ন্ত্রণ ও সহায়ক নীতিসিদ্ধ পরামর্শের স্থান আছে তা হলেও ব্যবসায়ী ও ব্যাংকার তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে সামাজিক অভিঘাত, পরিবেশ দূষণ, জনস্বার্থ এ সমস্তের বিবেচনা থেকে বিরত থাকে। কোনো বাজারনির্ভর ব্যবসায়ই নৈতিক চাহিদা মেটাবার মতো প্রস্তুতি তার ব্যবস্থাপনায় সংযুক্ত করে না। এজন্য আজ যারা ব্যবসায় নৈতিকতার প্রশ্ন তুলছেন তাদের মতবাদ হল ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় সমাজ, জনস্বার্থ ও নৈতিকতাকে স্পষ্টভাবে স্বচ্ছতার সাথে জায়গা করে দিতে হবে।

তিন.

এ্যাডাম স্মিথ যখন অর্থনীতির ধ্রুপদী বইটি রচনা করছিলেন তখন নীতিদর্শনচিন্তা তার চেতনা থেকে বিচ্যুত হয়নি। মানবসৃষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতাও তাকে স্মরণে রাখতে হয়েছে। মনে রাখতে হয়েছে মানুষের ব্যক্তিস্বার্থ-তাড়িত কর্ম নানাভাবে উৎকর্ষের জন্ম দিলেও মানুষের কর্মে যদি নীতিজ্ঞানের ভিত্তি না থাকে তাহলে সামগ্রিক উপযোগ মাঙ্গলিক চরিত্র ধারণ করে না। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে ব্যবসায় চরিত্র, প্রযুক্তি ও যোগাযোগের যে বৈপ্লবিক বিবর্তন ঘটেছে তার ফল নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। এ্যাডাম স্মিথের কাল আজ বিগত কিন্তু তার অর্থনৈতিক ও তৎসম্পৃক্ত নীতিবিবেচনা আজ সমানভাবে বিবেচ্য। এর প্রায়োগিক দিক নিয়ে মতভিন্নতা রয়েছে।

রক্ষণশীল চিন্তায় বাজারের প্রাধান্য ও ব্যক্তিস্বার্থের সামগ্রিক প্রতিযোগী সমন্বয়নই নীতিবিচারের ভিত্তি। মাঙ্গলিক সমাজ বিবেচনায় এর ভিন্ন বিবেচনা পাওয়া যায়। ব্যবসায় নীতিবিবেচনা দর্শনশাস্ত্রেরই অঙ্গ। দর্শনশাস্ত্রের ব্যাপৃত বিবেচনায় আমরা লক্ষ করি, ব্যক্তিক ও ব্যষ্টিক অভিজ্ঞতা একটি পারস্পরিক সম্পর্ক ও গঠনপ্রণালীর নিয়মাবদ্ধ ও সুসম্বদ্ধ বিন্যাস। এই দর্শনশাস্ত্রের নিয়মাবদ্ধ বিবেচনায় নীতিশাস্ত্রকে স্থিত দেখতে পাই আর নীতিশাস্ত্রের প্রায়োগিক বিবেচনার একটি ক্ষেত্র ব্যবসা সম্পর্কিত নীতিবিজ্ঞান আর তারই অংশ হিসেবে বিরাজ করে ব্যাংকিং-ক্ষেত্রে নীতিবিজ্ঞানের বিবেচনা। দার্শনিকেরা দু'রকম যুক্তিবাদী নৈতিকতার সন্ধানে নিরত থাকেন। তার একটি হল অনুশীলন বা বিশ্লেষণ কর্ম। এখানে দর্শনশাস্ত্র মূলত বিভিন্ন শব্দ, পদ প্রতিজ্ঞা বা সূত্রের নিগূঢ় অর্থের বিবেচনা করেন। এই শাস্ত্রের যুক্তির সারকে নিরীক্ষা করে দেখা হয়। যে সমস্ত অনুমান ও তার অনুষঙ্গের ভিত্তিতে নানা প্রসঙ্গের অবতারণা হয় তবে ধরন, পরিবর্তনমানতা, প্রতীক ও অবস্থা-বিশ্লেষণ দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে নিহিত। এই বিবেচনায় বাস্তবতার অবস্থান, জ্ঞানের নিগূঢ় অর্থ ও তার ওপর নির্ভরতার তাত্ত্বিক বিচার, মূল্যবোধের ভিত এমনি সব বিষয় এসে পড়ে। যদিও বিজ্ঞানের সাথে দর্শনের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তবুও বিজ্ঞানের দর্শন বিবেচনায় আমরা একটি সমন্বয়িক অবস্থা লক্ষ করি। সমাজদর্শনের সাথে দার্শনিক বিবেচনা ঘনিষ্ঠতরভাবে অন্বিত, তারই প্রলম্বিত বিকাশ আমরা মাঙ্গলিক বা সমাজবাদী অর্থনীতিতে নীতিধর্মী বিবেচনার প্রকাশে দেখতে পাই।

দর্শনশাস্ত্রের অন্য যে দিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হল সমন্বয়ন। বিভিন্ন ধারা ও ধারণার যুক্তিবাদী বিবেচনার মাধ্যমে গ্রহণ ও বর্জন কর্মের মধ্যদিয়ে বিভিন্ন বিষয় ও ধারণার একীভবনের সূত্র আমাদের অভিজ্ঞানের আলোকে বুদ্ধিবৃত্তিক উপলব্ধির মাধ্যমে বোধগম্য করে তোলে, এখানে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সামগ্রিকতা প্রাগ্রসরমানতার মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে থাকে। বিভিন্ন মতভিন্নতা এ প্রক্রিয়াকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

ন্যায়শাস্ত্রে দর্শনের এ দুটি ধারারই উপস্থিতি দেখতে পাই। বিশ্লেষণে যুক্তিবাদিতার উপস্থিতি নানা দিক থেকে বিচার-বিবেচনাকে শাণিত করে। অন্যদিকে মানুষের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার বিবেচনা একটি সামগ্রিক ধারণা সৃষ্টির প্রয়াস পায়। নীতিশাস্ত্রে জীবনদৃষ্টির যে নৈতিক বিবেচনা মানুষের সামগ্রিক অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে সমন্বয়নের মাধ্যমেই সমৃদ্ধ করে। নীতিজ্ঞান মানুষের যে সমস্ত কর্ম, অভিজ্ঞতা ও বিবেচনাকে নিয়ে ব্যাপৃত থাকে যেখানে ভালো-মন্দের বিবেচনা, শুদ্ধাশুদ্ধির বিশ্লেষণ, গ্রহণীয় অগ্রহণীয়তার বিচার প্রাধান্য পায়। এ সমস্ত ক্রিয়াকর্মের মাধ্যমেই মূল্যবোধ মানুষের জীবনের মৌল অনুভূতিতে পরিণত হয়। এই অনুভূতি ক্রমান্বয়ে কর্মের ক্রিয়াপ্রক্রিয়ায়

বিস্তৃত হয় এবং মানুষের নানা কর্ম ও সিদ্ধান্তে বিকশিত হয়ে পড়ে। নীতিশাস্ত্রে তাই যুক্তিবাদের উপস্থিতি যেমনি প্রবল মূল্যবোধের চর্চা, যুক্তিবাদ ও মূল্যবোধের সমন্বয় আমাদের ব্যক্তিক ও ব্যষ্টিক অভিজ্ঞানকে এমনভাবে সমৃদ্ধ করে যার ফলে জীবনে সঙ্গতিপূর্ণ ও একীভূত ধারণার সৃষ্টি হয়। ধর্মীয় নৈতিকতার ভিত্তি হল বিশ্বাস, দার্শনিক নৈতিকতার ভিত্তি হল যৌক্তিকতা ও সার্বিক সমন্বিত মাঙ্গলিক পরিব্রজ্যা। ইহজাগতিক কর্মে বিশ্বাসের প্রাবল্য আমাদের অযৌক্তিকতায় ঠেলে দিতে পারে। সে কারণে যুক্তিবাদী নীতিদর্শনের বিবেচনা সবিশেষ জরুরি, কেউ যদি বিশ্বাসের ভিত্তিতে যুক্তিবাদকে সমন্বিত করতে পারেন, কারণ বিশ্বাস ও যুক্তিবাদ মানবিক অভিজ্ঞতার একটি প্রকাশ, তাহলে মতভিন্নতার সৃষ্টি সীমিত হতে পারে। তবে মানবিক অভিজ্ঞানে অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাস ও যুক্তির সমন্বয় সার্বিকভাবে সমব্যয়িত হতে পারেনি এটাই ইতিহাসের অভিজ্ঞান। ব্যাংকিং ও ব্যবসায় এই ব্যর্থতার প্রকাশ বেশ প্রকট।

ন্যায়শাস্ত্রে শিক্ষা, বিচার ও বিবেচনার অন্তত তিনটি পথ লক্ষণীয়। একটি হল বর্ণনামূলক নীতিশাস্ত্র। এখানে নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের উপস্থিতি লক্ষণীয়। মানুষ, সংস্কৃতি ও সমাজের ন্যায় সম্পর্কিত ধারণার বিচার-বিবেচনা এখানে প্রাধান্য পায়। এখানে বিভিন্নতাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ বিভিন্নতা থেকে উত্তরণের সন্ধানে আমরা ঔচিত্যবাদিতার সৃজন দেখতে পাই। এখানে নীতিশাস্ত্রের সঙ্গতিপূর্ণ ও সমন্বিত একটি ধারা লক্ষণীয়। ঔচিত্যবাদী নীতিশাস্ত্রে যুক্তিবাদিতা এবং অথবা বিশ্বাসের প্রাবল্য লক্ষণীয়। সার্বিক মাঙ্গলিকতায় এর স্থিতি। এজন্য প্রাথমিকভাবে বিভিন্ন আপেক্ষিক নীতিবাদিতাকে একটি সার্বিক সামগ্রিকতায় সমন্বিত করতে ঔচিত্যবাদ সচেষ্ট হয়। এ জন্য মৌলিক কিছু ধারণাকে যুক্তির ভিত্তিতে বা অভিজ্ঞানের ভিত্তিতে তুলে ধরে। বিভিন্নভাবে এই মৌলিক ধারণার যুক্তিবাদিতাকে বিচার-বিবেচনা করে তার যথার্থতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। তৃতীয় ধারা নীতি- অধিবিদ্যা। বর্ণনামূলক বা ঔচিত্যবাদের সাথে এর ঘনিষ্ঠ সংযোগ রয়েছে। নীতি-অধিবিদ্যার কেন্দ্রে আছে নৈতিকতার যুক্তিবাদিতা। ভালো বা মন্দ বর্ণনামূলক বা ঔচিত্যবাদী ধারণাপ্রসূত হলেই হবে না, এর নৈতিকবোধ, চেতনা দায়বদ্ধতা যুক্তির বিচারে সিদ্ধ হতে হবে। প্রশ্ন উঠে ব্যবসা বা ব্যাংকিং-এ যখন নীতিবাদের বিবেচনা আসে তখন কি ঔচিত্যবাদ নিয়ে বিবেচনা বিধৃত থাকবে না অধিবিদ্যাও তার অংশ হয়ে দাঁড়াবে। নৈতিক যুক্তিবাদের বিশ্লেষণ নৈতিক বিবেচনার যথার্থতাই কেবল নিরীক্ষা করে না উপরন্তু বিচার-বিশ্লেষণে নৈতিক যুক্তিবাদের সহগ পূর্বসিদ্ধান্তের বিবেচনাকেও স্থান দেয়। নৈতিক যুক্তিবাদের বিশ্লেষণ চলমান সামাজিক প্রক্রিয়া এবং সে কারণে এটি ব্যবহারিক নিয়মানুবার্তিতা। নীতিশাস্ত্রের চলমানতা সময়ের আপেক্ষিকতায় পরিবর্তের অনুবর্তী করে। ব্যবসাক্ষেত্রে নীতিশাস্ত্রের ব্যবহার বর্ণনামূলক বা ঔচিত্যবাদে সীমাবদ্ধ থাকে না, অধিকন্তু অধিবিদ্যাকে তার অনুষঙ্গ করে নেয়। যে কোনো ব্যবসা, অন্য যে কোনো সমাজকর্মের মতো একটি নৈতিক অনুশাসন মেনে না চললে তার অগ্রগামিতা

বা বিস্তার স্তিমিত হয়ে যায়। সাধারণভাবে আমরা যে সমস্ত ব্যবসাকে অসামাজিক বলে জানি তারও একটি অলিখিত নৈতিক অবস্থান থাকে, না হলে পারস্পারিক ব্যবসায়িক সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যায়। সেজন্য ব্যবসায় তন্বিষ্ঠ নিয়মকানুনের সম্পর্কে একটি নৈতিক ধারণার অন্তঃজ অবস্থান লক্ষণীয়। আইনসিদ্ধতা ও নৈতিকতা সমার্থক নয়। যদিও আইনের অধিবিদ্যায় নীতিশাস্ত্রের প্রভাব থাকে, তবুও আইনের প্রয়োগে অনেক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বিচারিক ক্ষেত্রে নীতি অবস্থানের স্থিতি সবসময় লক্ষণীয় নয়। এ কারণে কোনো কোনো যান্ত্রিক বিবেচনায় অপরাধীর মুক্তি আইনসিদ্ধতা ও নৈতিকতার বৈপরীত্য লক্ষণীয়। এমনিভাবে ব্যবসায় আইনসিদ্ধতার অবস্থানও অনেক সময় নীতি অবস্থানের সাথে সাযুজ্যপূর্ণ হতে দেখা যায় না। এ থেকে যা অনুমান করা যায় তা হল ব্যবসার অন্তর্নিহিত বিন্যাস বা সংযুক্তির দুর্বলতাই আর্থিক উপার্জনের সাথে নৈতিকতার প্রকাশ্য সংযুক্তির বিচার ও বিবেচনায় ব্যবস্থাপকেরা উদ্বুদ্ধ হন না। ব্যাংকব্যবসা এ থেকে কোনো ভিন্নতর অবস্থানে থাকে না।

অনেকেই নৈতিকতাকে ব্যক্তিক বলে পাশ কাটিয়ে যেতে চান, সামষ্টিক নীতিবোধের বিষয়টি বিবেচনায় আসে না; যদিও আইনকে বিবেচনায় নিতে বাধ্যবাধকতা আছে। এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধারণা ব্যবসায় মূলবোধের ভিন্নতার একটি সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। এ ছাড়া অনেকে সাংস্কৃতিক ভিন্নতার কারণে মূল্যবোধের ভিন্নতাকে যথার্থ বলে মনে করে। নববর্ষে উপঢৌকন যদি সাংস্কৃতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয়, তারই নামে ঘুষের উপস্থিত অনেক ব্যবসায় অনেক দেশেই দেখা যায়। নৈতিকতার এই আপেক্ষিকতা ব্যবসাভেদেও উপস্থিতি। সেজন্য অনেকে নৈতিকতাকে ব্যক্তিক, আপেক্ষিক ও দেশজ সংস্কৃতিনির্ভর বলে নির্দিষ্ট করে থাকেন। ব্যক্তির নৈতিক ধারণা ও তার প্রয়োগে তিনটি স্তর দেখি। প্রথম স্তরে দেখি শিশু যা করলে বকুনি খায় সেটা থেকে বিরত থাকে। এই অবস্থাকে নীতিবিজ্ঞানীরা প্রচলিত জ্ঞানের পূর্বের অবস্থান বলে বিবেচনা করেন। শৈশবঅবস্থা পার হতে হতে সে জানে কী করলে প্রশংসিত হবার সম্ভাবনা প্রবল। এ জ্ঞান থেকেই প্রচলিত নীতিজ্ঞানের জন্ম। শাস্তি ও পুরস্কার, আনন্দ ও বেদনা থেকেই প্রচলিত ব্যবহার ও প্রয়োগবিধির মাধ্যমে করণীয় ও করণীয় নয় এমন ধারণার জন্ম। ব্যবসা-ক্ষেত্রে এর ভিন্নতা দেখা যায় না যদিও এখানে বিবেচ্য হয়ে ওঠে মুনাফা, ঔচিত্য নয়। কিন্তু নৈতিকতার যে স্বয়ম্ভু ও যুক্তিবাদিতার অবস্থান সেটা পুরস্কার বা তিরস্কার-নিরপেক্ষ। এই নীতিজ্ঞান লাভলোকসান খোঁজে না। আইনের বিধিবিধান দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয় না, এখানে আপেক্ষিকতা নেই আছে সজ্ঞান যুক্তিবাদিতা। ব্যবসা যেহেতু আইন নিয়ন্ত্রিত, সে কারণে যুক্তিবাদিতার অবস্থান একটি সীমায় আবদ্ধ। তেমনি অবস্থা ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রেও। উচ্চতর নীতিজ্ঞানের ফলিত প্রয়োগ সাধারণত ব্যবসা বা ব্যাংকিং-এ দেখা যায় না বলেই নানা সময়ে নানা রকমের সংকট। প্রতিযোগিতার আবরণে আসে নানা অনীতিবাদী কর্ম। নীতিনিরপেক্ষ ব্যবসায়ও সাধারণ মানুষের ক্ষতি তাদের কর্মে নিরত রাখার অবস্থান সৃষ্টি করে না। উচ্চতর

নীতিজ্ঞানে আপেক্ষিকতা থাকে না। যা আমার জন্য অন্যায়, সেটি অন্যের জন্যও অন্যায় বলে বিবেচিত। এখানে একটি বিশ্বজনীনতার ধারণা কাজ করে। উচ্চতর নীতিজ্ঞান সুবিধাবাদিতা, ব্যক্তিগত লাভ, আইনি প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে এক অবস্থান দেয়। এই নীতিজ্ঞান থেকে ব্যবহারিক প্রায়োগিক মানদণ্ডের সৃষ্টি হয়। যখন আমরা কোনো ব্যক্তিকে নৈতিকভাবে কাজকর্ম করতে দেখি তখন আমরা এ কথাই বোঝাতে চাই যে তার বিবেকের যে নীতি অবস্থান, সে সেখান থেকে বিচ্যুত হয়নি। সে ব্যক্তি জানে তাকে সত্যের পথে ন্যায়ের পথে নানা বিপত্তির মাঝেও টিকে থাকতে হবে।

নৃতাত্ত্বিক ও সমাজবিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সমাজে নৈতিকতার বিভিন্নতা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বিবরণমূলক বিভিন্নতা ও বিবর্তনমূলক বিভিন্নতা ছাড়াও নৈয়ায়িক বিভিন্নতার বিবেচনা না-করলে এ সম্পর্কে আমরা বিভ্রান্ত হতে পারি। নৃতাত্ত্বিক ও সামাজিক বিভিন্নতার উপস্থিতি নানা কারণে ঘটে থাকে, কিন্তু নৈয়ায়িক বিভিন্নতা ঠিক-বেঠিকের বিচারে নানা তাত্ত্বিক বিতর্কের সৃষ্টি করে। সত্য ও ন্যায়কে মুখ্য বিবেচনা করে প্রায়োগিক যে বিভিন্নতা সামাজিক ও নৃতাত্ত্বিক কারণে ঘটে সেখানে ব্যবসায় আমরা এক প্রকার প্রতিফলন দেখতে পাই, আমাদের বিবেচনায় সেগুলো মুখ্য হয়ে উঠলেও সত্য ও ন্যায়ের মৌলিক ধারণা বিনষ্ট হয় না। ফলে সত্য ও ন্যায়ের মতো নৈতিকতার মৌল ধারণা বিরাজিত থাকলেও প্রায়োগিক আপেক্ষিকতার উপস্থিতি সে শুদ্ধতার বিপরীতে যে অবস্থান নেয় সেখানেই নৈতিকতার সংকট উপ্ত হয়ে থাকে। এ থেকেই নৈতিকতার বহুত্ববাদের জন্ম এবং বিকাশ-ব্যাংক ও ব্যবসায় এর প্রকাশ সম্ভবত অনেক ক্ষতিকর নৈতিকতা ও উপযোগবাদ নিয়ে নানা আলোচনা হয়েছে। ব্যবসায় মুনাফা তার উপযোগবাদের চূড়ান্ত প্রকাশ। ব্যবসায়ী মহলের নৈতিকতা অনেকক্ষেত্রেই উপযোগবাদের ভিত্তিতেই মুনাফাকে নির্দিষ্ট করে থাকে। ব্যবসায় তাই উপযোগবাদের বিকাশ মুনাফার ধারণায় অগ্রাধিকারিক। অধিকতর মুনাফাকে অধিক উপযোগের বাস্তবতা বলে ধরে নেয়া হয়। কী করে সে অবস্থায় উপনীত হওয়া গেছে তার বিচার এখানে গৌণ হয়ে ওঠে। ব্যবসায় অন্তর্নিহিত স্বার্থপরতার উপস্থিতিই নৈতিকতার উপযোগবাদকে ভোগবাদিতায় রূপান্তরিত করে কারণ উপযোগের ভিত্তি হিসেবে সম্পদের আধিক্য স্থান পায়, মানবতাবাদের অন্য বিবেচনা বিনষ্ট হয় অথবা অনুপস্থিত থাকে। এর বিপরীতে অবশ্য স্থান নিয়েছে সুখকারতার ধারণা। ভোগ নয় চিত্তের তৃপ্তি এখানে মুখ্য হয়ে উঠে। চিত্তের তৃপ্তিতে বেদনা, পরার্থপরতা এমনকি ত্যাগও স্থান পায়। এছাড়াও তৃতীয় যে উপযোগবাদের ধারণা আমরা দেখতে পাই তা হল সম্প্রীতি। ব্যবসায় ক্রেতার সন্তুষ্টি অনেক সময় উচ্চারিত হলেও মূলত মুনাফাই তার লক্ষ্য থাকে বলে অনেক সময়ই এখন সামাজিক দায়বদ্ধতার উচ্চারণ আমরা শুনতে পাই। ব্যবসায় উপযোগবাদের ধারণায় ন্যায় ও সত্যের বিবেচনা অনুপস্থিত। ব্যবসায়ী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তার কর্মে ন্যায়কে ধারণ করেন কিন্তু তার উপযোগবাদের বিচারেই ন্যায়ের সীমারেখা টানা হয়। দুর্নীতিকে আমরা অন্যায় বলে জানি, কিন্তু

ব্যবসায়ীর মুনাফা বিবেচনায় উপযোগবাদের উপস্থিতি দুর্নীতি অবলম্বনে তাকে বিরত করে না এমন উদাহরণের কমতি নেই। ব্যাংক পরিচালনায়ও এমন অবস্থান অজানা নয়।

নৈতিকতায় উপযোগবাদের বিপরীতে স্বয়ম্ভু ধারণার সাথে আমরা পরিচিত হই। উপযোগ, আনন্দ, সুখ, তৃপ্তি এ সমস্তের সাথে নৈতিক যথার্থতার সম্পর্ক সরাসরি নয়। ধর্মে যেমন মানুষের সৃষ্টিকর্তার প্রতি দায়িত্বের নির্দেশনা আছে, তেমনি মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের বিবেচনাও আছে। ধর্মনিরপেক্ষভাবে জীবনদর্শনেও এর প্রতিফলন দেখা যায়। ধর্মীয় ধারণায় জাত ঔচিত্য বিষয়ক বিবেচনায় তাত্ত্বিক বিতর্কের স্থান নেই কিন্তু যারা জীবনদর্শনের ভিত হিসেবে স্বয়ম্ভু ধারণায় নৈতিকতাকে বিবেচনা করে সেখানেই নানা বিতর্কের অবতারণা হয়ে থাকে। যারা কর্মকরণে স্বয়ম্ভুর সন্ধান করেন তারা সে ধারণার বিশ্বজনীতা, অন্যের প্রতি যথার্থ ব্যবহার এবং যুক্তিগ্রাহ্যতাকে নিরীক্ষা করে দেখেন। নৈতিকতার একটি সাধারণ গ্রাহ্যতা আছে এবং ন্যায় ও অধিকার বিবেচনায় সে সাধারণ গ্রাহ্যতার বিকাশ ঘটে। ব্যবসা ও ব্যাংকিং-এ এমন নৈতিকতাবাদকে আমরা অনেক সময়ই অনুপস্থিত দেখি। সেখানে বিবেচনা সীমিত ও সীমাবদ্ধ।

নৈতিকতা দায়বদ্ধতার জন্ম দেয়। দায়বদ্ধতা অবস্থাভেদে ভিন্নরূপ পরিগ্রহ করলেও এর ভিত্তি থাকে নৈতিকতায়। যেহেতু আমাদের কর্মের জন্য আমরাই দায়ী, সেজন্য দায়বদ্ধতার নৈতিক ভিত্তিতে একটি সজ্ঞান অভিজ্ঞানের ধারণা অন্তঃজ রয়েছে। নৈতিক দায়বদ্ধতার সাথে কর্তব্যজ্ঞান, দায়িত্ববোধ, মুক্তচিন্তা, বিভিন্ন সম্ভাবনার বিবেচনা, বিবেকি সজ্ঞানতা, চারিত্রিক দৃঢ়তা, সত্যের জন্য গর্ব, অন্যায়ের জন্য লজ্জা, কর্মের জন্য দায়িত্ব এ সমস্ত ধারণা যুক্ত থাকে। ব্যবসায়িক নৈতিকতাভিত্তিক দায়বদ্ধতা ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নিয়ে থাকে। যদিও মিল্টন ফ্রিডম্যান ও জন সাইমন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের আইনগত দায়বদ্ধতাকে স্বীকার করেন কিন্তু নৈতিক দায়বদ্ধতার বিষয়টিকে অস্বীকার করেছেন। এর কারণ অবশ্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের আইনগত দলিল, সেখানেও তারা জনস্বার্থের নামে নিয়ন্ত্রণের আধিক্যকে নিন্দাবাদ করেছেন। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখেছি প্রতিষ্ঠানের নৈতিকতার দায় উচ্চ ব্যবস্থাপকের ওপর বর্তেছে অথবা তারা নিজেরাই সেটাকে স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রতিষ্ঠান স্বয়ম্ভু নয় আইনের সৃষ্টি, সেজন্য স্বয়ম্ভু নৈতিকতার দায় প্রতিষ্ঠানের ওপর চাপিয়ে দেয়া সঠিক কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক নৈতিকতার যে যৌথচরিত্র সেটি কোনো না কোনোভাবে উপস্থিত থাকে। কর্মবিভাজনে, সহযোগ অবস্থানে, অংশগ্রহণে, প্রণোদনায়, সংযুক্তির মাধ্যমে যৌথ দায়বদ্ধতার বিকাশ ঘটে। ব্যবসায় যখন নৈতিকতার বিচার করতে হয় তখন কেবল ব্যক্তিক বিবেচনাই যথেষ্ট নয় এর

নানাবিধ যৌথ অবস্থানের বিবেচনাটিও যথার্থ বলে মনে হয়। ব্যাংকিং যেহেতু একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, সেখানেও এ মন্তব্যটি সমভাবে প্রযোজ্য।

আমরা বর্তমান বৈশ্বিক পুঁজিবাদের যুগে প্রবেশ করেছি যেখানে পুঁজির ব্যবহার, উপযোগ, মালিকানা ও চলমানতার কোনো ভিত্তি নেই। সে কারণেই অর্থনীতিতে নীতি-মুক্ত বিবেচনার প্রধান্য লক্ষণীয় অথচ ধ্রুপদী পুঁজিবাদে অর্থনৈতিক বিবেচনায় নৈতিকতার মূল্য এ্যাডাম স্মিথের লেখাতেই লক্ষণীয়। পুঁজিবাদের দীর্ঘ ইতিহাস আছে, এর বিবর্তন ঘটেছে সমাজ-বিবর্তনের সাথে, প্রযুক্তির উদ্ভাবনের সাথে, বাজারব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে। পুঁজিবাদের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে প্রধানতম হল পুঁজির পুঞ্জিভবন ও শিল্পপুঁজির বিকাশ এবং বিস্তার। সময়ের সাথে অবশ্য শিল্পের সংজ্ঞাও বদল হয়েছে সেটা লক্ষণীয়। পুঁজিবাদের বিস্তারে সম্পদের কেন্দ্রীভবন, উৎপাদনে পুঁজির ব্যবহার, শ্রমের পণ্যভবন, ব্যক্তিক মালিকানায় মুনাফার মাধ্যমে সমাজ-সম্পর্কের বিবর্তন, প্রযুক্তির সাহায্যে শ্রমের বিশেষায়ণ এবং উদ্বৃত্তের শ্রেণিগত সঞ্চয়ন ও ব্যবহার ঘটেছে। এখানে কিভাবে পুঁজির উদ্ভব হল পুঁজির অধিকার কিভাবে বিন্যস্ত হওয়া উচিত এ সমস্ত নৈতিকতার বিষয় সাধারণভাবে অনুপস্থিত। পুঁজির ব্যবহারে উৎপাদন-উৎকর্ষতাই প্রাধান্য পায়। বৈষম্য বা দূষণ বিশেষ বিবেচনায় আসে না। পুঁজি কিভাবে পুঞ্জিভুত হয়েছিল তার নৈতিক বিবেচনাও অর্থনীতির আলোচনা ধারণ করে না। ফলে নীতিমুক্ত ধনতন্ত্রের বৈষম্যের বিস্তারে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা লক্ষ করলে বঞ্চনার বিস্তরণের দায় থেকে তাদের মুক্তি দেয়া যায় না।

পুঁজির ব্যক্তিক মালিকানা পুঁজিবাদের একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য, যদিও শেয়ার বা মিউচুয়াল ফান্ডের মাধ্যমে মালিকানার বিস্তৃতি ঘটতে পারে তবুও ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রীভবন মালিকানাকে অনেক সময় কিছু মালিকের অধীনস্থ রাখে। ব্যক্তিক সম্পদ এবং ব্যক্তির উৎপাদন-ব্যবস্থাপনার মালিকানা দুটি ভিন্ন বিষয়। উৎপাদন ব্যবস্থা, ব্যক্তিক মালিকানায় ব্যবসা, যোগাযোগ, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ইত্যাদির কেন্দ্রীভবনের কারণে বিভাজিত সমাজের এবং অসম সুযোগের সৃষ্টি হয় যা স্থিতিশীল উন্নয়নের সহায়ক হয় না। বর্তমান উন্নয়নশীল দেশে অস্থিতিশীল অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামাজিক অবস্থা পুঁজির কেন্দ্রীভবনের কারণে সুযোগসুবিধার বিষম বণ্টনের মধ্যদিয়েই অস্থির রাজনীতি, সমাজ, প্রশাসন ও ব্যবসায়িক বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করে। নীতিমুক্ত অর্থনীতি উৎকর্ষের নামে একে যত সমর্থনই দিক-না কেন, নীতিবিযুক্ত আর্থ-সামাজিক অবস্থা সামাজিক পুঁজি ও মানব-পুঁজির বিকাশে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে ন্যায়সঙ্গত সমাজ ও মানবিক উৎসরণ উন্নয়নের সহযোগী হয়ে ওঠে না। সার্বিক উৎপাদন বাড়লেও, দারিদ্র্যের প্রসারণ কিন্তু থেমে থাকে না। সামষ্টিক উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি বিতরণে ন্যায়সঙ্গত অবস্থানের সৃষ্টি করে না। এ কারণে ঐতিহাসিক ও নৈতিক বিবেচনায় ব্যক্তিক মালিকানাই প্রশ্নবিদ্ধ হয়। কোন অধিকারে কিছু মানুষ সম্পদের

মালিকানা অধিগ্রহণ করে, তার ভিত্তির যথার্থতা সবসময়েই প্রশ্নসাপেক্ষ ছিল। যে কারণে পুঁজিবাদের বিকাশে হরণকারী হঠকারিতার স্থান নিয়ে নীতিবাদী বিবেচনায় অনেক প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এদেশেও ষাটের দশকে বা আশির দশকের পরে যে নব্য-পুঁজিমালিকের বিকাশ ঘটেছে ব্যবসায় শিল্পে তার নৈতিকতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে এবং এখানে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহায়ক ভূমিকা বিস্মৃত হবার নয়। ব্যক্তির পুঁজির বিকাশে জ্ঞানসম্পদ, প্রযুক্তি সম্পদ ও সাংস্কৃতিক সম্পদের যে সামাজিক ঐক্যবদ্ধ মালিকানা এবং মানবিক উত্তরাধিকার যেভাবে ব্যক্তির অধিগ্রহণে তার মুনাফার তাগিদে ব্যবহৃত হয় সেটির কোনো নৈতিক ভিত্তি নেই। সমাজের সার্বিক মালিকানা যখন অস্বীকৃত অবস্থানে নিপতিত হয় তখন মাঙ্গলিক ও টেকসই উন্নয়নের ভিত বিনষ্ট হয়। বর্তমানে বিশ্বে তেল, খাদ্যশস্য, পানি, নির্মল জলবায়ু নিয়ে যে সমস্যা সেটার মূল রয়েছে ব্যক্তিক পুঁজির মুনাফাকেন্দ্রিক ব্যবহারে। জ্ঞানকে যারা পণ্যে পরিণত করে ব্যবসায় নামে, গবেষণার ফল প্রযুক্তিকে যারা ব্যক্তিক মালিকানায় আবদ্ধ করে, শিক্ষাকে যারা মানের বিভিন্নতা সৃষ্টি করে বিভাজিত সমাজের জন্ম দেয় এর ভেতরেই ব্যক্তিমালিকানা ও সামাজিক পুঁজির নৈতিক দ্বন্দ্ব প্রতিভাত হয়ে ওঠে। ব্যক্তিক পুঁজির বিকাশ শ্রমিকের উৎপাদন-সহায়ক ভূমিকার মূল্যকে যথার্থতা দেয় না। যন্ত্র বা অর্থ উৎপাদনের সহায়ক মাত্র, মূল চালিকাশক্তি হল কায়িক ও মেধাশ্রম। সে শ্রম যখন পুঁজির অধঃস্তন অবস্থায় চলে যায় তখন শ্রমিকের নৈয়ায়িক স্বার্থ দলিত হয়, শ্রমের মর্যাদা যা মানব-মর্যাদার ভিত সেটাই তখন বিনষ্ট হয়ে যায়।

পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় মুক্তবাজারের জয়গান আমরা অনেক শুনেছি। বলা হয়, মুক্তবাজার নিয়ন্ত্রিত নয় এবং অসংখ্য প্রতিযোগী ভোক্তা ও সরবরাহকারী এ বাজারে উৎকর্ষ সাধন করে সবার স্বার্থ রক্ষা করে। কিন্তু বাস্তবে আমরা বাজারে মধ্যস্বত্বের উপস্থিতি দেখি, দেখি একচেটিয়া ব্যবস্থার আনুপর্বিক ব্যবহার, উৎপাদনের উপাদানে সবার সমান স্বত্ব থাকে না যেমন থাকে না ভোক্তার ক্রয়ক্ষমতার সমতা। বলা হয় মুক্তবাজারের যৌক্তিক উপস্থিতি উৎপাদন ও বণ্টনে উৎকর্ষ নিয়ে আসে। এখানে স্বাধীনভাবে পছন্দের ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে। প্রতিযোগিতার কারণে উৎপাদনের খরচ কমে, পণ্যের মান নির্দিষ্ট হয়, ভোক্তার স্বার্থ রক্ষিত হয়। সেটা একটি স্বপ্নের রাজ্য যা বাস্তবে দেখা যায় না। প্রতি বিনিময়ে যে ন্যায্যতা ও সাবলীলতার উপস্থিতির কথা বলা হয়, তা প্রায়শই অনুপস্থিত। এর কারণ হল উভয়পক্ষের সমান সজ্ঞানতার অনুপস্থিতিই হল বাস্তবতা। ঝুঁকি নেবার ইচ্ছা অথবা নতুন কিছু প্রবর্তনের উদগ্র আগ্রহ এ সমস্তের সমতা বাস্তবে থাকে না। প্রতিযোগিতা কি সম্প্রীতি, সহযোগিতা বা সহমর্মিতার সৃষ্টি করে? বাজারব্যবস্থার একটি প্রবণতা হল ক্রমান্বয়ে দক্ষের আধিপত্য, যার ফলে উৎপাদন বাড়লেও, সামাজিক ন্যায় বিধ্বস্ত হয়ে যায়। আমাদের বর্তমান ব্যবসায়িক ও ব্যাংকিং খাতে অভিজ্ঞতা তো এ সত্যকেই উদ্ঘাটিত করে।

পুঁজিবাদী অর্থনীতির বাজার-আধিপত্যের কারণে সৃষ্ট নানা বৈষম্যের বিপরীতে সমাজতন্ত্রী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিবেচনা করা হয়। সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি সমাজতন্ত্রী রাজনীতি থেকে ভিন্ন করা যায় না। এখানে সরকার বা এক পার্টির আধিপত্য লক্ষণীয়। তাত্ত্বিক চিন্তায় কেন্দ্রীভূত ক্ষমতায়, উন্নয়নের পরিকল্পিত ব্যবস্থার মাধ্যমে দ্রুত শিল্পায়নের জন্য সমস্ত উৎপাদন-উপকরণের মালিকানা জনগণের কাছে দেয়া হয়। জনগণের মালিকানা ও সার্বিক সার্বভৌমত্ব গণতান্ত্রিক স্বচ্ছতায় নয় বরং পার্টির সিদ্ধান্ত দিয়ে নিয়ন্ত্রিত। পার্টি নিয়ন্ত্রিত সরকার ও জনগণের মানবিক ও অন্যবিধ অধিকারের সামঞ্জস্যহীনতাই নানা রকম নৈতিক প্রশ্নের জন্ম দেয়। সমাজতন্ত্রের তাত্ত্বিক যথার্থতা এবং এর প্রায়োগিক কাঠিন্য নানা দেশে নানা নৈতিক প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। মানুষে মানুষে সাম্য উন্নয়নে উৎকর্ষ আনে কিনা সে বিষয়ে, বিতর্ক দেখা গেছে, এছাড়াও পার্টি-নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রব্যবস্থা মানুষকে তার সংযোজিত উৎপাদন মূল্য দিতে যখন ব্যর্থ হয় এবং মূল্য যখন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত হয় তখন সমতা, নিরাপত্তা ও উৎকর্ষ প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে ওঠে বলেই সমাজতন্ত্রের যে বিকাশ আমরা দেখেছি সেখানে মানুষের নানা মৌল প্রয়োজন মেটাবার প্রচেষ্টা দেখা গেলেও সকল মানুষের সমান অধিকারের বাস্তবতা লক্ষ করা যায়নি। এখানে মিলোভিন জিলাসের ‘দি ন্যু ক্লাস’ স্মরণীয়।

মুক্তবাজার যেমন ব্যবসায় মুনাফার প্রাধান্য দিতে গিয়ে নানা নৈতিক সমস্যার সৃষ্টি করে, রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থাও নৈতিকতার মানদে ন্যায়সিদ্ধ অবস্থানেরও সৃষ্টি করে না। পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থায় উৎকর্ষের জন্য সমান সুযোগের ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দেয়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা কিন্তু পরিণামে সমতাভিত্তিক সমাজের প্রস্তাবনা করে না কারণ প্রতিযোগিতায় যোগ্যতা প্রমাণই পুঁজিবাদের ন্যায়ভিত্তিক সমাজের ধারণাকে প্রথাগতভাবে গুরুত্ব দেয়। পরিণামের ভিন্নতা বিষম সমাজের সৃষ্টির মধ্যদিয়ে সমান সুযোগের ধারণাকে বিনষ্ট করে পুঁজিবাদের নৈতিক অবস্থানকেই দুর্বল করে দেয়। সমাজতন্ত্র কেবল সমান সুযোগের কথা বলে না, সবার কাছে যোগ্যতা অনুসারে কর্মকেও গুরুত্ব দেয় কিন্তু বণ্টনে ন্যূনতম চাহিদা মেটালেও উৎকর্ষের জন্য প্রয়োজনীয় প্রণোদনামূলক অংশ দেয় না ফলে প্রতিযোগিতার স্থানে নিয়ন্ত্রণ অনেক গুরুত্ব পায়। নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ও বণ্টনের অসমতা ন্যায়ভিত্তিক নৈতকতার দিক থেকে যে সমস্ত প্রশ্নের অবতারণা করে তার আমলাতান্ত্রিক সমাধান ঔচিত্যকে নিশ্চিত করে না যেমনি বাজারনির্ভর অর্থনীতিকে সুবিধাভোগী প্রতিযোগীর আধিপত্যবাদী সমাধানও ন্যায় ও নৈতিকতাকে অর্জন করতে সহায়তা করে না। উৎপাদন ও ব্যবসায় এই সমস্যা সে সমস্ত অর্থনীতির আর্থিক ব্যবস্থায়ও প্রতিফলিত হয়।

পুঁজিবাদী বাজার, ব্যবসা ও আর্থিক ব্যবস্থায় নানা প্রাতিষ্ঠানিক ধরন থাকলেও মূলত ব্যক্তিক স্বাধীনতা ও ভোক্তার পছন্দের মুক্ত অবস্থানকেই ফল লাভের মৌল ভিত্তি

হিসেবে বিবেচিত হয়। পছন্দ ও কর্মের স্বাধীনতাকে দায়িত্ববোধ ও যৌক্তিকতাভিত্তিক বলে ধারণা করা হয় যদিও প্রতিটি বিনিময় বা বিনিয়োগ কর্মে ব্যক্তিস্বার্থই প্রাধান্য পায়। এ পদ্ধতিতে নৈতিকতার মূল উপাদান হল যুক্তিবাদিতা, সততা, স্বচ্ছতা এবং অন্যকে বাধ্য করার ব্যবস্থার অনুপস্থিতি। উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের এবং পরিচালক ব্যবস্থাপনা সংস্থার দায়বদ্ধতা, স্বচ্ছ প্রতিযোগিতা ও সকল তথ্যের উন্মোচিত অবস্থান এমনি ব্যবস্থায় নৈতিক প্রতিবেশ সৃষ্টিই প্রয়োজনীয় শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। এজন্য যেমন ব্যবস্থাপনাকে নীতি পরিচালনার কাছে দায়বদ্ধতা হতে হয় তেমনি নীতিনির্ধারকদের বৃহত্তর স্বার্থের অনুগামী হতে হয়। দায়িত্বজ্ঞান, ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও নানা রকমের গোপনীয়তা দায়বদ্ধতার স্থিতিকে বিনষ্ট করে। এজন্য প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে নানারকমের পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরীক্ষা যেটি কেবল আর্থিক নয়, সামাজিকও বটে। এর ফলে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ও বিভিন্ন সিদ্ধান্তের নৈতিক বিষয়টিও বিবেচনায় আসে। নৈতিক বিবেচনায় ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালনায় সকল পক্ষের অধিকার বিবেচনা যেমনি আসে, তেমনি ব্যক্তির উচ্চাশা, স্খলন-সম্ভাবনা, ক্ষমতার উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার এমনি অবস্থায় যাতে পরিচালনায় যুক্ত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যবস্থা থাকে সেদিকেও লক্ষ রাখা প্রয়োজন। নৈতিকতা আপনাআপনি প্রস্ফুটিত হয় না, এর জন্য পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়োজন হয় এবং নীতি পালনকারী মনন সৃষ্টির ব্যবস্থাও রাখতে হয়। আমাদের দেশে অন্য অনেক দেশের মতো ব্যক্তিক সম্পর্কের মাধ্যমে ব্যবসায় আন্তঃসম্পর্ক সৃষ্টি হয় যা অন্য অনেক সংশ্লিষ্ট পক্ষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এজন্য ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বিশেষ করে আর্থিক সংস্থার বেলায় সকল লেনদেনের স্বচ্ছতা ও নিয়মসিদ্ধতা জানার অধিকার কেবল নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ নয় সংশ্লিষ্ট পক্ষদেরও থাকা একটি প্রয়োজনীয় নৈতিক বিবেচনা।

সকল ব্যবসায় আর্থিক সংস্থার ব্যবসার গতি-প্রকৃতির মতো নতুন নৈতিকতার মানদণ্ডে কেবল উৎপাদনশীলতা, দক্ষতা, সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের প্রতি সমবিবেচনা এবং ন্যায়সিদ্ধতাই নয় আজ পরিবেশ বিবেচনা, নীতি ও পরার্থ সংরক্ষণ ধারণা ও সাধারণ স্বার্থরক্ষতার বিষয় উচ্চারিত হচ্ছে। আর্থিক ও অর্থনৈতিক চাহিদার বিচার শুধু নয়, সকল কর্মের সামাজিক বিচারও আজ প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। সমাজের সার্বিক অগ্রগামিতাই অর্থনীতির অগ্রগমনকে টেকসই করে। ক্ষুদ্র স্বার্থের বিবেচনা এমন অগ্রগমনকে অস্থিতিশীল করে দেয় বা করে দিতে পারে।

ব্যবসার সম্প্রসারণের সাথে ব্যাংকসহ বিভিন্ন আর্থিক সংস্থার অর্থ সংগ্রহ ও লেনদেনের নানা প্রকার বিস্তার ঘটেছে। বিশ্বায়ন, বাণিজ্যের বিস্তার, বিনিয়োগের সঞ্চালন, দেশবিদেশে শ্রমের আনাগোনা এ সমস্তই ব্যাংককে অর্থনীতি পরিচালনার কেন্দ্রে স্থিত করেছে। ক্রমেই সম্পদ ও বিনিময়ের আর্থিক সঞ্চালন বৃদ্ধি পেয়েছে, মুদ্রার হস্তান্তরিত হওয়ার গতি বেড়ে গেছে, দেশ থেকে দেশান্তরে পণ্য ও মুদ্রার অধিগমনও বিস্তৃত হয়েছে। ফলে ব্যাংকিংব্যবসার প্রসার ও প্রতিযোগিতা বেড়েছে, এ

ব্যবসার প্রকৃতিও বদল হয়েছে, প্রযুক্তি এ ব্যবসায় দিয়েছে নানা সম্ভাবনা সূত্র। তবুও মনে রাখতে হবে ব্যাংকিং ব্যবসা মূলত বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে চলে আর মূলধনের চাইতে আমানতের ওপর নির্ভরতা এখানে অনেক বেশি। বিশ্বাস ও আমানত খেয়ানত না হওয়ার জন্য বিশেষ নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন হয় যাতে মন্দকে পরিহার করা যায়। অন্যায়কে এড়িয়ে চলা যায়। নিয়মনীতি পালন করা যায় এবং শুভকে বরণ করা যায়। অনেক উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও ব্যাংকিং ব্যবসায় এই চিত্র সবসময় পরিলক্ষিত হয়নি। অথচ ব্যাংকের উচ্চ ব্যবস্থাপনায় খুব কম লোককে পাওয়া যাবে যারা তাদের কর্ম ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে সততা, সাধুতা, শুদ্ধতা, ন্যায়সিদ্ধতা, দায়বদ্ধতা, জবাবদিহিতা মেনে চলেন এমন কথাই আমাদের শোনাবেন। অথচ ঋণ যে প্রভাবের ফলে দেয়া হয়, মালিকের বেনামি শেয়ার যে আছে, মালিকের বেনামি প্রতিষ্ঠানের প্রতি যে পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয়, নানা প্রভাবে ঋণের সুদ মওকুফ হয়, একই কারণে ঋণের পুনঃতফশিলিকরণ ঘটে, ক্ষুদ্র আমানত ও ঋণের প্রতি যে অনাগ্রহ দেখানো হয় এ সমস্ত তো আমাদের জানা। আমরা ঋণখেলাপি পরিচালকের আইনি লড়াই দেখেছি, আমরা ব্যাংক কর্মকর্তার আমানতের অর্থ অপসারণের ঘটনাও শুনেছি। ঘুষ, প্রভাব, দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার আমাদের ব্যাংকিংব্যবস্থার মৌল সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

অনেকের ধারণা, বর্তমানের জটিল বিশ্বায়িত অবস্থায় সরল সহজ নিয়মনীতিতে অনৈতিকতা চিহ্নিত করার চাইতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে নানা জটিল তথ্যের বিশ্লেষণে দায়িত্বশীল পক্ষপাতশূন্য অবস্থানে থাকাটাই আজ নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে, কারণ মালিকের মূলধন রক্ষা অনেক সহজ কিন্তু বিস্তৃত আমানতের ব্যবহারে উৎপাদনশীলতা সৃজন ও আমানতকারী এবং আমানত ব্যবহারকারীর প্রকৃত স্বার্থরক্ষা অনেক কঠিন হয়ে পড়েছে। এজন্য প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মূল্যবোধের যে সজ্ঞানবোধ সর্বত্র সঞ্চারিত থাকা প্রয়োজন সে-জাতীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি সৃষ্টি অনেক ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে কারণ বিভিন্ন ব্যক্তির ব্যবহারিক ও প্রয়োগিক কর্মের মধ্যদিয়ে এ নৈতিক আবহের সৃষ্টি ও তাকে রক্ষা করতে হয়। ব্যক্তিক ও প্রাতিষ্ঠানিক মিথষ্ক্রিয়ায়, নৈতিকতার সংস্কৃতিকে সৃজন ও রক্ষণের মানসিকতা অনুপস্থিত থাকলে, স্খলনের উপস্থিতি লক্ষণীয় হয়ে উঠে। ব্যাংক আমানত গ্রহণ করে, সে আমানত বিনিয়োগ করে। যাদের কাছ থেকে আমানত আসে এবং যারা ঋণ নিয়ে থাকেন, তাদের সম্পর্কে জানা জটিল বিশ্বায়িত ব্যবস্থায় কঠিন হয়ে উঠছে। যিনি আমানত রাখছেন, তার অর্থের উৎস কতটুকু জানা যায়? আমানত সংগ্রহে ব্যাংকে তার পরিচিত পরিধির বাইরে যেতে হয়, আমানতকারীর নৈতিক আচার-আচরণ সম্পর্কে সব জানা সবসময় সম্ভব হয় না। একইভাবে ঋণ গ্রহণকারীর সার্বিক ব্যবসায়িক ব্যাপার জানা সর্বদা সম্ভব হয় না। আপনার আমানতকারী বা ঋণ গ্রহণকারীকে জানুন এটা একটি প্রচলিত কর্মপন্থা। কিন্তু যে অর্থনীতিতে চোরাচালানি, হুণ্ডি, নানা অপ্রচলিত ব্যবসায়িক ব্যবস্থা, বিদেশ থেকে

টাকার প্রবাহ এমনি সব নানা অবস্থা বিরাজ করে সেখানে মুনাফার নানা সম্ভাবনাকে নৈতিকভাবে সমর্থনীয় বলে মনে হয় না। রাশিয়ার মতো সমাজতন্ত্রী দেশে যখন দেশি ও বিদেশি পুঁজির লগ্নি নানাভাবে আসে তখন সমাজবাদী অবস্থার অবসান ও পুঁজিবাদের উত্থানকে অনেকেই নৈতিকভাবে সমর্থনীয় বলে মনে করেছেন। কিন্তু এর ফলে যে চোরাকারবারি, অর্থের অনিয়মিত পাচার, লগ্নির কেন্দ্রীভবন, নানা প্রকার ক্ষতিকারক কর্মসম্পাদন ঘটেছে তাকে নৈতিকতার মানদণ্ডে সমর্থনীয় বলে মনে হয়নি। আমাদের দেশেও নানাভাবে নানা উৎস থেকে যখন উগ্রবাদের সমর্থনে অর্থের লেনদেন ঘটে, জাতীয়ভাবে বিভাজিত সমাজ সৃষ্টির লগ্নি বিনিয়োগ হয়, কালো টাকা সাদা করার জন্য ঋণের প্রবাহ সৃষ্টি হয়, বিভিন্নভাবে প্রভাব সৃষ্টির জন্য অর্থের লেনদেন হয়, তখন এসবের সাথে ব্যাংকের সংশ্লিষ্টতাকে কতটুকু নৈতিক বলে ধারণা করা যায়?

এসব ক্ষেত্রে ব্যাংক-ব্যবস্থাপনা তাদের ব্যবসায়িক নিশ্চয়তা ও মুনাফার মাপকাঠির বাইরে দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে। যদি অবস্থা তেমনই হয় তাহলে ব্যাংক-ব্যবস্থাপনায় নৈতিকতার প্রশ্নটি অবান্তর হয়ে পড়ে। ব্যবসার ক্ষেত্র ও পরিবেশ ক্রমশই জটিল হয়ে উঠেছে, সে সাথে যুক্ত হয়েছে বিশ্বায়নের নানা পরিচিত-অপরিচিত নতুন-পুরাতন ব্যবসায়িক যৌগিক প্রক্রিয়া। ব্যাংক তার পরিচিত পরিবেশের বাইরে সংযুক্ত হয়, দেশভেদে আইনি বিভিন্নতা ও জটিলতার সৃষ্টি করে, এমনকি যাদের সাথে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে উঠতে হয় তাদের মানসিকতা ও নৈতিকতা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণীয় না-ও হতে পারে। আমরা জানি কিভাবে রাশিয়া থেকে অর্থ ব্যাংক অব নিউইয়র্ক ও অন্যান্য পশ্চিমের আর্থিক সংস্থার মাধ্যমে পাচার হয়েছে। আমাদের এ-ও জানা আছে, সিআইএ'র মতো গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন আর্থিক সংস্থাকে ব্যবহার করে থাকে। আমরা অফসোর ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থাকে কীভাবে সুযোগসন্ধানীরা ব্যবহার করে তার অনুসন্ধানী প্রতিবেদনও দেখেছি। রাজনীতির জন্য আর্থিক সংস্থার ব্যবহার কোনো নতুন বিষয় নয়। অনেক আইনজীবী দেশের আইনকানুনের কোনো ফাঁক-ফোকর ব্যবহার করে বিশেষ ব্যবসায়িক বিনিয়োগ করা সম্ভব তার বুদ্ধি ও নিয়মসিদ্ধতা নিশ্চয় করে থাকেন। নিয়মসিদ্ধ হলেই নীতিসিদ্ধ হয় না।

টেলিব্যাংক আজ অনেকের কাছেই পরিচিত। ব্যাংক অব স্কটল্যান্ড আমেরিকান ধর্মপ্রচারক ডক্টর প্যাট রবার্টসনের সাথে যখন টেলিব্যাংকিং নিয়ে প্রস্তাব বিবেচনা করছিলেন তখন ধারণা করা হয়েছিল এর মাধ্যমে তিন বিলিয়ন ডলার আমানত হিসেবে আসবে। ব্যবসা হিসেবে এটা আকর্ষণীয় ছিল কিন্তু ডক্টর রবার্টসন রাজনীতি সম্পৃক্ত নানা কর্মে যুক্ত ছিলেন যার ফলে কর্মচারী, আমানতকারী ও বিনিয়োগকারীরা একটি ব্যবসায়িক বিবেচনায় সুন্দর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে ব্যাংক অব স্কটল্যান্ডকে বাধ্য করেছিল। শুধু তাই নয় স্কটল্যান্ডের দীর্ঘসময়ের নৈতিক মূল্যবোধকে সমুন্নত রাখার আশ্বাসও দিয়েছিল। আমাদের দেশে রাজনীতিসম্পৃক্ত ব্যক্তিদের ব্যাংক-ব্যবস্থাপনা ও মালিকানায় উপস্থিতির হার চোখে পড়ার মতো। ব্যাংকের

ঋণখেলাপিদের মধ্যে রাজনীতিসম্পৃক্ত ব্যবসায়ীদের সংখ্যা নগণ্য নয়। অথচ এর নৈতিকতা নিয়ে কর্মচারী বা আমানতকারীরা যথাযথ তথ্য থেকে বঞ্চিত এবং এ ব্যাপারে কোনো উচ্চবাচ্য হয় না। ব্যাংকের রাজনীতিসম্পৃক্ত ব্যক্তির সাথে ব্যবসায়িক ব্যাপারে যথার্থ সতর্কতার প্রয়োজন বিভিন্ন দেশের ব্যাংকের অভিজ্ঞতা থেকে প্রতিভাত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, প্রযুক্তির যে প্রভাব ব্যাংকিংব্যবস্থায় এসেছে, টেলিব্যাংকিং, অটোমেশন, ক্রেডিট-ডেবিট কার্ড এ সমস্ত ক্ষেত্রে নানারকম তথ্যঝুঁকি দেখা দিয়েছে যার ফলে আমানতকারী বিভিন্ন দেশে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। সম্প্রতি মার্কিন দেশে গোয়েন্দা সংস্থা চল্লিশ লক্ষ আমানতকারীর বিষয়ে এমন ঘটনার তথ্য প্রকাশ করেছে। প্রাযুক্তিক সুবিধা ও আমানতের ঝুঁকির বিষয়ে এখনও যথার্থ বিবেচনা দেওয়া হয় না। এটি কেবল প্রাযুক্তিক বিষয় নয়, ব্যবসায়িক বিষয় নয়, এর ভেতরে যে নৈতিকতার প্রশ্ন জড়িত সেটি প্রাযুক্তিক সুবিধা ও ব্যবসায়িক মুনাফার বিবেচনায় ঢাকা পড়ে যায়। ব্যাংকের প্রাযুক্তিক বিস্তরণের মাধ্যমে মাদকব্যবসা, অস্ত্রব্যবসা, মানুষ পাচারের ব্যবসা, দুর্নীতিসম্পৃক্ত আদান-প্রদান, পরিবেশ দূষণের নানা রকমের ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড এসবের সাথে ব্যাংকের আর্থিক সংশ্লেষ থাকে। ঢাকার চারপাশের নদীগুলো শিল্পবর্জ্যের কারণে দূষিত হয়েছে, ব্যাংক তার অর্থঋণ প্রদানে এ বিষয়ে কতটুকু নজরদারি করে তা নিয়ে সন্দেহ থেকে যায়। গণমাধ্যম এদিকে সাম্প্রতিককালে দৃষ্টি দিলেও ব্যাংকের এ বিষয়ে অবিবেচনার বিষয়টি সামনে নিয়ে আসেনি। গৃহায়নের ক্ষেত্রে জলাশয় আইন বা বিল্ডিং কোড ভাঙছে যে সংস্থা তাদের কেবল মালিকানা, সিকিউরিটি বা রাজউকের অনুমোদন দেখাই কি যথেষ্ট? অর্থায়নকারী সংস্থার এখানে কোনো নৈতিক দায়িত্ব কি আছে? ইউরোপে এখনএক জাতীয় গ্রিন ব্যাংক, গ্রিন হাউজিং, গ্রিন বিজনেস এ-জাতীয় চেতনার উন্মেষ হয়েছে, আশা করা কি যায় আমাদের আর্থিক সংস্থা এমন বিষয়ে বিবেচনা রাখবেন?

বিভিন্ন দেশে নৈতিক আপেক্ষিকতার কারণে নানান সমস্যার সৃষ্টি হয়, এমনকি সাংবিধানিক আকারের প্রশ্ন দেখা দেয়। পশ্চিমে আজ পরিবারের গঠন ও সংজ্ঞা বদলে গেছে। অনেক দেশেই শরিয়া আইনের প্রয়োগ রয়েছে। এ সমস্ত কারণে ঔচিত্য সম্পর্কে ধারণারও বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে। মাদ্রাসাকে ঋণ দিতে আমাদের দেশের আইনে কোনো অসুবিধা নেই, মাদ্রাসা উন্নয়নও চলছে নানাভাবে। কিন্তু তুরস্কে এটি রাজনৈতিক বিতর্কের সৃষ্টি করে। বিশ্বায়নের যুগে বিভিন্নতার নানা ধরন ব্যাংকিং খাতে নৈতিকতার বিতর্কও বিস্তৃত হচ্ছে। আমেরিকায় গর্ভপাতে সহায়তাকারী সংস্থাকে সরকারি অর্থায়নে বাধা আছে, অনেক আর্থিক সংস্থাও এ বিষয়ে রক্ষণশীল। বিশ্বায়নের কারণে নৈতিকতার বিভিন্ন মানদণ্ড ব্যাংকিং ব্যবস্থাকেও প্রভাবিত করছে। আমাদের দেশে সরকারি বিশেষ ঋণ যখন দেয়া হয় তখন যাদের জন্য ঋণ তাদের অনেকেই বঞ্চিত হয়ে বিশেষ প্রভাবক দল এর সুবিধা ভোগ করে। কৃষিঋণ, তাঁতঋণ থেকে শুরু করে অনেক ঋণের ক্ষেত্রে দেখা যায় অনেকের নামে ঋণ দেয়া হয়েছে যার অস্তিত্ব নেই

অথবা যিনি আদতেই আসেননি; অনেকে ঋণ পান যারা এ ঋণের জন্য নির্দিষ্ট নন। এখানে ব্যাংকের কর্মকর্তা অথবা ব্যাংকের সার্বিক ব্যবস্থাপনার নৈতিকতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা অবান্তর নয়। এখানে অবশ্য মনে রাখা দরকার যে ব্যাংক পরিচালনার মানদণ্ড পরিবর্তিত হয় এবং ব্যাংক পরিচালনায় তার পরিচিতি ও ভাবমূর্তির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। ব্যাংকের স্থিতিপত্র স্বচ্ছ ও বোধগম্য হওয়া দরকার। স্মরণ করা যেতে পারে জাপানের আর্থিক সঙ্কটের সময় অনেক ব্যাংক স্থিতিপত্রকে সুসজ্জিত করার দায়ে অভিযুক্ত হয়েছিল, এমনকি সুইজারল্যান্ডের জাপানস্থ সরকারি সংস্থাও এ অভিযোগমুক্ত ছিল না। লেনদেনের কৃত্রিম চিত্রায়ন সৃজনশীলতার পরিচয় দিলেও যথার্থ নয় এবং নৈতিকতার বিচারে অগ্রহণীয়। আমাদের দেশে তো বটেই অনেক নামকরা ব্যাংকে এমন কৃত্রিমতায় সৃষ্ট অনৈতিক চিত্রায়ণকে চিহ্নিত করতে বর্তমান অর্থচিত্রের বিচারিক বিবেচনার বিষয়টি গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। এজন্য যে ব্যবস্থার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে তা হল নৈতিক ও আইনি মানদণ্ডের সাথে সাজুয্যপূর্ণ অবস্থানের প্রচেষ্টা। ব্যাংক যেহেতু আমানতের বাইরেও বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা, বিভিন্ন কর্মে উপদেশনা, ইন্সিওরেন্সসহ অন্যান্য ব্যবসার সাথেও যুক্ত হয় এর ফলে ফান্ড ব্যবস্থাপক নানা সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে যেখানে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বৈপরীত্য উপস্থিত থাকে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রে কোম্পানি পরিচালিত পেনশনব্যবস্থার পরিবর্তে ভিন্ন কোম্পানি পরিচালিত বিনিয়োগ ও মুনাফার অংশীদারিত্বভিত্তিক পেনশনব্যবস্থা গ্রহণ করে। পরবর্তীতে দেখা গেল ভিন্ন কোম্পানির পরিচালনা থেকে ব্যাংকের কর্মকর্তাদের ক্ষতিই হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকটি কর্মচারী স্বার্থরক্ষায় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না-করার কারণে অভিযুক্ত হয়েছে ও আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয়েছে। আমরা অবশ্যই বিয়ারিং কেলেঙ্কারির কথা ভুলে যাইনি। এখানে একজন ব্যক্তি যিনি ঝুঁকি নিতে পছন্দ করেন এবং বৈদেশিক মুদ্রাবাজারে অতিরিক্ত ঝুঁকি নিয়ে শতাব্দীপ্রাচীন ব্যাংকটির দায় এমন অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানটিকে মাত্র এক ডলারে অন্য মালিকানায় দিতে হয়েছিল। দায়বদ্ধতার দিক থেকেই এখানে নৈতিকতার বিষয়টি এসেছিল; অংশীদার, আমানতকারী ও বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যর্থতাই এখানে বিবেচিত হয়েছে। আমাদের দেশেও আমানতকারীর স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যর্থতার উদাহরণ কিন্তু কম নয়।

আমাদের দেশে ব্যাংকব্যবস্থা বিনিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে দেখা যায় আগে গ্রামীণ অঞ্চলে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যবস্থায় ক্ষতির মুখেও যে ব্যাংক-সেবার ব্যবস্থা ছিল, তার পরিমাণ কমে এসেছে। ব্যাংকের শহরমুখিতার কারণে শহরে ব্যবসা ও শিল্পের কেন্দ্রীভবন ঘটেছে এবং কর্মের সুযোগের বিকেন্দ্রীভবনের প্রবণতা অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে। অর্থনৈতিক বৈষম্য সৃষ্টিতে ব্যাংকের বর্তমান ব্যবস্থাপনা কি নীতিহীনতায় অভিযুক্ত হতে পারে? স্বল্প অর্থের সঞ্চয়ীদের জন্য সরকারি ব্যাংকের বিকল্প থাকছে না কারণ বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংক বড় আমানতকারীদের প্রতি বিশেষ বিবেচনা দিয়ে থাকে। প্রতিযোগিতার নামে এ সুযোগের বৈষম্য ও অর্থনৈতিক কর্মে সমান সুযোগ

অথবা দরিদ্রতর শ্রেণির জন্য বিশেষ সুযোগের যে অবস্থান তাকে দুর্বল করে দেয় যা ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাও সংশোধন করতে পারে না। ব্যাংক এখন নানাবিধ অসম সেবামূল্য নিয়ে থাকে, এর ফলে আমানতকারীদের অনেকেই বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। মুনাফা-সন্ধানী ব্যাংক বাণিজ্য-বিষম সমাজের জন্য আর্থসামাজিক বিভাজনের মাধ্যমে যে অর্থনৈতিক আধিপত্যবাদের সৃষ্টি করে, সামাজিক বিবেচনায় তাকে নৈতিক বলা চলে না। সুষম সমাজ সৃষ্টিতে 'ক্রস-সাবসিডির' প্রয়োজন রয়েছে। প্রয়োজন রয়েছে 'ইউজার পে' নীতির সাবধানী প্রয়োগের। সার্ভিস চার্জ ও সুদের বিনিয়ন্ত্রণ অস্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশে সামাজিক নীতিবদ্ধতার বিসর্জন বিষয়ে নানা আলোচনা সৃষ্টি করেছে। আজ যখন ব্যবসার সামাজিক দায়িত্ব নিয়ে মুখর আলোচনা হয় তখন বিভাজিত সমাজের বাস্তবতাকে বিসর্জন দিয়ে আমানত ও ঋণের কেন্দ্রীভবন ও সে হারে সেবারও কেন্দ্রীকরণ নিশ্চয়ই ব্যাংকিংব্যবস্থায় একচোখা নীতির জন্ম দিয়ে চলেছে।

আমরা যখন, ব্যাংকে ভালো ব্যবস্থাপনার কথা বলি তখন আমানতকারীদের প্রতি সুবিবেচনা, দূরদর্শী ব্যবস্থাপনা, সুস্থ আর্থিক অবস্থার কথাই মনে রাখি। অর্থনীতিতে স্থিতিশীলতা ও গতিশীল উৎপাদন ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নয়নের ভাবনা থাকে আমাদের চিন্তায়। প্রতিটি ব্যাংক তার ঝুঁকি এমনভাবে মানিয়ে চলবে যেন তার আমানতকারী সম্পদ না-হারায় এবং ঝুঁকির আধিক্যে ব্যাংকটির কারণে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও তাদের কর্মতৎপরতায় বিধ্বস্ত অবস্থায় নিপতিত না-হয়। ব্যাংকটি যদি অপরিচালনীয় অবস্থায় গিয়ে পড়ে তবে অর্থনীতিতে এর ধাক্কা ব্যাপক হয়ে পড়ে। পরিচালনার এ সাধারণ ধারণার পিছনে বেশ কিছু নৈতিক চেতনা রয়েছে। প্রথমত, কর্মের স্বচ্ছতা, ব্যবসায়ে ন্যূনতম বিভিন্নতা এবং দায়িত্বশীল কর্মতৎপরতায় দায়বদ্ধতার প্রকাশ। দ্বিতীয়ত, ব্যবসা পরিচালনায় যথার্থ ও পরিচ্ছন্ন মানদণ্ড যার মধ্যে সুস্থ বিবেচনা প্রস্ফুটিত হয়। তৃতীয়ত, সকল রকম বেআইনি, অনুপযুক্ত, বেমানান, অশোভন কর্মপ্রক্রিয়া বর্জন। মনে রাখা প্রয়োজন বেআইনি, অযথার্থ ও অতিরিক্ত ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডই ব্যাংকের স্থিতিশীলতা নষ্ট করে যার ফলে সমগ্র ব্যাংকব্যবস্থা ঝুঁকিতে পড়ে যেতে পারে যা ঘটেছিল দক্ষিণ এশিয়ায় এখন পশ্চিমে ও সারা বিশ্বে। জনগণের আস্থাই ব্যাংককে গতিশীল করে আর আস্থার ভিত হল স্বচ্ছ নীতিবদ্ধতা। এই নীতিবদ্ধ অবস্থান সৃষ্টি ও সেটি ক্রিয়াশীল রাখাই কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সামগ্রিক আর্থিক সংস্থাগুলোর দায়িত্ব। এজন্য প্রয়োজন ব্যাংক পরিচালনার একটি নীতিনিষ্ঠ প্রত্যয় ও প্রায়োগিক অবস্থান।

এ জন্য প্রতিটি ব্যাংকের নীতি অবস্থানের একটি স্পষ্ট ধারণা পরিব্যাপ্ত হতে হবে। এজন্য পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় যারা আছেন তাদের আচরণে নীতিস্খলনের কোনো ধারণা থাকা অনুচিত। নৈতিকতা তখনই প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে ওঠে যখন পরিচালক

ও ব্যবস্থাপকেরা সব স্তরেই নীতিবোধের স্পষ্ট পরিচয় রাখেন এবং তার মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারী উজ্জীবিত করেন। নীতিসিদ্ধ আচার-আচরণের সাথে কর্মে নিযুক্ত সকলেরই বিচারিক মানদণ্ড স্পষ্ট হতে হয়। মানদণ্ড থাকাই যথেষ্ট নয়, মানদণ্ড ব্যবহার নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। হংকং ও সিঙ্গাপুরে প্রতিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে একজন নীতিসম্পৃক্ত পরামর্শক আছেন যিনি যে কোনো কর্মকর্তার মানদণ্ড ও তার প্রয়োগ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দিয়ে থাকেন। যুক্তরাষ্ট্রে সমীক্ষা থেকে দেখা গেছে, মানদ ও নীতিসিদ্ধতা সম্পর্কে সীমাবদ্ধতা অনেক সময় কর্মকে যত-না নৈতিকতাসমৃদ্ধ করে তার চাইতে উচ্চতর ব্যবস্থাপনায় নীতিসিদ্ধ আচরণের ব্যপকতা ও স্পষ্টতা তার চেয়ে অনেক কার্যকর ভূমিকা রাখে। অবশ্য পুরস্কার ও তিরস্কার এ ব্যাপারে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে। আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এর কোনো উপস্থিতি দৃশ্যমান নয়।

আজকাল 'কর্পোরেট গভার্নেন্স' নিয়ে নানা আলোচনা হয়। ব্যাংকিং খাতে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার সংস্কৃতি নিয়ে সাম্প্রতিককালে যে সমীক্ষাগুলো হয়েছে তা থেকে একটি বিষয় প্রতিভাত হয় যে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা যত উচ্চ নৈতিক অবস্থানকে নীতি ও কর্মে বিস্তার করতে পারবে ততই প্রতিযোগী অবস্থায় ঝুঁকি-ব্যবস্থাপনা সহজতর হবে এবং এ অবস্থান সৃষ্টিতে প্রাথমিক দায়িত্ব পরিচালনা পর্ষদের। পরিচালনা পর্ষদের সততা, স্বচ্ছতা, ন্যায়পরায়ণতা দায়বদ্ধতা এ সমস্তই প্রাতিষ্ঠানিক নীতি অবস্থান নির্দিষ্ট করতে সহায়ক হয়। প্রতিযোগিতার জগতে নানা দোষে দুষ্ট ব্যবসায়িক ও সরকারি সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া বিভিন্ন জটিলতার সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায় ব্যাংক-ব্যবস্থাপনাকে মনে রাখতে হবে আর্থিক সংস্থায় নীতিমান্যতা বিলাসিতা নয়, কোনো বিমূর্ত আদর্শিক ব্যাপার নয়, বরঞ্চ এই নৈতিকতার সুস্পষ্ট প্রকাশ অর্থনীতির স্থিতিশীল অবস্থার শিকড় নির্মাণ করে, ব্যবসায়ে বিভিন্ন জটিল অবস্থা উত্তরণে সহায়তা করে এবং এ কারণেই সুস্থ ব্যবসায়িক পরিবেশ সৃষ্টিতে যথেষ্ট ক্রিয়াশীল হয়। নৈতিকতাসমৃদ্ধ ব্যাংকিং পরিচালনা দীর্ঘকালে গতিশীল উন্নয়নের ভিত রচনা করে।

চার.

আমি আগেই বলেছি ব্যাংকিং একটি পেশা। বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির পরিবর্তনের সাথে পেশাগত বিশেষায়ণ মিথষ্ক্রিয়া ব্যাংকিং পেশাকে অর্থনীতির দিক থেকে এক বিশেষ অবস্থানে নিয়ে গেছে। ব্যাংকিং পেশা আজ আর শাইলকের শোষণপ্রক্রিয়ার স্থানে নেই। এ পেশায় নিযুক্ত মানুষেরা যেমন জীবিকার অন্বেষায় এর সাথে যুক্ত তেমনি তারা অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সঞ্চয় ও বিনিয়োগের সংশ্লেষ ঘটাতে দক্ষতার পরিচয় দিয়ে থাকেন। তারা জানেন কীভাবে কোন মূলধনী সংমিশ্রণ

অর্থনৈতিক গতিশীলতাকে নিশ্চিত করবে। এজন্য তার কর্মে সংজ্ঞানতা, নির্ভরযোগ্যতা, বিশ্বাসযোগ্যতা, সহমর্মিতা ও সচেতন ন্যায্যতা পরিস্ফুট থাকতে হয়। চিকিৎসক ও আইনজীবীদের পেশাগত দিক যত বিবেচনা ও আলোচনা বিদ্যমান ব্যাংকিং ক্ষেত্রে তেমনটি দেখা যায় না। এ দুটি ক্ষেত্রে নানা জটিল কর্মজ্ঞানের ওপরে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের ব্যাপক ভিত্তি লক্ষ করা যায় এবং সে জ্ঞান অর্জনে বহুদিনের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ও নবিশিকর্মের প্রয়োজন হয়। চিকিৎসা ও আইন-পেশায় প্রতিনিয়ত নানা ধারণা, চিন্তন, বিশ্লেষণ, পরীক্ষা ও নিরীক্ষার ভিত্তিতে প্রমাণিত ও নির্ভরযোগ্য নির্দেশনা পাওয়া যায়। এ দুটি পেশায় আমরা আর্থসামাজিক সংশ্লেষ দেখতে পাই। এ দুটি পেশায় দীর্ঘকালীন স্বশাসিত নিয়ন্ত্রণ লক্ষণীয় যা নৈতিক বিষয়টিকে যথার্থ গুরুত্ব দেয়। এ প্রেক্ষিতে বিচার-বিবেচনা করলে আমরা লক্ষ করি ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যাংকিং কর্মে নিয়োজিত কর্মীদের বিশেষায়িত জ্ঞানের প্রয়োজন বেড়েছে এবং এ সম্পর্কে নানা তত্ত্ব ও তথ্যের সংশ্লেষ ঘটেছে যা থেকে নির্দেশনা পাওয়া সম্ভব। ব্যাংক আজ আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে একটি প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু পেশাগত দায়িত্বশীলতা সত্ত্বেও এখানে নৈতিক বিধিবিধানের ভিত্তি স্বয়ম্ভু নয় এবং এর কোনো নৈতিক সার্বজনীনতাও সৃষ্টি হয়নি। এটি অন্য ব্যবসার মতো নিজস্ব কর্মকৌশলের অধীন। এখানে নৈতিকতাও আপেক্ষিক। এ কারণে ব্যাংকিং একটি গুরুত্বপূর্ণ পেশা হওয়া সত্ত্বেও আজ নৈতিকতার ভিত সন্ধানে ব্যস্ত রয়েছে। তাত্ত্বিকেরা এবং নানা রকমের নিয়ন্ত্রণও এখানে সে নৈতিকতার নিশ্চিত ভিত এখনও সৃষ্টি করে দেয়নি। সাম্প্রতিককালের ব্যাংকিংসহ আর্থিক খাতের যে জটিল অস্থিরতা সেখানে এই নীতি অবস্থানের বিবেচনা তেমন আলোচিত হয়নি। যে ব্যাংকিং সংস্থার অতি-মূল্যায়িত কর্মকর্তাগণ অস্বচ্ছ সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে অজানা প্রক্রিয়ায় সংস্থাটির অস্তিত্বকে প্রশ্নসংকুল করে তুলেছেন এবং যাদের নিমজ্জনকে ঠেকাতে মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রবক্তা সরকারকে সাধারণ মানুষের করের টাকা বা তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া ঋণের বোঝা খরচের দায় হিসেবে গ্রহণ করতে হয়েছে, সেখানেও নৈতিক দায়িত্ব স্বীকার করে কারো স্খলিত আন্তঃশাসনের স্বীকৃতি আজ পর্যন্ত মেলেনি। সমস্ত অপসিদ্ধান্তের দায় গিয়ে বর্তেছে সাধারণ মানুষের ওপর না হলে বলা হয়েছে তাদের অবস্থা আরও খারাপ হবে। এটা রাজনৈতিক অর্থনীতির একটি প্রকাশ বলে ধরে নিলেও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণহীন পরিতোষণার যে দায় তা থেকে দায়ী প্রতিষ্ঠান, তার কর্মকর্তা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব যারা নিয়েছেন তাদের জনকল্যাণ সম্পর্কে মুক্তবাজার অর্থনীতির সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও অতি-নির্ভরতা এবং নিরীক্ষণের অস্বচ্ছতা এর ফলে সৃষ্ট দায়বদ্ধতাহীন অবস্থার সৃষ্টির নৈতিক দায় কার ওপর বর্তাবে?

বিশ্বায়ন ও বিশেষায়ণের ফলে ব্যাংকিংসহ প্রায় সকল সেবা খাতেই বিশেষজ্ঞের আধিপত্য লক্ষণীয়। ইভন ইলিচ (Ivan Illich) তার সুলিখিত ও বিশ্লেষণধর্মী বইতে বিশেষজ্ঞকে অযাচিত অপ্রয়োজনীয় অনিয়মতান্ত্রিক যদৃচ্ছ ক্ষমতার ব্যবহারকারী হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ইভান ইলিচের বিবেচনায় বিশেষজ্ঞরা নানা সেবার আবিষ্কারক এবং সে সেবা দিতে যে জ্ঞান ও বিবেচনার যে প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয় তা অতিরঞ্জিত। বিশেষজ্ঞরা মানুষের সাধারণ বিবেচনা থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের যে অধিকার সেটিও তারা সুকৌশলে কেড়ে নেয়। তিনি লিখেছেন এই বিশেষজ্ঞরা "are more entrenched than a Byzantine bureaucracy, more international than a world church, more stable than a labor union, endowed with wider competencies than any shaman, and equipped with a tighter hold over those they claim than any mafia" শিক্ষকেরা আজ স্বশিক্ষা ও জীবন-জগৎ থেকে পাওয়া শিক্ষাকে বাইরে রেখে প্রাতিষ্ঠানিকতায় আবদ্ধ শিক্ষাকে প্রাধান্য দেন। শিক্ষার যে মোড়ক তা শিক্ষাসেবার নামে তাদেরই সৃষ্টি। ডাক্তার, আইনজীবী, ইমাম, সমাজসেবক তারাও নিজ নিজ মোড়কে সেবার মান ও প্রক্রিয়া নির্দিষ্ট করে থাকেন। তারা তাদের সহযোগীদের সাহায্যে যে সেবাপ্রদান সংস্থার একচেটিয়া সম্মিলন ঘটান সেখানে ক্রেতা বা ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকে না। আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ও সেবা-বিপণন বিশেষজ্ঞরা এর বাইরে নন। এই বিশেষজ্ঞদের এমন ক্ষমতা থাকে তারা সেবা-গ্রহীতাদের প্রয়োজন নির্ণয় করে, সে প্রয়োজন মেটাবার পথও তারা বাতলে দেন। এই যে দাতা-গ্রহীতা সম্পর্ক সেটাই কিন্তু অনিয়মতান্ত্রিকতার বীজ বপন করে। গ্রহীতার ওপরে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আসে তার দক্ষতা ও গ্রহীতাকে সম্মোহন করবার ক্ষমতা থাকে। গ্রহীতার ওপরে তার আধিপত্য ও অভিভাবকত্ব অর্জন নিশ্চিত করাটাই তার বিপণন-দক্ষতার লক্ষ্য। এছাড়া থাকছে লগ্নিকারীর 'ইনসাইডার' সম্মোহন।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে উদ্যোক্তাদের অর্থের পরিমাণ সামান্য। এখানে সেবা-গ্রহীতাদের অর্থই তাদের সম্পদসৃজনের ভিত্তি। এই মুনাফা ও সম্পদ-সৃজনে যে আকর্ষণ ও বিস্তার ঘটে সেখানে নানা স্বার্থের সমন্বয় ঘটে। সিদ্ধান্ত গ্রহণে সবসময় নিয়মতান্ত্রিকতা থাকে না। আধিপত্যবাদী স্বার্থের প্রভাবও বেশ বিস্তৃত থাকে। যাদের অর্থের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এসব প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি তাদর স্বার্থ অনেক সময় জলাঞ্জলি দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক অব্যবস্থাপনা, শীর্ষ ব্যবস্থাপকদের নানা লোভনীয় প্রয়োজন মেটাতে অনেক সময় ছলচাতুরির আশ্রয় নেয়া হয়ে থাকে। আমাদের অর্থব্যবস্থায় যে খবরদারির ব্যবস্থা আছে তাতে দেশজ ধারণার বাইরে পাশ্চাত্যের বাজারনির্ভর অবস্থার আইনি ধারণার প্রাধান্য দেখা যায় ফলে অর্থসম্পদের যথার্থ ব্যবহার নিশ্চিত হয় না। ফলে স্বল্প আয়ের মানুষ সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এ কারণে সমস্যাসংকুল সংশয়িত বিশ্বে বিশেষজ্ঞের বিশেষায়নের ভিত্তি হিসেবে নৈতিকতার প্রয়োজনীয়তা আজ অতি-

প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। আমাদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রতিষ্ঠান যারা ‘পাবলিক স্পেসে’ কাজ করেন তাদের জ্ঞানের প্রসারণ ও প্রতিযোগী বিপণনের সম্মোহন থেকে জনকল্যাণের প্রাধান্যে ফিরে যেতে হবে কেননা নৈতিকতা পেশাদারিত্বের প্রাথমিক ।

বিবেচনা

[উৎস : ‘বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট’ আয়োজিত ৮ম ‘নূরুল মতিন মেমোরিয়াল বক্তৃতা’ হিসেবে লিখিত ও পঠিত ।]

রবীন্দ্রভাবনায় কৃষকের অধিকার

....

আ তি উ র র হ মা ন

‘আমার যৌবনের আরম্ভকাল থেকেই বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার নিকট-পরিচয় হয়েছে। তখন চাষিদের সঙ্গে আমার প্রত্যহ ছিল দেখাশোনাওদের সব নালিশ উঠেছে আমার কানে। আমি জানি, ওদের মতো নিঃসহায় জীব অল্পই আছে, ওরা সমাজের যে তলায় তলিয়ে সেখানে জ্ঞানের আলো অল্পই পৌঁছায়, প্রাণের হাওয়া বয় না বললেই হয়।’ (রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃ. ৫৬২) রবীন্দ্রনাথ এসব অসহায় কৃষকের অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন দেখেছেন। তাদের অধিকার নিয়ে, আত্মমর্যাদাবোধ নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পথ দেখিয়েছেন। প্রচলিত জমিদারি প্রথার প্রতি বৈরাগ্য আর হতদরিদ্র চাষি প্রজাদের প্রতি মমতা কবিচরিত্রের এক অনন্য দিক। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মানবতার কবি। জমিদার হয়েও তিনি গরিব কৃষকদের দুঃখ-বেদনা হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন।

প্রজাদরদী রবীন্দ্রনাথ কৃষকদের অধিকারের বিষয়ে সচেতন ছিলেন। বিশেষভাবে তিনি মানবিক অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন। কবি চাইতেন জমিদাররা যেন দুখী মানুষের উপকার করে, তাদের অধিকার রক্ষা করে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ‘...আমাদের দেশে জমিদার জমিদারমাত্র! তিনি জুলুম করিয়া খাজনা আদায় করিতে পারেন, কিন্তু সমাজে তাঁহার অধিক অধিকার নাই। ...বর্তমান জমিদারগণ যদি

সেকালের দৃষ্টান্ত অনুসারে, কেবল রাজার মুখ না চাহিয়া, খেতাবের লক্ষ্য ছাড়িয়া জনহিত সাধন ও দেশের শিল্প-সাহিত্যের রক্ষণ পালনে সহায়তা পালন করেন তবেই তাঁহাদের ক্ষমতার সার্থকতা হয় এবং গৌরব বাড়িয়া ওঠে। ...সেই মহৎ গৌরব এখানকার জমিদাররা প্রতিদিন হারাইতেছেন। দেশ যখন চাহিতেছে রুটি তাঁহারা দিতেছেন প্রস্তর; বঙ্গভূমি তাহার জলকষ্ট, তাহার অন্নকষ্ট, তাহার শিল্পনাশ, তাহার বিদ্যাদৈন্য, তাহার রোগতাপ লইয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়াছে, আর তাঁহারা স্বদেশ প্রত্যাগত সাহেব-রাজকর্মচারীদের পাষাণ প্রতিমূর্তি গড়িয়া দিতেছেন।' (রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খ , পৃ. ৮৬৯-৭৮)

রবীন্দ্রনাথ জমিদারদের মানবিক অধিকারে বিশ্বাসী হতে বলেছেন। তিনি নিরন্ত র ভেবেছেন কী করে কৃষক তার আত্মশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে পারে, কী করে অধিকার নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে, কী করে অধিকার নিয়ে কথা বলতে পারে। সেজন্য কবি সমসময় এইসব বঞ্চিত মানুষকে একত্র করতে চেয়েছেন। তিনি মনে করতেন, মানুষ সংগঠিত হলে উন্নয়ন সহজ হয়। 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে 'সমাজ' প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন। সেজন্যই তিনি শিলাইদহ, পতিসর ও শ্রীনিকেতনে সমবায়ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড শুরু করেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন সামগ্রিক কল্যাণ সাধন হলেই সব মানুষের অধিকারের স্বীকৃতি ঘটবে। তিনি জমিদারগণকে প্রজাদের কল্যাণ সাধনে এগিয়ে আসার আহ্বান করেছেন। তাঁর মতে, আদর্শ সমাজ গঠনের মাধ্যমেই সাধারণ মানুষের অধিকারের স্বীকৃতি ঘটবে, অধিকার সংরক্ষিত হবে। অধিকার অর্জনে কবি সকলকে উদ্যোগী হতে বলেছেন। কেননা, নিজেরা নিজেদের কর্মে উদ্যোগী হলেই নিজেদের অধিকার রক্ষা পাবে। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, '...আমরা যাচিত ও অযাচিত যে-কোনো অনুগ্রহ পাইয়াছি তাহা যেন ক্রমে আমাদের অঙ্গুলি হইতে স্খলিত হইয়া পড়ে এবং তাহা যেন স্বচেষ্টায় নিজে অর্জন করিয়া লইবার অবকাশ পাই। আমরা প্রশ্রয় চাহি ম্নপ্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্‌বোধন হইবে। ...আঘাত, অপমান ও অভাব, সম্পদের নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষা নহে।' (ঐ, পৃ. ৭৩৯-৪৩) রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, প্রতিকূলতার দ্বারাই শক্তির উদ্‌বোধন হবে। তিনি 'শক্তি' প্রবন্ধে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির জাগরণ চেয়েছেন। তাঁর মতে, সঙ্ঘবদ্ধভাবে শক্তি অর্জনই বিধেয়। মানুষ যদি দুর্বল হয়, বলহীন হয় তাহলে অধিকারের অধিকারী হতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশবাসীকে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে নিজের অধিকারের বিষয়ে সচেতন হওয়ার কথা বলেছেন, সবার অধিকারকে মর্যদা দিতে বলেছেন। সবার অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বিশ্বনাগরিক কবি রবীন্দ্রনাথ 'বিজয়া সম্মিলনী'র (২১ কার্তিক ১৩১২) ভাষণে বলেছেন, 'যে চাষি চাষ করিয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো, যে রাখাল ধেনুদলকে গোষ্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো। ...মনে রাখিতে হইবে আজ স্বদেশের স্বদেশীয়তা আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে, ইহা রাজার কোনো প্রসাদ বা অপ্রসাদের উপর নির্ভর

করে না...আমার স্বদেশ আমার চিরন্তন স্বদেশ...কোনো মিথ্যা আশ্বাসে ভুলিব না, কাহারো মুখের কথায় ইহাকে বিকাইতে পারিব না, একবার যে হস্তে ইহার স্পর্শ উপলব্ধি করিয়াছি, সে হস্তকে ভিক্ষাপাত্র বহনে আর নিযুক্ত করিব না।' (ঐ, পৃ. ১৪২)

রবীন্দ্রনাথ দরিদ্র ও অসহায় কৃষকদের অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি কৃষকদের আর্থিক স্বচ্ছলতা আনায়নে কৃষির বহুমুখীকরণের পাশাপাশি গ্রামীণ জনপদে অকৃষি খাতের যেমন কুটির শিল্প, রেশমশিল্প ও তাঁতশিল্পের সম্প্রসারণসহ আয়-উৎসারী কর্মকাণ্ডের কথা বলেছেন। কুষ্টিয়ায় বয়ন বিদ্যালয় স্থাপন করেন। প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান দিতে পতিসরে ও শ্রীনিকেতনে ব্যাংক স্থাপন করেন। এক পত্রে কবি পতিসরের কৃষকদের অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য গ্রাম-অধ্যক্ষগণকে উপদেশ দিয়েছেন, 'প্রজাদের বাস্তু ক্ষেতের আইল প্রভৃতি স্থানে আনারস, কলা, খেজুর প্রভৃতি ফলের গাছ লাগাইবার জন্য তাহাদিগকে উৎসাহিত করিও। আনারসের পাতা হইতে খুব মজবুত সুতা বাহির হয়, ফলও বিক্রয়যোগ্য। শিমুল-আঙ্গুর গাছ বেড়া প্রভৃতির কাজে লাগাইয়া তাহার মূল হইতে কিরূপে খাদ্য বাহির করা যাইতে পারে তাহাও প্রজাদিগকে শিখানো আবশ্যক। আলুর চাষ প্রচলিত করিতে পারিলে বিশেষ লাভের হইবে। ...কাছারিতে যে আমেরিকান ভুট্টার বীজ আছে তাহা পুনর্বার লাগাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।' (*রবীন্দ্রজীবনী*, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৮)

রবীন্দ্রনাথ জানতেন রাজা বা জমিদার নানাভাবে প্রজাদের উৎপীড়ন করে। তাদের অধিকার খর্ব করে। সেজন্য তিনি বারে বারে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কৃষক তথা প্রজাদের সংগ্রাম করতে বলেছেন আত্মিক শক্তিতে শক্তিমান হতে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন, মানুষের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে অসীম ক্ষমতা। দুঃসময়ে মানুষ যখন চারদিকে অন্ধকার দেখতে পায়, কোথাও আশার নৌকা জীবননদীর জলে ভাসে না, তখনও রবীন্দ্রনাথ অন্তরের সুপ্ত শক্তিকে আঘাত করতে বলেছেন। এই আঘাতের ফলেই জেগে উঠবে সুপ্তোত্থিত চেতনা। তখন মানুষ নিজেই নিজের শক্তি দেখে অবাক হয়ে যাবে। তাই রবীন্দ্রনাথ বার বার মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির উদ্‌বোধনের কথা বলেছেন। পুঞ্জীভূত আত্মশক্তির সমাহারেই তৈরি হবে জীবন চলার আত্মপ্রত্যয়। (*'আত্মশক্তি'*, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড)

রবীন্দ্রনাথ অধিকার অর্জন করার জন্য আত্মশক্তির উদ্‌বোধন করতে বলেছেন। কৃষকদের অধিকারবোধে আলোকিত করার কথা বলেছেন। 'চাষিকে আত্মশক্তিতে দৃঢ় করে তুলতে হবে, এই ছিল আমার অভিপ্রায়। এ সম্বন্ধে দুটো কথা সর্বদাই আমার মনে আন্দোলিত হয়েছে জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, সে চাষির; দ্বিতীয়ত, সমবায়নীতি অনুসারে চাষের ক্ষেত্র একত্র করে চাষ না করতে পারলে কৃষির উন্নতি হতেই পারে না। মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আলবাঁধা টুকরো জমিতে ফসল ফলানো আর ফুটো কলসিতে জল আনা একই কথা। কিন্তু এ দুটো পন্থাই দুরূহ।

প্রথমত চাষিকে জমির স্বত্ব দিলেই সে স্বত্ব পরমুহূর্তেই মহাজনের হাতে গিয়ে পড়বে, তার দুঃখভার বাড়বে বৈ কমবে না।' (রাশিয়ার চিঠি, রবীন্দ্র রচনাবলী, দশম খণ্ড, পৃ. ৫৬২-৬৩)

মূলত তখনকার চাষিরা অজ্ঞ ছিল, নিরক্ষর ছিল, আধুনিক বৈজ্ঞানিক চাষাবাদ সম্পর্কে তাদের ধারণা ছিল না। তারা ছিল অতি সরল মনের। তাই জমি তাদের হলেও তা তাদের থাকবে না, মহাজনদের দ্বারা অপহৃত হবে। রবীন্দ্রনাথ এই সত্য অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই জমির অধিকার চাষিদের হাতে ছেড়ে দিতে বলেননি।

১৯০৯ সালের ডিসেম্বরে লেখা 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে কবি প্রজাদের অধিকার-চেতনা প্রকাশ করেছেন এভাবে

'প্রতাপাদিত্য। তুমি এই সমস্ত প্রজাদের খেপিয়েছ?

ধনঞ্জয়। খেপাই বই-কি! নিজে খেপি, ওদেরও খেপাই, এই তো আমার কাজ।

... ...

প্রতাপাদিত্য। দেখো বৈরাগী, তুমি অমন পাগলামি করে আমাকে ভোলাতে পারবে না। এখন কাজের কথা হোক। মাধবপুরের প্রায় দুবছনের খাজনা বাকি দেবে কিনা বলো।

ধনঞ্জয়। না মহারাজ, দেব না।

প্রতাপাদিত্য। দেবে না? এত বড়ো আস্পর্ধা!

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপাদিত্য। আমার নয়!

ধনঞ্জয়। আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী বলে?

প্রতাপাদিত্য। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়। হ্যাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তো বোঝে না পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমিই বলি, আরে আরে, এমন কাজ করতে নেই প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি। তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী করিস নে।'

(সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ ও মানবাধিকার*, পৃ. ১২৩)

তিনি দেখেছিলেন, আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলোতে গণতন্ত্রের নামে শাসন করছে পুঁজিবাদী বা ধনতন্ত্রবাদীরা। সেখানে ধনী ব্যক্তির হাতেই সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন অর্থনৈতিক অধিকার অর্জনে

এতদ্‌ঞ্চলের বিরাজমান ব্যবধান বা বৈষম্যকে কমিয়ে আনতে না পারলে কৃষক, শ্রমিক ও অসহায় মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন সম্ভব নয়।

মানবিক অধিকারবাদী রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন জমিদাররা গরিব চাষিকে শোষণ করে বড়লোক হয়। চাষিকে মানুষের মর্যাদা দেয় না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর অধীনস্থ এক কর্মচারীকে খাজনা ও কর আদায়ে দরিদ্র কৃষকদের প্রতি মানবিক হওয়ার পরামর্শ দিয়ে এক পত্রে লিখেছেন, 'প্রজাদের অবস্থা ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই তহশীল আদায় করা শ্রেয়। ...সর্বতোভাবে প্রজাদের সহিত ধর্মসম্বন্ধ রক্ষা করিয়া তাহাদের পূর্ণ বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে হইবে। আমরা যে সর্বপ্রকারের প্রজাদের হিত ইচ্ছা করি তোমাদের ব্যবহারে তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। তোমার অধীনস্ত মণ্ডলের অন্তর্গত পল্লীগুলোর যাহাতে সর্বপ্রকারে উন্নতিসাধন হয় প্রজাদিগকে সেজন্য সর্বদাই সচেষ্ট করিয়া দিবে। প্রজাদিগের প্রতি যেমন ন্যায় ধর্ম ও দায় রক্ষা করিবে তেমনি অধীনস্থ কর্মচারিদিগকে বিশেষভাবে কর্মের শাসনে সংযত করিয়া রাখিবে। ...' (আবুল আহসান চৌধুরী, *রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ*, পৃ. ৭৭-৭৮)

অপর এক পত্রে একজন দোষী প্রজার বিরুদ্ধে ম্যানেজার জানকীনাথ রায়ের শাস্তির প্রস্তাব বিষয়ে নমনীয় থাকার পরামর্শ দিয়ে কবি লিখেছেন, 'স্বার্থরক্ষার জন্য প্রবল ব্যক্তি স্বভাবত চাতুরী অবলম্বন করিয়া থাকে। সে স্থানে দুর্বল পক্ষের বেলায় চাতুরী দেখা গেলে আমরা যে রাগ করি সে চাতুরীর প্রতি রাগ নহে, দুর্বলের প্রতিই রাগ। কারণ এই দ্বারিক বিশ্বাসই চতুরতার দ্বারা আমাদের কোনো কাজ উদ্ধার করিলে প্রশংসা ও পুরস্কারের পাত্র হয়। এমন স্থলে নিজের স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে চাতুরী প্রয়োগ দেখিলে আমাদের রাগ করিবার কারণ নাই। আমার প্রজারা নিজের বৈষয়িক স্বার্থরক্ষার জন্য যখন চতুরতা করে আমার মনে তখন রাগ হয় না। তাহাদের বেদনা ও ব্যাকুলতা বুঝিবার আমি চেষ্টা করি। ...তোমরা যেটা কর্তব্য বোধ করিবে, তাহাই করিবে। কেবলমাত্র দণ্ড দিবার জন্য কিছুই করিবে না। দ্বারিক বিশ্বাস যদি প্রবল হইত তবে সে আমাকে দণ্ড দিবার চেষ্টা করিত। আমি দৈবক্রমে প্রবল হইয়াছি বলিয়াই যে ক্রোধ পরিতৃপ্তির জন্য তাহাকে দণ্ড দিব এবং সে তাহা অগত্যা বহন করিবে, এ আমি সংগত মনে করি না।' (ঐ, পৃ. ৭৮)

রবীন্দ্রনাথ যে আন্তরিকভাবেই চাইতেন চাষিরই জমির মালিক হওয়া উচিত তার প্রমাণ মেলে তাঁর লেখা দুটি চিঠি থেকে। আমেরিকা থেকে প্রতিমা দেবীকে তিনি লেখেন; '...বহুকাল থেকেই আশা করেছিলুম আমাদের জমিদারি যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারি হয় আমরা যেন ট্রাস্টির মতো থাকি।' আর একটি পত্রে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'যে রকম দিন আসচে তাতে জমিদারির উপরে কোনদিন আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জিনিসটার উপর অনেককাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল, এবার সেটা আরও পাকা হয়েচে। যেসব কথা বহুকাল ভেবেচি এবার

রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারির ব্যবসায় আমার লজ্জা বোধ হয়।' (সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ ও মানবাধিকার*, পৃ. ২২৭)

১৯২৬ সালে প্রমথ চৌধুরী'র 'রায়তের কথা' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমার জন্মগত পেশা জমিদারি, কিন্তু আমার স্বভাবগত পেশা আসমানদারি। এই কারণেই জমিদারির জমি আঁকড়ে থাকতে আমার অন্তরের প্রবৃত্তি নেই। এই জিনিসটার পরে আমার শ্রদ্ধার একান্ত অভাব। আমি জানি জমিদার জমির জোঁক, সে প্যারাসাইট, পরাশ্রিত জীব।' (প্রমথ চৌধুরী, *'রায়তের কথা'*, সবুজপত্র, পৃ. ১৩৩৩)

রবীন্দ্রনাথ কী রকম উদারতা ও দক্ষতা সহকারে জমিদারি পরিচালনা করেছেন সে সম্পর্কে Rajshahi District Gazzetter (1916)-G O. Malley I.C.S লিখেছেন 'It must not be imagined that a powerful landlord is always oppressive and uncharitable. A striking instance to the contrary is given in ths Settlment Officers' account of the Estate of Rabindranath Tagore, the Bengali poet whose fame is world-wide. It is clear that poetical genius he adds practical ideas of estate managment, which should be an example to the lord zemindars.' (আবুল আহসান চৌধুরী, *রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ*, পৃ. ৭৩)

রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন কেবল এক শ্রেণীর মানুষ অর্থনৈতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হলে বা শহরকেন্দ্রিক উন্নয়ন হলে দেশের উন্নতি হয় না প্রয়োজন দেশের সামগ্রিক উন্নতির। পল্লীবাসীরা অর্থনৈতিক অধিকার থেতে বঞ্চিত থাকলেও দেশের যথাযথ উন্নতি হয়েছে বলা যায় না। 'উপেক্ষিতা পল্লী' নামে এক দরদী ভাষণে কবি বলেছিলেন, 'বর্তমান সভ্যতায় দেখি এক জায়গায় একদল মানুষ উৎপাদনের চেষ্টায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর এক জায়গায় আর একদল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণ ধারণ করে।' (সন্তোষ কুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রনাথ ও মানবাধিকার*, পৃ. ২৪৮)

সমাজের একাংশকে নিচে ফেলে রেখে উন্নয়নের উচ্চ শিখরে যে আরোহণ করা যায় না সে কথাটি রবীন্দ্রনাথ বহুবার বহুভাবে বলেছেন। 'গীতাঞ্জলি'তে তিনি সাবধান করে দিয়েছেন যে যাকে আমরা নিচে ফেলি তারাই আমাদের বাঁধবে নিচে। যাদের আমরা অপমান করছি তারাই আমাদের করবে অপমান।

'যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে, আড়ালে ঢাকিছ যারে
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'
('গীতাঞ্জলি' ১০৮, *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ৬ষ্ঠ খ , পৃ. ৭৩)

প্রজাসাধারণের হিত সাধনই ছিল রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-জ্ঞান। সেজন্য তিনি জমিদারির আমলাতন্ত্রেও সংস্কার এনেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন মানুষের একত্রিত করে সমবায় গঠন করে গ্রামোন্নয়ন কর্মকাণ্ডে কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসবে। তাঁর এই 'সমবায়নীতি' বাস্তবায়নের জন্য তিনি জমিদারি এলাকাকে কয়েকটি মণ্ডলে ভাগ করেন। এটা অনেকটা প্রাচীন পঞ্চায়েতি প্রথার আদলে ছিল। তবে সাংগঠনিক আকার ছিল ছোট। মণ্ডলী প্রথা প্রবর্তনের পেছনে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের সমস্ত মানুষকে সংগঠিত করা যেন গ্রামের উন্নয়ন কাজে কোনো বাধা না থাকে। শিলাইদহে এই মণ্ডলী প্রথা প্রবর্তন ধনী কৃষক, জোতদার ও তাঁর নিজের জমিদারির আমলারা সুনজরে দেখেনি। বরঞ্চ নিজেদের ক্ষমতা কমে যাবে এই আশঙ্কায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। এমনকি মাত্রাতিরিক্ত বিরুদ্ধাচরণের কারণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর ম্যানেজারকে বরখাস্তও করেছিলেন। বাংলা ১৩১৫ সালে শিলাইদহে মণ্ডলী প্রথা চালু হয়। পুরাতন ৮টি ডিহি-কাছারি ভেঙে শিলাইদহ সদরসহ ৫টি মণ্ডলী করা হয়। এর ফলে জমিদার এবং প্রজার সম্পর্ক প্রত্যক্ষ হয়। সম্পর্কের উন্নতি হয়। আসলে রবীন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন জমিদারি প্রথা সংস্কার করে কৃষকদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

জমিদারির সংস্কার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লিখেছেন, 'এখন আমার কাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেছে। আমাদের জমিদারির মধ্যে একটা কাজ পত্তন করে এসেছি। বিরাহিমপুর পরগণাকে ৫টি মণ্ডলে ভাগ করে প্রত্যেক মণ্ডলে একজন অধ্যক্ষ বসিয়ে এসেছি; এই অধ্যক্ষরা সেখানে 'পল্লীসমাজ' স্থাপনে নিযুক্ত। যাতে গ্রামের লোক নিজেদের হিত সাধনে সচেষ্ট হয়ে ওঠে... পথ-ঘাট পরিষ্কার করে, জলকষ্ট দূর করে, সালিশের বিচারে বিবাদ নিষ্পত্তি করে, বিদ্যালয় স্থাপন করে, জঙ্গল পরিষ্কার করে, দুর্ভিক্ষের জন্য ধর্মগোলা গড়ে তোলে ইত্যাদি সর্বপ্রকারের গ্রাম্য সমাজের হিতে নিজের চেষ্টা নিয়োগ করতে উৎসাহিত হয়, তারই ব্যবস্থা করা গিয়েছে। আমার প্রজাদের মধ্যে যারা মুসলমান তাদের মধ্যে বেশ কাজ অগ্রসর হচ্ছে কিন্তু হিন্দু পল্লীতে বাধার অন্ত নেই।' (রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ২২৬)

রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছেন, জমিদাররা সামন্তপ্রথার ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরে দরিদ্র প্রজাসাধারণকে শোষণের মাধ্যমে আয় বাড়ানোকেই নিজ কর্তব্য মনে করে। তারা খাজনা ও শুল্ক-কর আদায়, উচ্চ সুদের ঋণ ইত্যাদি সূত্র ধরে কৃষকদের উদ্বৃত্ত ফসল লোপাট করে। তাই কৃষকের অবস্থা ছিল বড়ই করুণ। এ প্রসঙ্গে ব্যারিংটন মুর বলেছেন, "The agrarian system introduced by the British formed the basis of a political and economic system is which the foreigner, landlord and the-money-lender took the economic surplus away from the peasantry". (Suniti Kumar Ghosh—'India and The Raj')

তবে রবীন্দ্রনাথ কর বৃদ্ধি করলেও সেই সঙ্গে প্রজাদের কল্যাণে পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাঁর সেরেস্তার আমলাদের কর্তৃত্ব ও শোষণ কমাতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সেজন্য জমিদার হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রজাদের কাছে অনন্য এক প্রজাহিতৈষী ব্যক্তিত্ব। পরিণত হয়েছিলেন প্রজাসাধারণের অভিভাবকে। যে কারণে অন্য জমিদারদের ক্ষেত্রে কৃষক বিদ্রোহ দেখা দিলেও রবীন্দ্রনাথের সময়ে এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রজাসাধারণের ন্যায়বিচার পাবার অধিকার নিয়েও ভেবেছেন। তিনি বিরাহিমপুর (শিলাইদহ) ও কালীগ্রাম (পতিসর), এই দুই পরগণায় কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি করে বিচারসভা স্থাপন করেন। প্রজাদের পরস্পরের মধ্যে কোনো বিবাদ দেখা দিলে তা নিয়ে উভয়পক্ষই এই বিচারসভায় আসত। কেবল ফৌজদারি ছাড়া অন্য কোনো রকম মামলা নিয়ে কৃষকরা আদালতে যেত না। এমনকি বিচারসভায় বিচারে অসন্তুষ্ট হলে আপিলের বিধান করা হয়। প্রজাদের সম্মতিক্রমে সমস্ত পরগনার জন্য পাঁচজন সভ্য নিয়ে একটি আপিলসভা নির্বাচন করা হয়েছিল।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছি। কৃষকের সন্তানরাই দেশের জন্য রক্ত দিয়েছে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের প্রচষ্টো এখনও অব্যাহত রয়েছে। তাই অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সবার আগে প্রয়োজন সবচাইতে বঞ্চিত অবহেলিত কৃষকসমাজের অধিকার নিশ্চিত করা। তাঁদের সম্মান দেয়া। কেননা কৃষকের ঘামঝরা উৎপাদন আমাদের জাতীয় উন্নতির ভিত্তি। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের প্রধান নিয়ামক। তাই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বাধীনতা আমাদের বড় বেশি প্রয়োজন। প্রয়োজন আগের সব অর্জনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'সমাজের সচেষ্ট স্বাধীনতা অন্য সকল স্বাধীনতা হইতেই বড়ো।' (রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খ , পৃ. ৬২৪)

বর্তমান সময়ে দেশে যে কল্যাণধর্মী ও কৃষিবান্ধব উন্নয়ন নীতি কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে তা রবীন্দ্র-চেতনারই প্রতিফলন। কৃষকের অধিকার নিশ্চিত করা, দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় তাঁদের অধিকতর সম্পৃক্ত করা এখন সময়ের দাবি। দেশের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির সঙ্গে জড়িত। সে দিকে খেয়াল রেখেই বর্তমানে অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে যাতে সুবিধাবঞ্চিত দেশের এই সম্ভাবনাময় জনশক্তিকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা যায়। আধুনিক প্রযুক্তির যে আকাশছোঁয়া অগ্রগতি হয়েছে তার সুফল কী করে কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছানো যায় সেই ভাবনাও চলছে। কৃষকদের ভূমি অধিকার, ঋণপ্রাপ্তির অধিকার, উৎপাদনের ন্যায্যমূল্য পাবার অধিকার, স্বাস্থ্যসেবা ও সন্তানদের শিক্ষা পাবার অধিকার নিশ্চিতকরণের প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ইতোমধ্যে বর্গাচাষি ও প্রান্তিক কৃষকদের ঋণসেবাসহ আধুনিক ব্যাংকিং সেবা পৌঁছানোর উদ্যোগ নিয়েছে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক। কৃষকের অধিকারকে অগ্রাধিকার দিয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে যুগোপযোগী কৃষিনীতিমালা।

জাতীয় বাজেট ও কৃষক খামারিদের চাহিদা

....

শা ই খ সি রা জ

অত্যন্ত আশার কথা, দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে এখন বাজেটের কৃষিখাত আলোচ্য হয়ে উঠেছে। বাজেট নিয়ে কখনো ভাবতে হবে, কিংবা জাতীয় বাজেটের সঙ্গে তার অধিকার, মতামত ও সংশ্লিষ্টতার গুরুত্ব রয়েছে এটি কৃষক কোনোদিনই চিন্তা করেননি। যুগ যুগ ধরে তার মনে বদ্ধমূল হয়েছে সব বিষয়ে মাথা ঘামানোর কাজ তার নয়। পেশাগত ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই সে কৃষিকাজ করছে। বংশপরম্পরায় কৃষি কৃষকের কাছে থেকে গেছে একেবারে নিজস্ব বিষয়। এর সঙ্গে রাষ্ট্রের যে সংশ্লিষ্টতা, দেশের মানুষের খাদ্যচাহিদা পূরণের যে প্রশ্ন জড়িত, তা বুঝতে কৃষকের পার হয়ে গেছে বহুদিন। কিন্তু সে অবস্থার আজ অনেকখানিই পরিবর্তন হয়েছে। কৃষক এখন মুখ ফুটে বলতে শিখেছে। সে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারে, সমস্যার কথাটি আর চেপে রাখার সুযোগ নেই। রাষ্ট্রে তার যে অবস্থান, রাষ্ট্রের সঙ্গে তার যে লেনদেনের সম্পর্ক সেটি অনেকটাই বোধগম্য কৃষকের কাছে। তাই সে জড়তাহীনভাবে কথা বলে, সে এখন সরকারের কাছ থেকে পাওয়া না-পাওয়ার হিসাবটি চুলচেরা বিশ্লেষণ করতে শিখেছে। এই নিয়ে অষ্টমবারের মতো 'কৃষি বাজেট কৃষকের বাজেট' শীর্ষক জাতীয় বাজেটের কৃষিখাত বিষয়ক প্রাক-বাজেট আলোচনা, কৃষকের চাহিদা ও প্রাপ্তির হিসাব বিশ্লেষণ ও সরকারের কাছে সুপারিশমালা প্রদান করার সুযোগ ঘটেছে। কার্যক্রমটি একেবারেই ভিন্নতর ও কৃষিকেন্দ্রিক হওয়ার কারণে কৃষক এখানে থাকেন সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাবান। প্রচলিত অর্থে সমাবেশ, জনসভা, সেমিনার যেভাবে হয়, যেখানে কিছু বিশেষায়িত মানুষ কথা বলেন, আর দর্শক বা সাধারণ জনগণ সে কথা ভালো হোক মন্দ হোক, পক্ষে যাক না যাক– কান ফেলে নীরবে শোনে। 'কৃষি বাজেট কৃষকের বাজেট' ঠিক তার বিপরীত। কথা বলেন কৃষক আর নীতিনির্ধারক, মন্ত্রী, জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি সবাই শোনেন। তৃণমূল পর্যায়ে গণতন্ত্র চর্চার এই রেওয়াজটি না থাকার কারণে, তৃণমূল মানুষের ক্ষমতায়ন হয়নি, স্থানীয় জনপ্রশাসন ও জনপ্রতিনিদের জবাবদিহিতাও থেকে গেছে দূরে।

২০০৫ থেকে ২০১২– 'কৃষি বাজেট কৃষকের বাজেট' কার্যক্রমের আট বছর। এই সময়ের মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অনেক পট পরিবর্তন হয়েছে। আট বছরে দেশের ত্রিশটি স্থানে অন্তত সত্তর হাজার কৃষক প্রাক-বাজেট আলোচনায় সরাসরি তাদের মতামত ব্যক্ত করেছেন। দেশের প্রায় দু'কোটি কৃষক পরিবারের মধ্যে সত্তর

হাজার নগণ্য একটি সংখ্যা হলেও এর ব্যাপ্তি কোনোভাবেই কম নয়। কারণ, কৃষকের এই আলোচনা টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছে। আট বছরে ত্রিশটি কার্যক্রম কমপক্ষে ১৫ ঘণ্টা, যা একাধিকবার করে প্রচারিত ও পুনঃপ্রচারিত হয়েছে। বিষয়গুলো নিয়ে পত্র-পত্রিকা, রেডিও ও অন্যান্য টেলিভিশনও কমবেশি কাজ করেছে। সমাজের সকল স্তরে খুব ভালোভাবেই পৌছে গেছে। সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক ও উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে বর্তমান সরকারের অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আবদুল মুহিত পর পর তিন বছর কৃষকের প্রাক-বাজেট আলোচনায় উপস্থিত হয়ে, কৃষকের কথা শুনেছেন, বাজেটের কৃষিখাতের অনেক অজানা ও অনুল্লেখিত বিষয় নিয়ে বিশ্লেষণের প্রয়াস পেয়েছেন। যা তার বিগত দুই বছরের বাজেট বক্তৃতার মধ্যে তিনি উল্লেখ করেছেন। একইভাবে কৃষকের আলোচনায় সম্পৃক্ত হয়ে সরকারের কৃষি ও খাদ্য পরিকল্পনা, কৃষকের চাহিদার গুরুত্ব ইত্যাদি কয়েক বছর সম্যকভাবে উপলব্ধি করেছেন খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রী কৃষিবিদ ড. আব্দুর রাজ্জাক, শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া ও বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী আব্দুল লতিফ সিদ্দিকী। এর গত বছর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী আব্দুল লতিফ বিশ্বাসও উপস্থিত হয়েছিলেন একটি আলোচনায়। এবার একটি আলোচনায় প্রধান তথ্য কমিশনার মোহাম্মদ জমির, বিশিষ্ট সাংবাদিক কলামিস্ট সৈয়দ আবুল মকসুদও উপস্থিত হয়েছিলেন। রাতে, খোলা আকাশের নিচে, কৃষকের সমাবেশে, অনাড়ম্বর আলোচনায় যোগ দিয়ে সরকারের মন্ত্রীসহ মান্যগণ্য মানুষগুলো কৃষিপ্রধান বাংলাদেশের ঠিক বর্তমান চিত্রটি একনজরে হাতে পেয়েছেন। কৃষির যে তথ্যগুলো শুধু কাগজপত্রে সংখ্যা পরিবর্তনের মধ্যেই বছরের পর বছর সীমাবদ্ধ থেকেছে তা যেন নিমিষেই আলগা হয়ে গেছে তাদের সামনে।

দুই.

২০০৬ সাল থেকে কৃষকের দাবি, চাহিদা ও প্রস্তাবনাগুলো মাঠ পর্যায় থেকে তুলে এনে একটি সুপারিশমালা তৈরি করে প্রদান করা হচ্ছে সরকারের কাছে। এখানে উল্লেখ করতেই হয় যে, 'কৃষিক্ষেত্রে করণীয়' শীর্ষক ওই সুপারিশমালা কোনো সংখ্যাতাত্ত্বিক হিসাবের আলোকে তৈরি করা হয় না, উল্লেখ করা হয় না, কোথায় কত টাকার বরাদ্দ প্রয়োজন। সরকার-প্রণীত বাজেটের রূপরেখার কোনো নির্দেশনা থাকেনা তাতে, বরং থাকে একটি বাস্তব চিত্র। যা সরকারের বাজেট প্রণয়নে সহায়ক হতে পারে, সরকারের বরাদ্দ ও বিতরণ ব্যবস্থার মধ্যে কৃষকের উত্থাপিত প্রস্তাবনাগুলো যেন গুরুত্ব পেতে পারে। সরকারযন্ত্রের অর্থনৈতিক বিচার- বিবেচনার একটি নির্দিষ্ট ধারা আছে। আছে প্রচলিত কিছু নিয়ম। সেখানে রয়েছে অনেকগুলি খাত সামলানোর চাপ। কৃষি, খাদ্য, শিল্প, শিক্ষা, নিরাপত্তা, স্থানীয় সরকার যে খাতের কথাই বলা হোক না কেন, কারোর গুরুত্বই কম নয়। কিন্তু এর ভেতরেও গুরুত্বের অগ্রাধিকারের প্রশ্ন রয়েছে। একটি খাতের সঙ্গে আরেকটি খাতের নির্ভরশীলতার সম্পর্ক রয়েছে। সে দিক থেকে কৃষির

গুরুত্বই যে সর্বাগ্রে, এটি বলাই বাহুল্য। সোজা হিসাবে মানুষের বেঁচে থাকার খাদ্য, পুষ্টি সবকিছুতেই কৃষিই মুখ্য। আজকের জামানায় বাইরে থেকে খাদ্য আমদানি করে দেশের মানুষকে বাঁচিয়ে রাখার আর সুযোগ নেই। একদিকে নেই রাষ্ট্রের সে সাধ্য, অন্যদিকে সাধ্য থাকলেও অন্য কোনো দেশ খাদ্য রপ্তানিতে আর সাহস করে উঠছে না। নিজেদের জনসংখ্যর খাদ্যচাহিদা মেটানোর ভাবনা সবাই ভাবছেন। তার ওপরে জলবায়ুর পরিবর্তনসহ কৃষির নানামুখি চ্যালেঞ্জের মধ্যে ক্রমহ্রাসমান আবাদি জমিতে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করাই সরকারের সামনে এখন বড় চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার স্বার্থে সরকারের কাছে কৃষকদের বেশকিছু দাবি-দাওয়া চাহিদা গত সাত বছর ধরে তুলে ধরা হচ্ছে। ইতোমধ্যে, এর বেশ কিছু প্রস্তাবনার প্রতি সরকার দৃষ্টি দিয়েছেন। তার মধ্যে শুরুতেই উল্লেখ করা যায়, কৃষি গবেষণায় সরকারের দৃষ্টিপাতের কথা। এদেশে কৃষিগবেষণা বরাবরই ছিল অনেকটাই দাতাগোষ্ঠি, আন্তর্জাতিক গবেষণা ইনস্টিটিউটগুলোর ওপর নির্ভরশীল। সরকার কয়েক বছর আগে কৃষি- গবেষণায় সাড়ে ৩'শ কোটি টাকার একটি এনডাওমেন্ট তহবিল বরাদ্দ করেছে। যে তহবিলের লভ্যাংশ ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু আজকের প্রেক্ষাপট যদি বলি, কৃষিগবেষণায় আলাদা করে বরাদ্দসহ বিশেষ দৃষ্টিপাতের কে-নো বিকল্প নেই।

সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রেই কৃষকদের প্রত্যাশা, আর্থসামাজিক প্রয়োজন, খাদ্য ও বাণিজ্যিক চাহিদার কথা মাথায় রেখে কৃষির অনেক ক্ষেত্রেই অনুকূল দৃষ্টিপাত করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিফলন হিসেবে উল্লেখ করা যায়, কৃষকের জন্য উপকরণ সহায়তা কার্ড প্রবর্তন, জাতীয় কৃষি দিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ, শস্যবীমা বিষয়টি সরকারের আমলে এসেছে। এ নিয়ে ইতোমধ্যে পাইলট প্রকল্প কাজ করছে, কৃষিঋণ সহজীকরণ, ঋণের পরিধি বাড়ানো ও বর্গাচাষিদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তিন-ফসলি জমি রক্ষায় সরকার নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অঞ্চলভিত্তিক কৃষির উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে, তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করতে তামাকজাত পণ্যে শুল্ক বৃদ্ধি করা হয়েছে, মৌচাষকে বাংলাদেশ ব্যাংকের ঋণকাঠামোর আওতায় আনা হয়েছে, বেসরকারি পর্যায়ে কারিগরি শিক্ষা কার্যক্রমে মৎস্য বিজ্ঞানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, পোল্ট্রি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অভ্যন্তরীণ সমস্যা ও সংকটের চিত্রগুলো বারংবার উচ্চারিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বিষয়গুলো সরকারের দৃষ্টিতে আসার অবকাশ ও সুযোগ তৈরি হয়েছে।

উল্লেখিত বিষয়গুলোতে সরকার পদক্ষেপ নেয়ায় কৃষকের বাজেট ভাবনার যথেষ্টই মূল্যায়ন হয়েছে বলে আমি মনে করি।

তিন.

এ বছর মাননীয় অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের মাধ্যমে ৫৫ দফা সুপারিশমালা প্রদান করা হয়েছে সরকারের কাছে, আসন্ন জাতীয় বাজেটে বিষয়গুলোর দিকে

সরকারের দৃষ্টি পড়বে এই আশায়। সুপারিশমালার মধ্যে কৃষির জন্য ১৮ দফা, পোল্ট্রি খাতের জন্য ১৪ দফা, মৎস্য খাতের জন্য ১২ দফা ও প্রাণীসম্পদ ও দুগ্ধশিল্পের জন্য রয়েছে ১১ দফা। দাবিগুলো কৃষক কিংবা খামারি তাদের মতো করেই তুলে ধরে। কোনো কোনো দাবি দেশের সকল কৃষকের চিন্তা ও প্রত্যাশার সঙ্গে নিবিড়ভাবেই মিলে যায়। যেমন ধরা যাক, কৃষিউপকরণের মূল্য ক্রয়সাধ্যের মধ্যে আনা প্রসঙ্গ। বরাবরই কৃষক এই দাবিটি করছে। কিন্তু আজকের দিকে এটি কঠিন দাবিতে পরিণত হওয়ার কারণ হচ্ছে, কৃষক তার পণ্যের মূল্য পাচ্ছে না। যে ব্যয় করে সে ফসল উৎপাদন করছে, বাজারমূল্যের সঙ্গে তা মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। একের পর এক ফসলি মৌসুমগুলো কৃষককে শুধু হতাশই করে চলেছে। দেশে ধানের আবাদ বাড়ছে, কিন্তু একই সঙ্গে কৃষকের হতাশা চরমভাবে বাড়ছে। কারণ, বিগত বোরো, আমন ও চলতি বোরো মৌসুমের একই অবস্থা। নিত্যপ্রয়োজনীয় কোনো পণ্যমূল্যের সঙ্গেই কৃষকের উৎপাদিত ধানের মূল্যের সামঞ্জস্য নেই। দেশের বেশিরভাগ এলাকায় এবার বোরো মৌসুমের ধান কাটা শুরু হওয়ার পর পরই বাজারমূল্য ৩'শ টাকা পর্যন্ত নেমে যায়। দেশের হাওর অঞ্চলগুলোতে এখনও ধান বিক্রি হচ্ছে ৩ 'শ থেকে ৪'শ টাকার মধ্যে। অথচ ১ মণ ধান উৎপাদনে কৃষকের ব্যয় হয়েছে কমপক্ষে ৬'শ ৮০ থেকে ৭'শ টাকা। একজন বর্গাচাষির জন্য এই ব্যয় সাড়ে ৭'শ টাকা ছাড়িয়ে গেছে। সরকারি ক্রয়ে ধানের মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে ৭'শ ২০ টাকা। এটি যেমন এ মৌসুমের আজকের চিত্র, বছরজুড়েই এই বঞ্চনার শিকার হয়েছেন কৃষক। এই সমস্যাটি জাতীয় বাজেটে বরাদ্দের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত কোনো বিষয় নয়, কিন্তু বাজেটের কৃষিখাতকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করার মতো বিষয়। কৃষিখাতের দিকে সরকার দৃষ্টি দিচ্ছে, কৃষকের উপকারার্থে ভর্তুকি দিচ্ছে কিন্তু কৃষক যদি মৌসুমের পর মৌসুম তার উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হতেই থাকে, তাহলে কৃষকের ভাগ্যেই কী জুটবে আবার আমাদের খাদ্য নিরাপত্তার চিন্তাটিতেই-বা কতখানি সাফল্য অর্জন করা যাবে ? সবই প্রশ্নসাপেক্ষ।

এবার 'কৃষি বাজেট কৃষকের বাজেট'-এ কৃষকের মুখ থেকেই একটি সমাধান বের হয়ে এসেছে। কৃষক বলছে, আমাদের ভর্তুকি দরকার নেই, '১০ শতাংশ লাভে কৃষিপণ্য বিক্রির নিশ্চয়তা দিলেই যথেষ্ট। আমরা আর কিছু চাই না।' কৃষক উপায় না-খুঁজে পেয়ে তার আবেগ থেকে এমন একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছে। মানিকগঞ্জের এক কৃষকের মুখ থেকে এই প্রস্তাব উঠে আসার পর সেখানে উপস্থিত প্রায় তিন হাজার কৃষক তার কথার সমর্থন করেছে। কৃষকের অবস্থা এখন এই পর্যায়ে ঠেকেছে। বাণিজ্যিক কৃষির যুগে এসে তারা চায় সামান্যতম লাভ, যার মধ্য দিয়ে সে টিকে থাকতে পারবে। কৃষকের এই সামান্য লাভ নিশ্চিত করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে বাজেটের কৃষিখাত নির্ধারণের সকল বিষয়। এক. উপকরণের মূল্য কমানো, ইউরিয়া ও ডিজেলের দাম কমানোর সঙ্গে সঙ্গেই সেচ-এ পরিপূর্ণ বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান, সুলভে সুস্থ

বীজের নিশ্চয়তা, উন্নত প্রযুক্তি ও যান্ত্রিক সুবিধা দেয়া, উদ্যোক্তা কৃষক ও হতদরিদ্র কৃষক এই দুই শ্রেণির কৃষকের মাঝে সহজ শর্তে ঋণের ব্যবস্থা, মধ্যস্বত্বভোগীর হাত কমিয়ে সুষ্ঠু ও নিরাপদ কৃষিবান্ধব বাজারব্যবস্থা নিশ্চিত করা। এই দাবিগুলো পৃথক পৃথকভাবে অনেক জায়গা দখল করলেও এর গোড়া একই জায়গায়। তা হচ্ছে উপকরণের ন্যায্যমূল্য ও উৎপাদিত পণ্যের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করা। বাকি বিষয়গুলো সরকারের সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও দিকনির্দেশনার বিষয়। যেমন বীজের প্রশ্নে বিএডিসিকে আরো কার্যকর করা, কৃষিসম্প্রসারণ ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো, কৃষিবিভাগের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ এবং কৃষিসংশ্লিষ্ট সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে গতিশীল, অর্থবহ, কৃষকের অংশগ্রহণমূলক করে তোলা ইত্যাদি। আশা করছি, আসন্ন বাজেটে সরকার এ বিষয়গুলোর সুস্পষ্ট বিন্যাস ও কার্যকর নির্দেশনা তুলে ধরবে, যার মধ্য দিয়ে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাগুলোও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

একইভাবে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও বিপর্যস্ত খাত হিসেবে পোল্ট্রি সেক্টর নিয়েও দাবি খুব বেশি নয়। শুধু খামারিদেরকে টিকে থাকার সুযোগ সৃষ্টি করা। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিপর্যয় থেকে এই শিল্পকে রক্ষার উদ্যোগ নেয়া। আর এই দুই দাবির মধ্যেই রয়েছে কোনো নীতিমালা না-মেনে এক দিনের বাচ্চার দাম দ্বিগুণ বৃদ্ধি করা, পোল্ট্রিখাদ্যের দাম বৃদ্ধি, বিদেশ থেকে ডিম আমদানি, বার্ড ফ্লু প্রতিরোধে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যর্থতার মতো বিষয়। এর পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ট্রিখামারিরা যাতে আবারো তাদের খামার গুছিয়ে নিতে পারে সেই ব্যবস্থাটি করা। সাধারণত দেখা যায়, জাতীয় বাজেটে এসব বিষয়ে সরকারের সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও বরাদ্দের বিষয়টি উল্লেখ থাকে না। এবার পোল্ট্রিশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা চান সরকারের সরকারের বাস্তবমুখি সুদৃষ্টি।

মৎস্যখাতের জন্য দাবি মূলত একটি। তা হল মৎস্যচাষকে কৃষিখাত হিসেবে গণ্য করা। প্রায় আট বছর ধরেই দেশের মৎস্যচাষিরা (যারা মোট মাছের চাহিদার অর্ধেকেরও বেশির যোগানদার) দাবি জানিয়ে আসছেন। এর মধ্যেই রয়েছে চাষিদের ওপর আরোপিত বাণিজ্যিক ভূমিকর, বিদ্যুৎ বিল, ৫ শতাংশ আয়কর প্রত্যাহারের দাবি। রয়েছে ঋণসহ অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে কৃষি সমসুযোগের প্রস্তাব।

প্রাণীসম্পদ ও দুগ্ধশিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের দাবিটিও একই রকম। দুগ্ধ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য একটি সুষ্ঠু অবকাঠামো সৃষ্টির জন্য দুগ্ধ খামারিরা দীর্ঘদিন ধরেই দাবি জানিয়ে আসছে।

চার.

আগেই বলেছি আগের চেয়ে অনেক সচেতন কৃষক ও খামারি। তারা নিজেদের ভালোমন্দের সঙ্গেই দেশের ভালোমন্দের নির্ভরতা বোঝেন। আজকের দিনে কৃষির চ্যালেঞ্জগুলো তাদের কাছে খুবই পরিষ্কার। বাজেটে কৃষিক্ষেত্রে বাস্তবমুখি

পদক্ষেপগুলোর দিকেই চেয়ে আছে তারা। ভর্তুকি শব্দটি অনেক লোভনীয় ও মজাদার হলেও সচেতন কৃষকরা খুব ভালো করেই বোঝেন ভর্তুকি কোনো কিছুরই চূড়ান্ত সমাধান নয় বরং কৃষি ও এর সংশ্লিষ্ট সকল উৎপাদন খাতগুলোর জন্য প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা ও সময়ের চাহিদা অনুযায়ী গতিশীলতা। সে বিষয়গুলো সার্বিকভাবেই এবার বাজেটে প্রতিফলন ঘটবে, সারাদেশের কৃষকের সঙ্গে সঙ্গে এই আশাবাদ আমারও।

না রী / প্র ব ন্ধ

জাতীয় আয় এবং নারীর অবদান: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

....

হো মা য় রা আ হ মে দ

পৃথিবীর প্রতিটি দেশে উন্নয়নের অন্যতম প্রধান মাপকাঠি হল সে দেশের জাতীয় আয় বা এউচ (Gross Domestic Product)। এর মাধ্যমে একটি দেশের মোট উৎপাদন তথা মোট আয়ের হিসাব সন্নিবিষ্ট হয়, যা তার অর্থনৈতিক অগ্রগতির ধরন ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা প্রদান করে। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে এর ব্যতিক্রম নয়। বর্তমানে এদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক হল নারী, যদিও মাত্র কয়েক বছর আগে পুরুষরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিগত বছরগুলোতে চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতি এবং স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা - সেবায় নারীর প্রবেশ বৃদ্ধি পাওয়াতে নারী শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ফলশ্রুতিতে নারী ও পুরুষের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা (Life Expectancy) প্রায় সমান হয়ে গিয়েছে এবং মোট জনসংখ্যায়ও তাদের ভাগ সমান হয়ে গিয়েছে। অথচ অর্থনীতির মূল খাতে নারীর অংশগ্রহণ বিগত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেলেও দক্ষিণ এশিয়ার প্রাচ্য সমাজব্যবস্থার পুরুষতান্ত্রিকতার কারণে তাদের অবদানের যথাযথ মূল্যায়ন হয়নি। আশির দশকের পর থেকে তৈরি পোশাক খাতের যুগান্তকারী অবদান ছাড়াও শ্রমশক্তি

জরিপের তথ্য অনুযায়ী গত ১০ বছরে এমনকি সনাতনী কৃষিক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। উৎপাদনশীল পরিমণ্ডলের সিংহভাগ ক্ষেত্রে নারীকে কেবল অনুৎপাদনশীল ও ভোগকারী হিসেবে চিহ্নিত করা, তাদের দৃশ্যমান কাজকে যথাযথভাবে জাতীয় পরিসংখ্যানে অন্তর্ভুক্ত না-করা, নারীর গৃহস্থালি কাজকে (Household Work) অর্থনৈতিক কাজ (Economic Work or Market Labour) হিসেবে গণ্য না-করা এবং কর্মস্থলে ও গৃহস্থালির কাজে নারীর সমন্বিত অংশগ্রহণকে পরিমাপযোগ্য এককে আনার সঠিক পরিসংখ্যান পদ্ধতির অবদান থাকার কারণে জাতীয় আয়ে দৃশ্যত নারীর অবদান
অত্যন্ত নগণ্য (সুলতানা ১৪০৭ এবং আহ্‌মেদ ২০০৭)।

গৃহকর্মকে (ঐড়সব গধশরহম) অর্থনৈতিকভাবে স্বীকৃতি প্রদানের পরিসংখ্যানগত সর্বজনস্বীকৃত পদ্ধতির অভাবে দেশের ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়স্ক কর্মক্ষম নারী জনসংখ্যার প্রায় ৭০ শতাংশ রয়ে যান রাষ্ট্রীয় মোট শ্রমশক্তির বাইরে। ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের System of National Accounting (SNA) সংশোধন করে পারিবারিক ভোগের জন্য উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বর্তমানে ৮২টি দেশে গৃহস্থালি কাজে ব্যয়িত সময়ের জরিপ পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশে এ ব্যাপারে এখনও কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হয়নি। আমাদের অর্থনীতিবিদরা মনে করেন গৃহস্থালির ভেতরে ও বাইরে নারীর কর্মকাণ্ডের যথার্থ অর্থনৈতিক মূল্যায়ন হলে জিডিপিতে নারীর অবদান অন্তত দ্বিগুণ হবে (হামীদ ১৯৮৯)। ঘরের বাইরে নারীরা যে সব কাজ মজুরিবিহীনভাবে করে থাকেন তার হিসাব যেমন গ্রহণ করা হয় না, তেমনি উপার্জনকারী ক্ষেত্র উপযুক্ততা থাকা সত্ত্বেও প্রায়ই নারীকে নিয়োজিত করা হয় নগণ্য উৎপাদনশীল খাতে– এ তথ্যটিও উঠে আসে না। আবার কর্মজীবী নারীরা গৃহিণী হিসাবে তাদের দায়িত্ব এড়াতে পারেন না বলে গৃহ হতে দূরবর্তী এলাকায় উচ্চ উৎপাদনশীল কাজে, এমনকি অতিরিক্ত মজুরি ও পদোন্নতির সুযোগ থাকলেও যেতে সীমাবদ্ধতা অনুভব করেন। ফলে নারীরা তাদের প্রকৃত উৎপাদনশীলতা হারিয়ে জাতীয় আয়ে যোগ্যতা অনুযায়ী অবদান রাখতে ব্যর্থ হন।

একজন কর্মজীবী নারীর গৃহিণী হিসেবে অবদানকে পূর্ণকালীন গৃহবধূদের (Full-Time Home-Maker) সঙ্গে তুলনা করে ঘরে তাঁকে কম উৎপাদনশীল বলে চিহ্নিত করার সামাজিক প্রবণতাও তাঁর উৎপাদনশীলতাকে বিঘ্নিত করে। অথচ গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে কর্মস্থলে সময়ের সমন্বয় করবার জন্যে একজন অচাকরিজীবী নারীর চাইতে গৃহের কাজে পরিমাণে কম হলেও গুণগতমানে অনেক বেশি উৎকৃষ্ট সময় দেবার কারণে বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর চাইতে বেশি উৎপাদনশীল হয়ে থাকেন (Paul-Majumder 1986)।

নারীর উপার্জনের প্রান্তিক উপযোগিতা (Marginal Utility) স্বতঃসিদ্ধভাবেই কম বলে ধরে নেওয়ার বিষয়টিও পরিসংখ্যানে উঠে আসে না, যেহেতু বিদ্যমান সমাজব্যবস্থা পুরুষকে গৃহের কর্তা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং পরিবারের প্রধান ভরণপোষণকারী হিসেবে মেনে নেয়, তাই তার উপার্জনই পরিবারে প্রাধান্য পায় এবং পরিসংখ্যানভুক্ত হয়। ফলে গৃহ ও কর্মস্থল– উভয় ক্ষেত্রেই লিঙ্গ–বৈষম্যের (Gender Disparity) শিকার নারীর প্রকৃত উৎপাদনশীলতা এবং স্বীকৃত উৎপাদনশীলতা জাতীয় পরিসংখ্যানে রয়ে যায় অবমূল্যায়িত (আহ্‌মেদ ২০১২)।

অথচ সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে উৎপাদনশীল খাতে ছিল নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ। শিকার ও সংগ্রহ সমাজে (Hunting and Gathering Societies) শিকারে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণের পাশাপাশি নারীই সিংহভাগ খাদ্য আহরণ করত। কুকুর ও গবাদিপশু পোষ মানানো এবং কৃষিকাজের আবিষ্কারক নারীই (উন্নয়ন পদক্ষেপ, ১৯৯৯)। আবার উদ্যান সমাজের (Horticulture Societies) অর্ধেকেরও বেশি উদ্যানের উৎপাদন এককভাবে নারীর অধীন এবং প্রায় এক-তৃতীয়াংশ যৌথভাবে নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণে ছিল। কৃষিভিত্তিক সমাজে (Agricultural Societies) শস্য কেনা, তোলা ও সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সেচ ও জুমচাষ পদ্ধতির উদ্ভাবন, এবং ধান, যব, ভুট্টা, বালি, জই, মিলেট, রাই, শরগম– এ ৮টি প্রধান শস্যদানার উৎপাদনের আবিষ্কারক নারী।

প্রাক-শিল্পায়িত সমাজে (Pre-Industrial Societies) নারী কুটিরশিল্পের বিকাশ ও উৎপাদিত সামগ্রীর বিপণন ও বাজারজাতকরণের পাশাপাশি পরিবারের ব্যবহার্য পোশাক ও তৈজসপত্র তৈরির মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থার (Production Relation) গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে পারিবারিক আয়ের সম্পূরক উৎস হিসেবে কাজ করত (Complementary Source of Family Income)। শিল্পায়িত সমাজের (Industrial Societies) সূচনা করেছে যে শিল্প বিপ্লবের (Industrial Revolution) মাধ্যমে, তার অন্যতম প্রধান নিয়ামক ছিল নারীর সস্তা শ্রমের (Cheap Labour) মাধ্যমে সৃষ্ট উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus Value)।

শিল্পায়ন বৃদ্ধির সাথে সাথে বিভিন্ন শিল্প-কারখানায় নারীর অংশগ্রহণ ঘরে ও বাইরে নারীর দ্বৈত শ্রম (Dual Labour) তার উৎপাদনশীলতা এবং প্রকৃত কর্মঘণ্টা (Real Working Hours) কার্যত দ্বিগুণ করে দেয়। কিন্তু একই সাথে এ দ্বৈতশ্রম পরিসংখ্যানভুক্ত না-হবার কারণে তখন থেকেই নারীকে উভয় ক্ষেত্রেই কাগজেকলমে পুরুষের তুলনায় কম উৎপাদনশীল (Less Productive) হিসেবে দেখানোর প্রবণতা শুরু হয়। এ প্রবণতার জন্য দায়ী হল নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্রের ভিন্নতা নিয়ে বিদ্যামান একটি আপেক্ষিক ধারণা (Subjecjtive Concept) যা সূচিত হয়েছে নারী ও পুরুষের শারীরবৃত্তীয় পার্থক্য (Physiological Difference) থেকে, যা কিনা আবার পরিস্থিতি ও প্রয়োজনানুসারে পরিবর্তিত ও বিবর্তিত হয়েছে। প্রকৃতিগতভাবে নারীর

সন্তানধারণ ও পালন উপযোগী দৃঢ়তা, সহিষ্ণুতা ও সেবা পরায়ণতা এবং পুরুষের শক্তিমত্তা রক্ষণের ক্ষমতা ও প্রকাশপ্রবণতা সত্ত্বেও শিকার, উদ্যান ও কৃষিভিত্তিক সমাজে মাতৃতান্ত্রিক পরিবার কাঠামো ও নারীর সহজাত নেতৃত্বের ক্ষমতাকে মেনে নিয়েই সভ্যতার অগ্রগতি ঘটেছে।

আবার ধর্মভিত্তিক প্রভাবশালী তাত্ত্বিক রীতিকে নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্রের ভিন্নতার জন্য দায়ী করা হলেও ইতিহাস কিন্তু ভিন্ন সাক্ষ্য দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইসলাম প্রচার ও প্রসারকালে ষোড়শ, সপ্তদশ, অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে Turkey, Aleppo এবং Cairo শহরের প্রতিটি শ্রেণির মুসলিম নারী কোনো না কোনো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে বড় ব্যবসা, জমি ও সম্পদভিত্তিক ব্যবসা, সবজি, থালাবাসন, ডিশ, রুটি, কাপড় ইত্যাদি বাজারে বিক্রয়, সুতা ও নাইলনের কাঁচামাল কিনে ঘরে প্রক্রিয়াজাত করে বিক্রয় ইত্যাদি। সমসাময়িক মিশর ও সিরিয়ায় নারীরা কৃষি শ্রমশক্তির (Agricultural Labour Force) গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে কাজ করতেন। একইভাবে সনাতন হিন্দুধর্মেও নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণকে দ্রাবিড়, অনার্য ও আর্য নারীদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে একীভূতভাবেই দেখা সম্ভব। খ্রিস্ট ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী নারীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য।

বর্তমানে বাংলাদেশে নারীর রয়েছে বহুবিধ কর্মক্ষেত্র। গ্রামীণ নারীদের অধিকাংশই উৎপাদন ও বাজারের সঙ্গে সম্পৃক্ত নানা কর্মকাণ্ড , যেমন জাল ও মাদুর বোনা, পাটজাত দ্রব্য ও ব্যাগ তৈরি, মুড়ি পিঠা ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য প্রস্তুতে নিয়োজিত থাকেন। তবে এগুলোর অধিকাংশই নারীর গৃহকর্ম বলে বিবেচিত হওয়াতে আমরা দেখতে পাই জাতীয় শ্রমশক্তি জরিপ ২০০২-০৩ থেকে শ্রমশক্তি জরিপ ২০০৫-০৬-এ উৎপাদনশীল খাতে নারীর অংশগ্রহণ মাত্র ১.৫৫ শতাংশ বেড়ে হয়েছে ২৩.৬৭ শতাংশ। তবে গত কয়েক বছরে এ প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি পাওয়াতে শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ অনুযায়ী নারীশ্রম হচ্ছে মোট শ্রমশক্তির ৩৬ শতাংশ, বসতবাড়িতে পশুপালন ও পরিচর্যা, গোয়ালঘর নির্মাণ ও পরিষ্কার, ভিটায় সবজিবাগান করার মাধ্যমে পুষ্টিসমস্যার সমাধান ও পারিবারিক খাদ্যচাহিদা মেটানোর ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ প্রায় ৮৫ শতাংশ। আত্মপোষণশীল খাতে (Subsistence Sector) নারীর অংশগ্রহণ পুরুষের প্রায় দ্বিগুণ (৪৪,০০০ মিলিয়ন ঘণ্টা) (হামীদ ১৯৮৯) হলেও এ তথ্য জাতীয় পরিসংখ্যানে অন্তর্ভুক্ত হয় না।

প্রাকৃতিকভাবে আবহমান কাল ধরে নারী সন্তান উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত। আবার

সন্তান পালনের সিংহভাগ দায়িত্বও নারীরই। আবার গৃহে পরিবারবর্গ, বয়োজ্যেষ্ঠদের সেবা, বয়োকনিষ্ঠদের শুশ্রূষা করে নারী তাঁর জীবনের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় সময় (১৫-৪৫ বছর বয়স) ব্যয় করেন যা কোনো পরিসংখ্যানভুক্ত হয় না।

আবার শিক্ষিত হলে তিনি তাঁর স্বামীর পেশায় নানাভাবে সাহার্য করে থাকেন। একটি সাম্প্রতিক গবেষণায় প্রাবন্ধিক কর্তৃক দৈব চয়নের (Random Sampling) মাধ্যমে নির্বাচিত ১০টি মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে সংগৃহীত উপাত্তের ভিত্তিতে নির্ণীত হয় যে প্রতি মাসে একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের গৃহিণী সে সব কাজ সম্পাদন করেন, মজুরিভিত্তিক হারে তার মোট বাজার মূল্য ২১,১০০ টাকা (একুশ হাজার এক শত টাকা) (আহ্মেদ ২০১২)। কাজেই এ উপাত্তের মাধ্যমে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে একজন সাধারণ মধ্যবিত্ত পূর্ণকালীন গৃহিণী বেকার তো ননই, বরং সংসারের ব্যয় বাঁচিয়ে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই পরিবারের সর্বোচ্চ উপার্জনকারী। অথচ এ খাত জাতীয় আয়ে থেকে যায় উপেক্ষিত।

শ্রমশক্তি জরিপ ২০০৫-০৬ অনুযায়ী কৃষিক্ষেত্রে নিয়োজিত নারীর সংখ্যা ৬৮.১৩ শতাংশ। অনেক ফসল, যেমন আলু, ভুট্টা, মরিচ ইত্যাদি উৎপাদনের ক্ষেত্রে নারী ৭০ শতাংশ থেকে ৯০ শতাংশ কাজ করেন। কিন্তু নারী জমির মালিক নন বলে তিনি পরিসংখ্যানে কৃষক হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হন না। যেহেতু কৃষিক্ষেত্রে নারী সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত থাকার পরও কৃষক কিংবা কৃষিশ্রমিক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেননি, ফলে দেশের জাতীয় আয়ে তাঁদের এ অবদানও স্বীকৃতিহীন।

বাংলাদেশের কুটির শিল্পে নারীর সম্পৃক্ততার ইতিহাস সুপ্রাচীন। নকশি কাঁথা বোনা, কাঁচ, মোম, শোলা দিয়ে শৌখিন সামগ্রী তৈরি, চুন, ঠোঙ্গা তৈরি, বাঁশ ও বেত শিল্প, জাল বোনা, ছোবড়া শিল্প, মাদুর বোনা, ব্লক, বাটিক, টাই বাই শিল্পে নারী সিংহভাগ অবদান রেখে যাচ্ছেন। নব্বইয়ের দশক থেকে 'বুটিক' শিল্পের যে সব জাগরণ এসেছে, তাতে কুটির শিল্পে নারীর সম্পৃক্ততা বেড়েছে বহুগুণে। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কুটিরশিল্পে নারীর অবদানকে গৃহস্থালি কাজের সাথে সম্পৃক্ত রেখে পরিসংখ্যানে আনা হয় না। তবে কুটিরশিল্পে অনেক নারীশ্রমিক এখন শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে নারীবান্ধব কর্মসূচির কারণে (Women-friendly) আনুষ্ঠানিক খাতে (Formal Sector) কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। এই নারী-উদ্যোক্তারা সফল হয়ে নিজেদের কারখানাকে ক্ষুদ্র শিল্পের (Small Industry) পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন এবং অনেক পুরুষেরও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

বৃহৎ শিল্পেও নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়েছে উল্লেখযোগ্যভাবে। বিশেষত পোশাক শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, চিংড়িশিল্প, ঔষধশিল্প, চা-শিল্প এবং রেশমশিল্প লক্ষণীয়ভাবে নারীশ্রমিক অধ্যুষিত। তবে পোশাকশিল্পে লিঙ্গ-বৈষম্যের কারণে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নারী শ্রমিক পুরুষের তুলনায় প্রায় ৩৫ শতাংশ মজুরি কম পান (Paul-Majumder and Begum 2006)।

বৃহৎ শিল্পের ক্ষেত্রে পদোন্নতির বেলায়ও লিঙ্গ-বৈষম্যের শিকার হন নারী। এর পেছনে সেসব যুক্তি কাজ করে তা হল একজন নারী বৈবাহিক ও সন্তান ধারণজনিত কারণে কর্মে ছেদ দিতে পারেন যে সম্ভাবনা পুরুষের ক্ষেত্রে কম। আর সঠিক

দায়িত্বশীল পদে এ ছেদ তাৎক্ষণিকভাবে পূরণ করা নিয়োগকারীদের ক্ষেত্রে কষ্টকর। নারীদের দরকষাকষির ক্ষমতা (Bargaining Power) পুরুষদের তুলনায় কম হবার কারণেও তাঁরা কর্মক্ষেত্রে ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হন।

বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী শিল্প, চা-শিল্পে নারী শ্রমিকের সংখ্যা মোট শ্রমিকের ৫২ শতাংশ (পারভেজ ২০০০)। খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প ও চিংড়িশিল্পেও নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য এবং তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সেবা খাতে নারীর অংশগ্রহণের উল্লেখযোগ্য খাতগুলো হল সাংবাদিকতা (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক), প্রশাসন ও সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, ইন্টেরিয়র ডেকোরেশন ইত্যাদি। এছাড়া ক্ষুদ্রঋণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ দেশের দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ক্ষুদ্রঋণ প্রক্রিয়ায় নারীরা তাদের গৃহীত ঋণের ৯০ শতাংশ ক্ষেত্রেই পুরোপুরি পরিশোধ করেছেন। তাঁরা পরে আরও বৃহত্তর ঋণ গ্রহণ করেছেন এবং নিজেদের পাশাপাশি পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশী এবং অন্য অনেকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁদের সফলতা যদিও বাংলাদেশকে নোবেল পুরস্কার এনে দিয়েছে, তবু এ সাফল্যের ওপর নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নেই। কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্ষুদ্রঋণ উদ্ভূত কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য তাদের পুরুষের ওপর নির্ভর করতে হয়। দেখা গেছে তার নিয়ন্ত্রণ নেই ব্যবসায়ের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কেনার ওপর, ব্যবসার যাবতীয় তথ্য বা লব্ধ মুনাফার ওপর। ফলে জাতীয় আয়ে ক্ষুদ্রঋণ-উদ্ভূত অবদানের অনেকটাই পুরুষের অবদান হিসেবে পরিসংখ্যানে অন্তর্ভুক্ত হয়।

নারীরা প্রচুর অপ্রচলিত পেশায়ও অংশগ্রহণ করছেন। বিচারপতি, উকিল, ট্রাফিক পুলিশ, নিরাপত্তা প্রহরী, ফার্ম ও বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রীর সরবরাহকারী, সেনাবাহিনী, ড্রাইভিং, রিকশা-পেইন্টিং, মৃতদেহ সৎকার সংক্রান্ত ব্যবসা, রেডিও ও চাবি তৈরি, ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি ধার দেবার কাজ, ধাত্রীর কাজ, টিভির মেকানিক, শিপিং ম্যানেজমেন্ট, কেমিস্ট, তবলাবাদক, ভিডিও ক্যাসেট এবং অন্যান্য বিনোদনসামগ্রী ভাড়ায় খাটানো, অর্থ সংক্রান্ত মধ্যস্থতাকারী, জীবন বীমা ও অন্যান্য বীমা, হেয়ার ড্রেসিং এবং অন্যান্য রূপসজ্জাজনিত কাজ, অ্যালোপ্যাথ, হোমিওপ্যাথ, ইউনানী ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা, সিনেমা হলে প্রজেক্শন, চলচিত্র উৎপাদন ও বিতরণ, এমনকি প্রাথমিক পর্যায়ে মাদ্রাসা ও অন্যান্য ধর্মীয় শিক্ষাদান ক্ষেত্রেও নারী অংশ নিচ্ছেন। এ তথ্য কোনো কাল্পনিক ব্যাপার নয়, বরং জাতীয় শ্রমশক্তি জরিপ ২০০২-০৩ এবং ২০০৫-০৬ থেকে সংকলিত। ২০০৫-০৬-এর হিসাব অনুযায়ী জাহাজভাঙা এবং বিচ্ছিন্নকরণ শিল্পের মোট শ্রমশক্তির ৮২.৪০ শতাংশ, যানবাহন নির্মাণ শিল্পের ৩৮.২৮ শতাংশ শ্রমিক নারী। একইভাবে বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি তৈরি, জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত, সাইকেল ও রিকশা মেরামত, ভবন নির্মাণ ও সমাপ্তকরণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন ও

বিতরণ, কাঠ চেরাই ও প্রক্রিয়াজাতকরণ, বৈদ্যুতিক মেরামত, রেলওয়ে, সড়ক, নৌপথ, সামুদ্রিক ও উপকূলীয় যোগাযোগ, কেন্দ্রীয় ব্যাংকিং, আর্থিক বিনিময় ও ঋণদান এবং জীবনবীমা খাতে নারীর অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য ও ক্রমবর্ধমান।

নারীর কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের একটি বহুমুখী চিত্র এ আলোচনায় হলেও শ্রমশক্তি জরিপ ২০০২-০৩ এবং ২০০৫-০৬ অনুযায়ী এমন অনেক ক্ষেত্র রয়েছে যেগুলোতে নারীর অংশগ্রহণ বাস্তবে থাকলেও শূন্য দেখানো হয়েছে। এ খাতগুলো হলো সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডাটা প্রসেসিং, সফটওয়ার কনসালট্যান্সি, কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটসমূহে শ্রমিক নিয়োগ, একাউন্টিং, বুক কিপিং, ট্যাক্স আদায় ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্সি, তুলা এবং উল প্রক্রিয়াজাতকরণ, ফুটওয়্যার তৈরি, লাগেজ, হ্যান্ডব্যাগ ও হার্নেস তৈরি, ধাতব ট্রাঙ্ক, নাট-বল্টু, ব্যারেল ও ড্রাম তৈরি, ধাতু ও ধাতব দ্রব্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কোটিং, ইঞ্জিন, টার্বাইন এবং অন্যান্য শিল্পে ব্যবহার্য ভারী যন্ত্র তৈরি, হিসাবরক্ষণ ও কম্পিউটিং যন্ত্র তৈরি, যান্ত্রিক মোটর, জেনারেটর ও টার্বাইন তৈরি, বৈদ্যুতিক তার (ইনসুলেটেড ও কেবল) তৈরি, বৈদ্যুতিক বাল্ব, টিউব ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি তৈরি, টেলিভিশন রেডিও ও অন্যান্য প্রচারমূলক যন্ত্রাংশ তৈরি এবং পর্যবেক্ষণ, পরিমাপ, পরীক্ষণ ও নেভিগেটিং-এর যন্ত্রাদি নির্মাণ ইত্যাদি। এছাড়াও নারী মুদি দোকান, চা ও পিঠার দোকান, সেলুন, সাধারণ বিপনী বিতানে বিক্রেতা, মোবাইল ফোন বিক্রয়, বিক্রয়োত্তর সেবাদান, রিচার্জ ও কম্পিউটার তৈরি ইত্যাদি খাতেও এগিয়ে এসেছেন– যার কোনোটিই পরিসংখ্যানে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সামাজিক পরিমণ্ডল যদি নারীর প্রতি উদার হত এবং সেসব খাতে নারীর অংশগ্রহণ ইতোমধ্যেই রয়েছে তা যদি যথার্থভাবে স্বীকৃত হত, তবে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেত, অন্যদিকে তেমনি জাতীয় আয়ে নারীর অবদানের পরিসংখ্যানগত অংশগ্রহণও আরও বেড়ে যেত।

শুধু বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশেই নয়, অনেক উন্নত দেশেও প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার অভাবে এবং নারীবান্ধব পরিবেশের অভাবে নারীগোষ্ঠী তাদের প্রতিভা এবং সম্ভাবনা উৎপাদনশীল কাজে লাগাতে পারেন না। কারণ নারী পারিবারিক, সামাজিক, পেশাগত পরিমণ্ডলে দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমানভাবে সংস্কার বা রীতিনীতির যেসব অলিখিত, কিন্তু বাস্তব বাধার সম্মুখীন হন– তা পরিসংখ্যানভুক্ত হয় না বটে, তবে পরিসংখ্যানে তাঁর অবদানকে অবমূল্যায়িত করে, নারীর প্রতি পুরুষতান্ত্রিক এবং পুঁজিবাদী সমাজের উন্নাসিকতা যে লিঙ্গ বৈষম্য (Gender Gap) তৈরি করে, তা সার্বিক অর্থনীতিকেই বাধাগ্রস্ত করে। জাতীয় আয়ে নারীর অবদানকে পরিসংখ্যানভুক্ত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, নিয়োগকারী সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, দাতাগোষ্ঠী, নীতিনির্ধারক, গবেষক, উদ্যোক্তা, সমাজকর্মী– অর্থাৎ সর্বস্তরের জনগণকে সচেতনভাবে এগিয়ে আসতে হবে। আর তাহলেই অনেক প্রতিবন্ধকতাকে যথাযথভাবে

চিহ্নিত করে তা দূর করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করা সম্ভব হবে এবং আমাদের সামষ্টিক অর্থনীতিতে তা নিশ্চিতভাবে সুদূর প্রসারী ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

গ্রন্থপঞ্জি

হামীদ, শামীম (১৯৮৯): "নারীদের গৃহস্থালী কর্মকাণ্ড এবং জিডিপি'র হিসাব: কিছু প্রসঙ্গ কিছু অনুষঙ্গ," বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ৭ম খণ্ড, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)।

পারভীন, শামীমা (১৯৯৯): "কৃষিতে নারী: অবদান ও প্রাপ্তি," উন্নয়ন পদক্ষেপ, এপ্রিল-জুন, ৫ম বর্ষ, ষষ্ঠদশ সংখ্যা।

আহ্মেদ, হোমায়রা (২০০৭): "বাংলাদেশের নারী কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও যথাযথ মূল্যায়ন" শীর্ষক একটি পর্যালোচনা, সেলিনা হোসেন, ঋতা আফসার ও মাসুদুজ্জামান সম্পাদিত "জেন্ডার ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন," মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

আহ্মেদ, হোমায়রা (২০১২) "জাতীয় আয়ে নারীর অবদান: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ," বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, ২৯ তম খণ্ড, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস)।

Bulbul, Parvez (2010): "Women in Media in Bangladesh," Sub-editorial, 8 August 2010, *The Daily Star*.

Hamid, Shamim (1986): "Women's Non-market Works and GDP Accounting: The Case of Bangladesh," *Research Report,* No.110, Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS).

Paul-Majumder, Pratima (1986): "Women, Work and Home", *Research Report,* No.49, Human Resource Division, Bangladesh Institute of Development Studies (BIDS).

Paul-Majumder, Pratima and Begum, Anwara (2006): "Engendering Garment Industry: The Bangladesh Context,@, University Press Limited (UPL).

BBS (2004): *Labour Force Survey (2002-2003),* Bangladesh Bureau of Statistics.BBS (2008): *Labour Force Survey (2005-2006),* Bangladesh Bureau of Statistics.

নারীর সমস্যা: সমাধানের খোঁজে

....

মি তা লী হো সে ন

আমাদের পৃথিবীতে শতরকমের বৈষম্য। ধন্য-বৈষম্য, বর্ণ-বৈষম্য উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণের বৈষম্য। তবে সব বৈষম্যকে ছাড়িয়ে গিয়েছে জেন্ডার-বৈষম্য। একথা চোখ বন্ধ করে বলা যায়। জেন্ডার-বৈষম্য আছে সব দেশে, সব সমাজে। দীর্ঘ দীর্ঘকাল আগে যখন থেকে পৃথিবী মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা থেকে পুরুষশাসিত হতে থাকল তখন থেকেই জেন্ডার- বৈষম্যের শুরু।

রাঢ় হলিকেল গৌড় বঙ্গ ও সমতট নিয়ে গড়ে ওঠা আমাদের এই অঞ্চলের সমাজ ছিল মূলত মাতৃতান্ত্রিক। যার কিছু চিহ্ন আজও রয়ে গিয়েছে। এই মাতৃতান্ত্রিকতাকে আমরা সনাক্ত করতে পারি সনাতন ধর্মে ব্যাপক নারী-দেবতার অন্তর্ভুক্তিতে। এদেশে আর্যদের আবির্ভাবের পরবর্তীকালে আর্য পিতৃতান্ত্রিকতার প্রভাবে আমাদের সমাজে নারীর অধস্তনতার শুরু। তারপর আমরা পেরিয়ে এসেছি অনেককাল। আধুনিক হয়েছে মানুষ। প্রতিদিনই উন্নত হচ্ছে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে। পরিবর্তন হচ্ছে সমাজ জীবনে। কিন্তু কোনো বড় ধরনের পরিবর্তন হয়নি নারীর অবস্থানের। সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক সমাজ থেকে আজকের বাজার-অর্থনীতির এই সময়ে নারীই ধরে রেখেছে পারিবারিক কাঠামো। বজায় রেখেছে পরিবার-সমাজ। তারপরেও নারী পরিবারে অধস্তন। সমাজে নিগৃহীত। প্রতিনিয়ত নারী শিকার হচ্ছে নানা বৈষম্য- নির্যাতনের।

একজন নারী সংসারে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডিপাঠ সব কাজ করেও তাকে সর্বদা শুনতে হয়, তোমার কী কাজ? কিন্তু সত্যিই কি তাই? সন্তান জন্মদান থেকে শুরু করে আগামী দিনের মানুষ তৈরির মতো সবচেয়ে কাজটাই করছে নারী। বৃহত্তর সমাজের দিকে চোখ ফেরালেও আমরা দেখব হাটে-মাঠে-ঘাটে অফিসে-কারখানায় সর্বত্রই কাজ করছে নারী। ঘরে-বাইরে এই যে কর্মবহুল সময় নারী পেরিয়ে যাচ্ছে তার বদলে নারী কী পাচ্ছে? এই যে কর্মমুখর নারীজীবন তার মূল্যায়ন শ্রমের মর্যাদা ও মানুষ হিসেবে সমান অধিকার এটাই হল নারী আন্দোলনের মূলকথা। তবে একটা কথা প্রথমেই স্পষ্ট হয়ে যাওয়া প্রয়োজন। নারী আন্দোলন পুরুষের বিরুদ্ধে নয়। নারী আন্দোলন প্রচলিত অসাম্যের বিরুদ্ধে। সাম্য প্রতিষ্ঠার প্রথম ও প্রধান শর্তই হল জেন্ডার-সচেতনতা।

প্রথম যে কথাটি পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন সেটি হল জেন্ডার-সচেতনতা কী? জন্মের সময় শিশুটি জানে না যে সে নারী না পুরুষ। যখন সে বড় হয়ে তখন প্রতি

পদে পদে তার সামনে রাখা নানা বিধিনিষেধ। আর সেই বিধিনিষেধের পাকে পাকে জড়িয়ে একসময় সে হয়ে ওঠে নারী। পুরুষ মানেই শক্তিশালী বলবান, রুক্ষ বুদ্ধিমান এরকম যা কিছু পৌরুষের প্রতীক তার বিপরীত যা তাই হল নারী। এই যে ভুল এবং মিথ্যা ধারণা সমাজে প্রচলিত রয়েছে তার থেকে বেরিয়ে আসাই হল জেন্ডার-সচেতনতা।

জেন্ডার-সচেতনতা মানুষকে মানুষ ভাবতে শেখাবে। সেখানে কবি শুধুই কবি, মহিলা কবি নয়। শ্রমিক শুধুই শ্রমিক নারী-শ্রমিক নয়। যখন অধিকার আর স্বাধীনতার প্রশ্ন তখন মানুষ শুধুই মানুষ নারী বা পুরুষ নয়।

অসভ্য যুগ থেকে বর্বর যুগে পা দেবার সময় থেকেই পৃথিবীতে মাতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে জনকতন্ত্রের প্রচলন হয়। আর তখন থেকেই অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে নারী হয়ে যায় অধস্তন। ইতিহাস জানায় নারীর দাসত্ব শুরু হয়েছে দাসপ্রথারও পূর্বে। এই দাসত্বকে সবসময়ই সামাজিকভাবে মহান করে দেখানো হয়েছে। এই দেখানোর মধ্য দিয়ে হরণ করে নেয়া হয়েছে তার সমস্ত অধিকার।

প্রথমেই আমরা নজর দেব নারীর পারিবারিক সমস্যা দিকে। ব্যতিক্রম বাদ দিলে বেশির ভাগ সময়ে পরিবারে নারী দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক। যৌন নিগ্রহ, যৌতুকসহ নানা শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার সহ্য করতে হয় নারীকে। এছাড়াও আছে শ্লেষ বিদ্রূপ-অবহেলা। প্রায় সব পরিবারেই এটা একটা সাধারণ ঘটনা। পরিবারে নারীর সবচেয়ে বড় সমস্যা স্বাধীনতার অভাব। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ বলে স্বামী-সংসার-সন্তান সামলানোই সবার আগে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না এই তিন মহান দায়িত্ব পালনেই কেটে যায় জীবন। তারপরেও এই তিনটি দায়িত্বকে মেয়েলি কাজ বলে অপমান করা হয়। কোনো মূল্য দেয়া হয় না গৃহশ্রমকে। না পরিবার মূল্য দেয়, না সমাজ মূল্য দেয়। অথচ একজন নারীর কাছে এই তিনটি কাজের জন্য একশ ভাগ মনোযোগ দাবি করে পরিবার ও সমাজ।

নারীদের সামাজিক সমস্যা অন্তহীন। এর মধ্যে প্রধান হল নিরাপত্তাহীনতা। কর্মক্ষেত্রে যৌননিগ্রহ আকছার ঘটে। রাস্তায় যানবাহনে অফিসে সর্বত্র নারীকে যৌনবস্তু হিসেবে গণ্য করা হয়। নারী শিক্ষক আমলা ডাক্তার কবি যাই হোক-না কেন সহকর্মীদের আলোচনায় ঘুরেফিরে তার চেহারার নিন্দা অথবা প্রশংসা অনিবার্য। সর্বত্র পুরুষদের নানারকম অশ্লীল কথা ইঙ্গিত, শিস শোনার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয় নারীকে। রাস্তায়-অফিসে-বাড়িতে যখন নারীর নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়, ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো নারীকে নিগৃহীত করা হয় তখন সবসময় প্রতিবাদ করাও সম্ভব নয়। প্রতিবাদ করলে নারীকেই শুনতে হবে নানা কটুবাক্য। যেমন এতই যদি ছুৎমার্গ তাহলে ঘর থেকে বের হন কেন?

যদিও ইসলামে নারীর মর্যাদাকে কোনোভাবেই খাটো করা হয়নি। বরং অনেক বেশি সম্মান দেয়া হয়েছে। ইসলাম ধর্মে বলা হয়েছে ‘শেষ বিচারের দিনে মায়ের

পরিচয়ে সন্তান পরিচিত হবে।' অথচ ধর্মের নামে নানাভাবে হয়রানি নির্যাতন করা হয়। আমাদের গ্রামীণ নারীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে ফতোয়াবাজির কারণে। যখনই কোনো নারী মাথা তুলে দাঁড়াতে চায় একই সাথে রে রে করে তেড়ে ওঠে পরিবার ও সমাজ। নারীর এই যে অধস্তন অবস্থান-এর থেকে মুক্তি আসবে কোন পথে? ভাবনার বিষয় হল সেটাই। মার্কস বলেছেন নারীমুক্তির প্রথম শর্ত হল কাজের জগতে নারীর নিয়োগ। এই কথাটি কতটা সঙ্গত? সেই প্রশ্নটি আমাদের ভাবায়। তাহলে কি কাজের জগতে নারীরা নেই! ঘরে থাকে যে নারী, ঘর-সন্তান সামলায় যে নারী তাদের শ্রমকে মার্কস কি কাজের মর্যাদা দেননি? প্রখ্যাত নারীবাদী রোজা লুক্সেমবার্গ একজন কট্টর সমাজতন্ত্রী ছিলেন। তিনি নারীর শ্রম সম্পর্কে মার্কসের এই মনোভাবের সাথে একমত ছিলেন না। এমনকি লেনিনের সাথেও নারীর শ্রমের মর্যাদা নিয়ে তার দ্বন্দ্ব সেই সময় পৃথিবীব্যাপী আলোড়ন তুলেছিল।

সে তো গেল বিগত সময়ের কথা। আজকের পুঁজিবাদী বিশ্বও কিন্তু নারীর শ্রমকে অস্বীকার করে আসছে একইভাবে। সন্তান লালনপালন, ঘর গোছানো, রান্না করা, সেলাই করা। অর্থাৎ গেরস্থালির সকল কাজ একে আমরা কি শ্রম বলব না? এই যে উদয়াস্ত গৃহশ্রম যেখানে ঘণ্টার কোনো হিসাব নেই, বেতন-বোনাস-ছুটি নেই। সবচেয়ে বড় কথা হরতাল নেই, আন্দোলন নেই। তবে কেন নারীর কাজকে শ্রমের মর্যাদা দেয়া হবে না? বর্তমান শ্রমশক্তির সেবা এবং ভবিষ্যতের শ্রমশক্তি নির্মাণ ও লালন তো নারীই করছে তার কি কোনো মূল্য নেই? একজন অফিস ম্যানেজার যতটা কাজ করে একজন গৃহব্যবস্থাপকের কাজ তার চেয়ে বেশি। এই বিষয়ে লিখতে বসে আমার প্রিয় কবি মল্লিকা সেনগুপ্তের একটি কবিতার কথা মনে পড়ছে

'ছড়া যে বানিয়েছিল, কাঁথা বুনেছিল
দ্রাবিড় যে মেয়ে এসে গম বোনা শুরু করেছিল
আর্য পুরুষের ক্ষেতে, যে লালন করেছিল শিশু
সে যদি শ্রমিক নয়, শ্রম কাকে বলে?'

আজ সময় এসেছে গৃহকাজকে শ্রম হিসেবে স্বীকৃতিদানের। তা হলেই নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে অনেকটাই। আজ নারীদের জন্য চাই গৃহকাজের মজুরি ও শ্রমের স্বীকৃতি। আমার মনে হয় এ কথা বলার কোনো সুযোগ নেই ঘরে থাকে যে নারী তার কোনো কাজ নেই।

নারীর জন্য সাম্যের সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রচারমাধ্যমকে সচেতন হতেই হবে। টেলিভিশন সিনেমা বা পত্র-পত্রিকায় নারীর যে নেতিবাচক চিত্র তুলে ধরা হয়ে থাকে তা বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। তার বদলে তুলে ধরা প্রয়োজন পরিবর্তনশীল আজকের

পৃথিবীতে নারীর পরিবর্তিত ভূমিকা। এবং পরিবার গঠনে ও সমাজকে টিকিয়ে রাখতে নারীর অবিস্মরণীয় ভূমিকার কথা।

জেন্ডার-সাম্য প্রতিষ্ঠায় নারীর নিজেরও একটা বড় ভূমিকা আছে। নারীকে যেমন সাম্যের জন্য লড়তে হবে তেমনি একই সাথে সচেতন থাকতে হবে নিজ সমাজ-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রতি। নারী স্বাধীনতাকে উপভোগ করবে সীমার মধ্যে থেকে। কারণ আল্লাহ্ সীমা লংঘনকারীকে পছন্দ করেন না। সীমা লংঘন করলে স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলাও অসম্ভব না।

প্রে ম / প্র ব ন্ধ

মার্কসীয় দৃষ্টিতে প্রেম

....

লে খ ক : অ জ্ঞা ত

প্রেম সম্পর্কে (নিষ্কাম বা ভগবৎ প্রেম নয় একেবারে জাগতিক মানুষের প্রেম, নর-নারীর ব্যক্তিগত যৌনপ্রেম) বুর্জোয়া সমাজ ও শিল্পসাহিত্যে প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে যে মোহজাল সৃষ্টি করা হচ্ছে তাতে আবিষ্ট হয়ে সমাজের কিছু সংখ্যক যুবক-যুবতী প্রেমের জোয়ারে ভেসে যাওয়াতেই যৌবনের পরম প্রাপ্তি বলে মনে করে। কিন্তু যৌবনের তাৎক্ষণিক আনন্দ ও অলীক স্বপ্ন যখন বাস্তবে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়, তখন চরম হতাশা ও আত্মগ্লানি এসে তাদের গ্রাস করে। ফলে কত অমূল্য জীবন নষ্ট হয়, অবক্ষয়ের পঙ্কে নিমজ্জিত হয়। কিন্তু কেন এমন হয়, কেন স্বপ্নগুলো বাস্তবে রূপ পায় না, কেন পূর্বরাগের সেই নিঃস্বার্থ, মধুর প্রতিশ্রুতিগুলো প্রেমিক-প্রেমিকারা ভুলে যায় অনেকেই তা বুঝতে পারে না। মানবসমাজে প্রেমের উৎপত্তির সাথে সমাজের অর্থনীতির যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সে বিষয়ে কোনো বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী না-থাকাই এর অন্যতম কারণ। এমনকি, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রতি আস্থাশীল অনেক সাধারণ মানুষও প্রায়ই প্রশ্ন করেন মার্কসীয় দৃষ্টিতে প্রেমকে কী চোখে দেখা হয় এবং

সমাজতান্ত্রিক বা তার পরবর্তী সমাজে নরনারীর সম্পর্কই-বা কী হবে? যদিও দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে, বিশেষ করে বাঁচার তাগিদে যখন সাধারণ মানুষ, শ্রমিক-কৃষক দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামে লিপ্ত, তখন এই আলোচ্য বিষয়টি কেবল ধপধফবসরপ উদ্দেশ্যই পূরণ করবে, তবুও এর দ্বারা যদি উপরোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি সামান্যতমও আলোকপাত করা যায়, তবেই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য অনেকাংশে সফল বলে মনে করা যেতে পারে।

তবে একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সমাজে নর-নারী সম্পর্ক, যৌন-প্রেম ইত্যাদি বিষয়ে সর্বহারাশ্রেণি ও কৃষক জনসাধারণের মধ্যে অলীক মোহ সৃষ্টির অবকাশ যতখানি, শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকসম্প্রদায়ের মধ্যে তা বহুগুণ বেশি। তাই দেখা যায় কৈশোর অতিক্রম করতে না-করতেই এদের মধ্যে সংক্রামিত হচ্ছে প্রেমের নামে নারীসঙ্গের জন্য কামনা এবং তা চরিতার্থ না-হওয়ায় দেখা দিচ্ছে নানারকম বিভ্রান্তি ও বিকৃতি এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে সমাজের একাংশের নৈতিক অবক্ষয়। সমাজের মোট জনসংখ্যায় তুলনায় মধ্যবিত্তের সংখ্যা অত্যল্প হলেও এ-কথা অনস্বীকার্য যে সুস্থ সমাজগঠনে, বর্তমান সমাজকে উন্নততর স্তরে উন্নয়নের সংগ্রামে এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের ভূমিকা ঐতিহাসিক কারণেই আজ আর নগণ্য নয়। তাই সমাজ-পরিবর্তনের লড়াইয়ের সাথে এই অবক্ষয় রোধের সংগ্রামকে যুক্ত না-করাটাও হবে ভুল।

বুর্জোয়াশ্রেণি তার বিবিধ সাংস্কৃতিক মাধ্যমের সাহায্যে এই মোহজাল বিস্তার করে যাচ্ছে। তাদের নিজেদের শ্রেণির মধ্যে নর-নারীর সম্পর্ক বা যৌন-প্রেম বিষয়ে যে বিকৃতি ও ব্যভিচার বিদ্যমান, শ্রেণিগত কারণে তা আসতে বাধ্য। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোর ন্যুড ক্লাব, হিপি-প্রেম, ডেটিং, লাভ-মেকিং, ওম্যান-লিব্ ইত্যাদির যে ভয়াবহ রূপের কথা আমরা শুনতে পাই, আমাদের দেশের বুর্জোয়া সমাজেও রকমফেরে তার পুনরাবৃত্তি ঘটতে শুরু করেছে এবং তা ঘটতে বাধ্য। কিন্তু সমাজের অন্যান্য সংগ্রামী শ্রেণির মধ্যে এ সবের অনুপ্রবেশ ঘটানোর মতো বিলাসিতার অর্থ হবে সমাজের অগ্রগতির রাশ টেনে ধরা ও সমূহ ক্ষতি করা। তাই এই ধপধফবসরপ আলোচনারও যৌক্তিকতা একেবারে অস্বীকার করা যায় না।

দুই.

কলেজ-পালিয়ে, বাড়ি থেকে লুকিয়ে একজোড়া যুবক-যুবতী গঙ্গার পারে পাশাপাশি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে আছে। পশ্চিম আকাশে ডুবন্ত সূর্যের অবশিষ্ট আলোর রেশটুকুও শেষ হয়ে যাচ্ছে। যুবকটি আবেগভরা গলায় যুবতীটিকে বলছে, এভাবে আর ভালো লাগে না। চল, আমরা এমন জায়গায় চলে যাই যেখানে কেউ থাকবে না। শুধু তুমি আর আমি একটা কুঁড়েঘর বানিয়ে নির্জনে বাস করব। আমি সারাদিন ঘুরে ঘুরে খাবার জোগাড় করব, আর সন্ধ্যেবেলা অধীর অপেক্ষার পর আমরা আবার মিলিত হব।

যুবতীটি হঠাৎ প্রশ্ন করে, তুমি আমায় ভুলে যাবে না তো? বল, কথা দাও আমাকে কোনোদিন ছেড়ে যাবে না?

যুবকটি আবেগ-গভীর গলায় উত্তর দেয়, তুমি আমার জীবন ও মরণ তুমি আমার চিরদিনের সাথী ।

যুবতীটি যুবকের আরও কাছে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে ।

এটি কোনো নির্দিষ্ট গল্পাংশ নয় সাধারণ প্রেমের গল্পের একটি সর্বজনীন অংশবিশেষের কল্পিত রূপ মাত্র । যে কোনো প্রেমিক-প্রেমিকা বা যে কোনো গল্পের পাঠকই এ-রকম একটা situation-এর সাথে পরিচিত । কিন্তু এই অংশটুকুর মধ্যেই রয়েছে অনেক প্রশ্ন, অনেক গভীর আলোচ্য বিষয় । প্রথম প্রশ্ন হল, নর-নারীর প্রেম যদি সমাজে স্বীকৃতই হবে, তবে এই গোপনীয়তা কেন? দ্বিতীয় প্রশ্ন, যে যুবক-যুবতী এই সমাজের সাথে সহস্র সূত্রের বন্ধনে বাঁধা, তারা এই সমাজ ছেড়ে কল্পিত স্বর্গরাজ্যে যেতে চায় কেন? তৃতীয় প্রশ্ন, আপাতদৃষ্টিতে তাদের প্রেমের মধ্যে যে নিশ্ছিদ্র নিবিড়তা, তা কি পরস্পরের সমানাধিকারের ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠিত? চতুর্থ প্রশ্ন, শাশ্বত প্রেম বলে কি কিছু আছে, আর যুবতীটির মনের ওই সন্দেহ কি নিছকই অমূলক, এর কি কোনো বাস্তবভিত্তি নেই? এরকম আরও অনেক প্রশ্ন করে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি না-ঘটিয়ে আমার পঞ্চম ও শেষ প্রশ্ন, মেয়েটির ওই সন্দেহের মধ্যে কি এমন কোনো গোপন ভীতি লুকিয়ে নেই, যা ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক নিরাপত্তার অভাব-বোধ থেকে উদ্ভূত?

প্রতিটি প্রশ্ন স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা না করে বরং সামগ্রিক আলোচনার মধ্য দিয়ে প্রশ্নগুলোতে আলোকপাত করা শ্রেয় ।

অনেকেরই ধারণা মানুষের জন্মের শুরু থেকেই নর-নারীর মধ্যে প্রেমের অস্তিত্ব ছিল । ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদির মতো জন্মলগ্নেই মানুষ প্রেম নামক গুণের অধিকারী ছিল । কিন্তু এই ধারণা সঠিক কি? মানুষ যেসব গুণাবলির অধিকারী বা বলা চলে যেসব গুণাবলির দ্বারা মানুষ পশুজগৎ থেকে স্বতন্ত্র, তার সবগুলোই মানুষ জন্মগতভাবে লাভ করেনি । তার কিছু প্রবৃত্তিগত (instinctive), কিছু সমাজলব্ধ (socially adopted) । প্রবৃত্তিগত গুণাবলির দিক থেকে মানুষ আর পশুর মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নেই; কিন্তু সমাজলব্ধ গুণাবলি মনুষ্যসমাজের নিজস্ব সম্পদ ।

স্নেহ-মমতা প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদি মানবিক গুণাবলিই হচ্ছে সমাজলব্ধ গুণাবলি । ক্রিস্টোফার কডওয়েল তাঁর 'ইল্যুসন এন্ড রিয়ালিটি' গ্রন্থে এ সম্পর্কে অতি চমৎকারভাবে দেখিয়েছেন যে, 'যৌনপ্রেম, বসন্তকাল, সূর্যাস্ত, নাইটিংগেল পাখির গান এবং সুপ্রাচীন কাল থেকে গোলাপের সজীবতা, এই সবই সহস্র প্রজন্মের সঞ্চিত আবেগ ও অভিজ্ঞতার জটিল ইতিহাসের দ্বারা সমৃদ্ধ । এই প্রতিক্রিয়াগুলোর কোনোটাই প্রবৃত্তিগত নয়, তাই কোনোটাই ব্যক্তিগত নয় ।'

মানবসমাজে প্রেমের উদ্ভবের একটি বৈজ্ঞানিক ইতিহাস আছে এবং সমাজের ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি ঐতিহাসিক কারণেই কোনো একসময় এই ব্যক্তিগত যৌনপ্রেমের উদ্ভব ঘটেছে। সুতরাং আমাদের আলোচনায় সেই ইতিহাসের পর্যবেক্ষণ অপরিহার্য।

তিন.

মর্গানের গবেষণাকে ভিত্তি করে এঙ্গেলসের বিখ্যাত গ্রন্থ 'পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি' থেকে তথ্য সংগ্রহ করেই বর্তমান আলোচনাটির সূত্রপাত করা হচ্ছে।

মানুষের ইতিহাসকে মূলত তিনটি যুগে ভাগ করা হয় বন্যাবস্থা, বর্বরতা ও সভ্যতা। এই যুগগুলোর উৎপাদন-বৈশিষ্ট্যকে সংক্ষেপে নিম্নরূপে রাখা যেতে পারে : বন্যাবস্থা-এ যুগে ব্যবহার্য প্রাকৃতিক সম্পগুলোর দ্রুত আহরণের প্রাধান্য ছিল; মানুষের তৈরি কৃত্রিম জিনিসগুলো মূলত আহরণে ব্যবহৃত হাতিয়ারেই সীমাবদ্ধ ছিল। বর্বরতা এ যুগে পশুপালন ও কৃষিকার্যের প্রচলন হয় এবং মানুষের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে প্রকৃতির উৎপাদনক্ষমতা বৃদ্ধির পদ্ধতিগুলো আয়ত্তে আসে। সভ্যতা এই যুগে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রসেসিং যথার্থ শ্রমশিল্প ও কলার জ্ঞান অর্জিত হয়।

বন্যাবস্থার শুরুতে মানুষ দলবদ্ধভাবে বাস করত। তখন পরিবার বলে কোনো বস্তুর অস্তিত্ব ছিল না। ফলমূল প্রভৃতি আহার্য সংগ্রহ ও হিংস্র জন্তুদের হাত থেকে আত্মরক্ষাই ছিল একটি দলগত চাহিদা। সংগৃহীত আহার্য প্রত্যেকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত কারণ দলের অস্তিত্বরক্ষাই ছিল ব্যক্তির অস্তিত্বরক্ষার উপায়। সমাজের এই স্তরে, অবাধ যৌন-সম্পর্কের অধিকার ছিল। অবাধ এই কারণে যে, পরবর্তী সমাজের কোনো সামাজিক প্রথা ও রীতিনীতি তখন ছিল অনুপস্থিত। প্রত্যেক পুরুষ ও নারীর পরস্পরের ওপর সমান অধিকার ছিল। যেমন মাতা-পুত্র, পিতা-কন্যা, ভাই-বোনদের মধ্যে ছিল নির্বিচার যৌন-সম্পর্ক।

মর্গানের মতে উচ্ছৃঙ্খল যৌন-সম্পর্কের এই আদি অবস্থা থেকে সম্ভবত খুব গোড়ার দিকে দেখা গেল :

১। একরক্ত সম্পর্কিত পরিবার :

এটিকেই পরিবারের প্রথম স্তর হিসেবে ধরা যেতে পারে। এখানে ভাই-বোনদের মধ্যে বিবাহ হত, কিন্তু, পূর্বপুরুষের সাথে উত্তরপুরুষের যৌন-সম্পর্ক নিষিদ্ধ ছিল।

একই রক্তসম্পর্কিত নারী-পুরুষের যৌন মিলনের নাম অজাচার (incest)। অজাচারের ফলে সন্তান-সন্ততিরা যে পঙ্গু হয়ে যায়, বা এই অবস্থা রোধ করতে পারলে যে উপজাতির উন্নতি দ্রুততর হয়, এটা মানুষ অতি সূক্ষ্মভাবে হলেও বুঝতে পেরেছিল। একরক্ত- সম্পর্কিত পরিবার গড়ে ওঠার পেছনে এই বোধই প্রাথমিকভাবে

কাজ করে থাকবে। এঙ্গেলস এই অজাচার সম্পর্কিত ধারণাকে মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার বলে উল্লেখ করেন।

২। পুনালুয়া পরিবার :

এটিকে পরিবারের দ্বিতীয় স্তর বলে আখ্যা দেওয়া হয়। এই স্তরে শুধু সহোদর ভাই-বোনদের সাথে নয়, কাজিনদের সাথেও বিবাহ রোধ করা হল।

দলের বোনেরা তাদের সমপর্যায়ভুক্ত অন্যান্য মেয়েরা মিলে একটি পরিবারের কেন্দ্র পত্তন করে। অনুরূপভাবে পুরুষরা মিলে আর একটি কেন্দ্র পত্তন করে। এই একদল নারী এমন একদল পুরুষের সাথে মিলিত হত, যারা আর তাদের ভাই নয়। অনুরূপভাবে পুরুষরাও তাই করত। একদল বোনেদের স্বামীরা বা ভাইদের স্ত্রীরা পরস্পরকে 'পুনালুয়া' বা ঘনিষ্ঠ সাথী বলে সম্বোধন করত। এটাই বন্যাবস্থার যৌনজীবনের চরম সামাজিক রূপ।

প্রসঙ্গত, সব রকমের সমষ্টিগত পরিবারেই পিতৃপরিচয় অনিশ্চিত ছিল, কিন্তু মাতৃ-পরিচয় ছিল নিশ্চিত। সেই কারণেই সমষ্টি-বিবাহের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র মায়ের দিক থেকেই বংশ-পরম্পরা নির্ধারিত হত এবং এভাবে কেবল মাতৃধারারই স্বীকৃতি সম্ভব।

৩। জোড়বাঁধা পরিবার :

অতীতযুগের মানবপরিবারের ইতিহাস পরিবার-বেষ্টনীর ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হবার ইতিহাস। পুনালুয়া পরিবারের পর শেষ পর্যন্ত বিবাহ-সম্পর্কিত নারীপুরুষের সাথে বিবাহ রোধ করার ফলে দলগত বিবাহ ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠল এবং এর অস্তিত্ব কেবল পরবর্তী কালের উৎসবকালীন আচার হয়েই টিকেছিল অনেকদিন। পরিবার শেষ পর্যন্ত একজোড়া নরনারীতে পরিণত হল। এঙ্গেলসের ভাষায় : 'এবং সব শেষে বাকি রইল কেবলমাত্র একটি, তখনও শ্লথবদ্ধ, যুগল সেই অণু যা ভেঙে গেলেই বিবাহের পুরোপুরি উচ্ছেদ।'

পরিবারের এই রূপটি বর্বর যুগের বৈশিষ্ট্য। বন্যাবস্থার শেষে বর্বর যুগের প্রারম্ভে মানুষের উৎপাদন ব্যবস্থার পরিবর্তন হল এবং এর মাঝামাঝি জায়গায় এসে মানুষ কোথাও পশুপালন, কোথাও-বা চাষবাস শুরু করল। কিন্তু এই পরিবারের স্বতন্ত্র গৃহস্থালির প্রয়োজন ছিল না, কারণ তা ছিল অত্যন্ত অস্থায়ী ও দুর্বল বাঁধনের। তাই পূর্বের সাম্যতন্ত্রী গৃহস্থালি বা যৌথপরিবার ভেঙে যায়নি। আর সেখানে নারীদের মর্যাদারও হানি হয়নি। এঙ্গেলস দেখান, 'এ স্তরে একজন পুরুষ একটিমাত্র নারীর সঙ্গে বাস করত... অবশ্য যে কোনো পক্ষ থেকে সহজেই বিবাহ ভেঙে দেওয়া যেত এবং সন্তানেরা আগের মতো মায়েরই অধিকারভুক্ত ছিল।' কিন্তু জোড়বাঁধা পরিবারের

অনুষঙ্গ হিসেবে দেখা গেল নারীহরণ ও নারীক্রয়, কারণ সমষ্টি-বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর অভাব অনুভূত হয়নি, কিন্তু এখন নারী দুর্লভ হয়ে উঠল ।

পরিবারের এই এক-পতি-পত্নীত্ব কিন্তু নারীদেরই প্রচেষ্টার ফল । বর্বরতার প্রথম দিকে মানুষের কোনো নির্দিষ্ট খাদ্যসংগ্রহের ব্যবস্থা ছিল ন্ননতুন খাদ্যসংগ্রহ ছিল নিত্যকার ব্যাপার । আর মধ্যস্তর থেকে দেখা দিল পশুপালন ও চাষবাস । ফলে অধিক সংখ্যক লোকেরও প্রয়োজন দেখা দিল । তাই শুরু হল ক্রীতদাস প্রথা । পরাজিত গোষ্ঠীর লোকেরাই ক্রীতদাসে পরিণত হল । ফলে অত্যধিক সম্পদ বৃদ্ধি হল এবং সম্পূর্ণ নতুন সামাজিক সম্পর্ক গড়ে উঠল । এঙ্গেলস বলেন, 'জীবনযাত্রার অর্থনৈতিক অবস্থার বিকাশের ফলে অর্থাৎ আদিম সাম্যতন্ত্রী ব্যবস্থার অবনতি ও জনসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী যৌন সম্পর্কগুলো যতই তার আদিম আরণ্যক চরিত্র হারিয়ে ফেলতে লাগল, নারীদের কাছে অবশ্যই তা ততোই অধিকতর হীন ও পীড়নমূলক হয়ে উঠেছিল এবং ততই সাগ্রহে তারা পরিত্রাণ হিসেবে পাতিব্রত্যের অধিকার, একটি পুরুষের সাথে স্থায়ী বা অস্থায়ী বিবাহ প্রত্যাশা করেছিল । এই অগ্রগতি পুরুষাশ্রিত হতে পারে না, এবং অন্তত এই কারণে যে তারা কোনোদিন, এমনকি আজও, আসলে সমষ্টি-বিবাহের সুবিধা ত্যাগের কথা স্বপ্নেও ভাবে না ।'

জোড়বাঁধা পরিবারে আর একটি নতুন জিনিসের উদ্ভব হয় সেটা হচ্ছে প্রমাণ-নিশ্চিত মাতার পাশে নিশ্চিত পিতারও অবস্থান এবং আজকের দিনের যে কোনো পিতার চেয়ে ঐ পিতৃত্ব অনেক বেশি নিশ্চিত ছিল ।

সেই সময়কার শ্রমবিভাগ-প্রথা অনুসারে পুরুষ উৎপাদন ব্যবস্থার পশুযূথ, কৃষির যন্ত্রপাতি ও কৃষির নতুন হাতিয়ার ক্রীতদাসের মালিক হয়ে যায় অর্থাৎ উৎপাদনের উপকরণের মালিক । এর আগে পুরুষ ও নারীর মধ্যে শ্রমের চারিত্রিক পার্থক্য থাকলেও উভয়ের মর্যাদার তফাৎ হয়নি । কিন্তু উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নতির সাথে সাথে পুরুষের প্রাধান্য ঘটতে লাগল এবং তারা আপন ছেলেমেয়েদের সুব্যবস্থা করার জন্য বর্ধিত প্রাধান্যের সুযোগ গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ হল । তাই মাতৃধারায় বংশানুক্রম নির্ধারণের পরিবর্তন ঘটানো হল । এঙ্গেলস বলেছেন, 'মাতৃ-ধারার উচ্ছেদ-সাধন নারীজাতির বিশ্বঐতিহাসিক পরাজয়-বিশেষ ছিল । পুরুষ গৃহেও কর্তৃত্ব করে; নারী অবদমিত হয়, গোলামি স্বীকার করতে বাধ্য হয়; নারী-পুরুষের কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ ক'রে ক্রীতদাসী আর সন্তান উৎপাদনের যন্ত্রে পরিণত হয় ।'

৪ । একগামী পরিবার (বা এক পতি-পত্নী পরিবার) :

এঙ্গেলস বলেন, 'বর্বরতার মধ্যস্তর থেকে উর্ধ্বস্তরে উৎক্রমণের যুগে জোড়বাঁধা পরিবার থেকে এর উৎপত্তি; সভ্যতার সূচনার মধ্যেই এর অন্যতম চরম বিজয় চিহ্নিত । স্বামীর আধিপত্যই এর ভিত্তি; এর সুস্পষ্ট লক্ষ্য সুনিশ্চিত পিতৃত্বের সন্তান উৎপাদন । কারণ, এটি নির্ধারিত হলে তবেই সন্তানসন্ততি বিতর্কাতীত বংশধর হিসেবে যথাসময়ে

পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হবে। জোড়বাঁধা পরিবারের সাথে একগামী পরিবারের পার্থক্য এই যে, এখানে বিবাহ-বন্ধন অনেক বেশি শক্ত, কোনো পক্ষের মর্জিমতো সেটা এখন আর ভাঙা যায় না। এখন, সাধারণত কেবল স্বামীই বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারে। দাম্পত্যজীবনে বিশ্বাসভঙ্গের অধিকারী এখনও পুরুষ, অন্তত লোকাচারে তা অনুমোদিত হচ্ছে... এবং সমাজের অধিকতর অগ্রগতির সঙ্গে পুরুষেরা এই অধিকার অধিক পরিমাণে খাটাচ্ছে; যদি কোথাও কোনো স্ত্রী প্রাচীন যৌনসম্পর্ক প্রথা স্মরণক্রমেও ফিরে পাবার চেষ্টা করে, তবে সে পূর্বাপেক্ষাও কঠোরতর শাস্তির সম্মুখীন হচ্ছে।'

সভ্যতার প্রথম স্তরে এই পরিবারের পাশাপাশি দাসপ্রথার অবশিষ্টাংশ থাকার ফলে এবং পেশাগতভাবে বেশ্যাবৃত্তি শুরু হওয়ার ফলে পুরুষেরা সুন্দরী দাসী ও বেশ্যাদের ভোগ করার অধিকারী ছিল। এবং সমাজে যদি এর জন্য কোনো কলঙ্ক হত, সেটা চাঁদের কলঙ্কের মতোই পুরুষদের শোভা বর্ধন করত, আর একগামিতা অলঙ্কার হত কেবল নারীদের।

এই পরিবার যে সভ্যতার একটি অগ্রগামী পরিবার এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এই পরিবারই আবার বহন করে চলল পুরুষের বেশ্যালয় গমন ও নারীর ব্যভিচার। এঙ্গেলস এই পরিবারের ক্ষেত্রে মন্তব্য করেন, 'ব্যক্তিগত যৌনপ্রেম থেকে এই বিয়ে উদ্ভূত হয়নি, আর বস্তুত, যৌনপ্রেমের সাথে এর কোনো সঙ্গতিও নেই।... স্বাভাবিক কোনো কারণবশত নয়, স্রেফ অর্থনৈতিক কারণে অর্থাৎ আদিম যুগের স্বাভাবিক ও যৌথ ধনসম্পত্তির ওপর ব্যক্তিগত ধনসম্পত্তির জয়লাভকে ভিত্তি করে, তারই প্রথম অভিব্যক্তিরূপে এই পারিবারিক প্রথা উদ্ভূত।'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে ব্যক্তিগত যৌনপ্রেম বা ভালোবাসা এখনও বাস্তব অস্তিত্ব অর্জন করেনি।

একগামিতার মূল লক্ষ্য কী? 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, পুত্র পি প্রয়োজনম।' অর্থাৎ স্ত্রী কেবল সন্তান-উৎপাদক যন্ত্রবিশেষ, আর পুত্রের প্রয়োজন পিতার মৃত্যুর পর পিণ্ডদান করা। আসলে এই প্রয়োজন হচ্ছে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হওয়া। এ সন্তানকে নিশ্চিত করার জন্য চাই স্ত্রীর এক-পাতিব্রত্য। তাই তার চারিদিকে তোলা হয় সমাজ ও ধর্মের কঠোর প্রাচীর। স্ত্রী সতীসাধ্বী, পতিই তার পরম দেবতা, তাই সে তার ব্যক্তিগত সেবাদাসী। এই সেবাদাসীত্ব বোধটাকে বজায় রাখবার জন্য স্ত্রীদের এমন সব আচার-অনুষ্ঠান পালন করতে হত, যা ক্রীতদাসত্বেরও অধম। স্বামীদেবতা বাইরে থেকে এলে স্ত্রী শুধু তার চরণযুগল ধুইয়ে দিলেই শেষ হত না, তাকে তার মাথার চুল দিয়ে সেই পদযুগল মুছিয়েও দিতে হত। আর স্বামী হতেন লম্পট, মদ্যপ, রক্ষিতা-আসক্ত। মধ্যযুগে উচ্চবিত্ত পরিবারে পুরুষের রক্ষিতার সংখ্যা দিয়েই কৌলিন্য বিচার করা হত, আর সেই রক্ষিতারা হত পতিতা, সমাজবর্জিতা, অস্পৃশ্যা। তবুও এখানে নারীদের অধঃপতনের একটা সীমা ছিল, কিন্তু পুরুষদের অধঃপতন ছিল সীমাহীন।

তখন পুরুষেরা পায়রা ওড়াত, বুলবুলের লড়াই করাত আর দিনের পর দিন রক্ষিতার বাড়িতেই রাত কাটাত! আর দুয়ার ধরে আকুল নয়নে বিনিদ্র রাত কাটাত আর সেই সতীসাধ্বী স্ত্রী! এক স্ত্রীর মৃত্যু হলে সেই ভাগ্যবান স্বামীর আর এক স্ত্রী আসে, আর তার সাথে আসে প্রভূত ধনসম্পদ!

সমাজে বর্ণবিভাগ চালু হওয়ায় অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। এক বর্ণের সাথে অপর বর্ণের বিবাহ নিষিদ্ধ হয়। তাই যে বর্ণে নারীর সংখ্যাধিক্য ছিল সেখানে এক পুরুষের একাধিক বিবাহের অধিকার ছিল। কুলীনদের মধ্যে এই অবস্থা এমন চরমে ওঠে যে কোনো কোনো পুরুষকে শতাধিক বিবাহ পর্যন্ত করতে দেখা যায়। বহু স্ত্রীকেই সেই স্বামী চিনত না, স্ত্রী একরাতের জন্যেও স্বামীর সাথে সহবাস করত না! আর যখন সেই স্বামী চিতায় উঠত, একসাথে শতাধিক স্ত্রী হয়ে যেত বিধবা! আর বিধবাদের যে নির্যাতন ও কঠোর সংযমের মধ্যে থাকতে হত তা সকলেরই জানা আছে। নারীরা সমস্ত ই মুখ বুজে সহ্য করত, কারণ সমাজে এর কোনো প্রতিবিধান নেই বিবাহ-বিচ্ছেদের কথা তো সেখানে অজ্ঞাতই ছিল।

সামন্ততান্ত্রিক যুগে নারী-পুরুষের বিবাহ নির্ধারণ করত পিতা-মাতাই। তাদের বিচার্য বিষয় ছিল বংশ-পরিচয়, সম্পত্তি, রূপ ইত্যাদি সবকিছুই, কেবল পাত্র-পাত্রীর মতামতই বিচার করা হত না। এখানে পাত্র পিতা-মাতার অবাধ্য হলে সম্পত্তিলাভে বঞ্চিত হবার আশঙ্কা ছিল, তাই বিবাহ তাদের কাছে ছিল কর্তব্যবিশেষ। তাই সেখানে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে প্রেম-জাতীয় কিছু হঠাৎ গড়ে উঠলেও তা হত নিছকই দীর্ঘকাল সান্নিধ্যপ্রসূত কিছু ভাল-লাগা বোধ।

প্রসঙ্গক্রমে তলস্তয়ের বিশ্ববিখ্যাত উপন্যাস 'আনা কারেনিনা' নিয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। অপরূপ, কৃষ্টিসম্পন্না আনা সামন্ত্রতান্ত্রিক রাশিয়ার একটি সুপ্রতিষ্ঠিত অভিজাত পরিবারের বধূ। সমস্ত ভোজসভার সে মধ্যমণি, আর কত-যে পুরুষ তার জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার ইয়ত্তা নেই। তার একটিমাত্র পুত্রই তার ভালোবাসার ধন। সে সংসারে ও সমাজে স্বাধীনভাবে বিচরণ করে। এককথায় তার মতো সৌভাগ্যবতী, সুখী বধূ বিরল। সেই আনাই হঠাৎ একদিন ব্রনস্কি নামে জনৈক ডাকসাইটে ধনী মিলিটারি অফিসারের প্রেমে উন্মত্ত হয়ে ওঠে! ব্রনস্কিও তার প্রতি সমানভাবে আসক্ত। প্রেমের আকুল কামনায় আনা তার স্বামী, পুত্র, সামাজিক-মর্যাদা প্রভৃতি সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে তার প্রেমিকের সাথে গৃহত্যাগ করে। আনার যুক্তি ছিল্ল স্বামীগৃহে সে সবই পেয়েছে, পায়নি কেবল প্রেম। বেশ কিছুদিন প্রেমের স্রোতে ভেসে যে একটি অভাবিত অবস্থায় পড়ে। প্রথমে সে তার স্বামীর কাছে পুত্রটিকে ভিক্ষা চায়, এবং পরে ডিভোর্সের জন্য আবেদন করে তার স্বামী দুটো আবেদনই অগ্রাহ্য করে। ক্রমশ আনা সমাজে তার ন্যক্কারজনক অবস্থান সম্পর্কে অবগত হতে থাকে। এইসব নিয়ে প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। ক্রমশ আনার মনে ব্রনস্কির চরিত্র সম্পর্কে সন্দেহ জাগে ও তা ঘনীভূত হয়। সে তার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন

হতে আরম্ভ করে। এবং অবশেষে অমোঘভাবে আসে বিচ্ছেদ। এখন আনার অবস্থা কী? প্রেমের মূল্য হিসেবে সে স্বামী, পুত্র, সমাজ ত্যাগ করেছে, আর এখন সে প্রেমিক-বর্জিতা, কুলটা এবং সর্বোপরি অর্থনৈতিকভাবে নিঃস্ব। অতএব আনার আর কী করণীয় রইল? সকলের সব কিছুর অবসান ঘটিয়ে এই আত্মাভিমানিনী প্রেমিকা ট্রেনের তলায় গলা দিল! এই উপন্যাসটির মধ্যে উচ্চবিত্ত পরিবারের নারীদের স্বাধীনতার একটি প্রকৃত চিত্র পাওয়া যায়! এই স্বাধীনতা এতখানি ভিত্তিহীন ও পুরুষ-নির্ভর যে আনা বাঁচবার আর কোনো পথই খুঁজে পেল না।

আদিম সাম্যবাদী সমাজে যৌথ পরিবারের নারীরা গৃহস্থালির যে-কাজ করত তার একটি সামাজিক চরিত্র ছিল। অর্থাৎ সেই শ্রম সামাজিক শ্রম বলেই স্বীকৃতি লাভ করত, তাই সেখানে নারীদের মর্যাদার কোনো ঘাটতি হত না। কিন্তু একগামী পরিবারে নারীরা সামাজিক শ্রমের মর্যাদা থেকে বঞ্চিতা হয়ে ব্যক্তিগত দাসীতে পরিণত ছিল। নিজ সীমাবদ্ধতার মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন, 'পুরুষ প্রভু,, স্ত্রী দাসী; স্ত্রী জল তুলে, রন্ধন করে, বাটনা বাটে, কুটনা কোটে। বরং বেতনভোগিনী দাসীর কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বনিতা, দুহিতা, স্বসার তাহাও ছিল না।' (প্রাচীনা এবং নবীনা)

ধনতান্ত্রিক সমাজে অতীত ব্যবস্থার কিছু সংস্কার সাধিত হয়। ধর্মের আবরণ থেকে পাতিব্রত্যের, আনুগত্যের অন্তত আইনের আঙ্গিনায় কিছুটা শিথিলতা ঘটে। এখানে স্ত্রীরা বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকারিণী। কিন্তু আইনগত সুবিধা কেবল তাদেরই ভোগে লাগে যাদের হাতে আছে অর্থনীতির চাবিকাঠি। তাই পুরুষরাই এই সুবিধা ভোগ করে। পণ্য উৎপাদনই ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য তাই নারীরাও এই সমাজে পণ্যে পরিণত হয়। বাজারের অন্যান্য জিনিসের মতোই নারী-দেহ কিনতে পাওয়া যায়। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলো নারীদেহকে বিজ্ঞাপিত করেই তাদের উৎপন্ন দ্রব্যের জন্য জনচিত্ত আকর্ষণ করে। সেখানে নাইট ক্লাব, ক্যাবারে, ব্লু-ফিল্‌ম, পর্নোগ্রাফি, বেশ্যালয় ইত্যাদি একেবারে নগ্নভাবে বাজার ছেয়ে ফেলেছে। আর তার সাথে সাথে সমাজে দেখা দিচ্ছে নানা ধরনের যৌন-বিকৃতি, যৌন-ব্যাধি ও যৌন-অপরাধ। ধনতান্ত্রিক সমাজেও কিন্তু মূলত পুরুষরাই উপার্জনশীল, বিশেষত বিত্তবান শ্রেণীগুলোর মধ্যে। তাই তারাই পরিবারের ভরণপোষণের কর্তা। তাছাড়া উইলের মাধ্যমে সম্পত্তি বণ্টনের সুযোগ থাকায় বিবাহের ক্ষেত্রেও তাদের মতামত স্বীকৃত। ধনতান্ত্রিক সমাজে যেমন বুর্জোয়ারা শোষক ও প্রলেতারিয়েতরা শোষিত, ঠিক তেমনি পরিবারের ক্ষেত্রে পুরুষ হচ্ছে বুর্জোয়া সমাজ, নারীদেহ পণ্য ছাড়া আর কিছু নয়। এঙ্গেলস মন্তব্য করেন, 'স্ত্রীর সঙ্গে সাধারণ পতিতার পার্থক্য এটুকু যে সে ভাড়াটে মজুরের মতো নিজের দেহ ভাড়া খাটায় না, বরং সে দেহটি বিক্রি করে চির-দাসত্বে।' একগামী পরিবার হচ্ছে সমাজেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ বা একক।

পরিবারের এই দাসত্বের বন্ধনকে ভেঙে ফেলার জন্য সমাজের মধ্যে শ্রেণীবিদ্রোহের মতোই বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত যৌনপ্রেমের দাবি

সেই বিদ্রোহেরই অন্যতম রূপ। এঙ্গেলস দেখান, 'এই সময় যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা দাঁড়ায় তাতে একগামিতার শ্রেষ্ঠ অবদান ব্যক্তিগত যৌনপ্রেম এই প্রথার ভেতরে, এর সঙ্গে সমান্তরালভাবে, প্রয়োজনমতো এর সঙ্গে বিরোধিতা করেও মাথা তুলবার অবকাশ পায়। দুনিয়ায় এতদিন এই ব্যক্তিপ্রেম অজ্ঞাতই ছিল।'

অর্থাৎ একগামী পরিবারের মধ্য দিয়েই এই প্রেম নামক আবেগটি মানব-মনে স্থান পায়। এটি মানুষের কোনো প্রবৃত্তি নয় বরং সমাজলব্ধ গুণ। মানুষ সামাজিক প্রাণী, পৃথিবীর উন্নততম প্রাণী। সামাজিক অর্থনীতি ও তার বিকাশের সাথে সাথে সে তার স্বীয় প্রকৃতিরও বিকাশ ঘটাতে থাকে। সমাজকে সুশৃঙ্খল ও সুগঠিত করার জন্য সে যে কেবল কিছু সামাজিক রীতিনীতির প্রবর্তন করল তা-ই নয়, সে তার প্রবৃত্তিসমূহকেও সমষ্টির স্বার্থে সংযত করল, নিয়ন্ত্রিত করল। আর এখানেই প্রাণীদের চেয়ে তার শ্রেষ্ঠত্ব। প্রাণীরা প্রবৃত্তির দাস হয়েই রইল আর মানুষ সেই দাসবৃত্তি ছেড়ে বরং প্রবৃত্তিকেই নিজের দাস করতে উদ্যত হল। তাই যখন সমাজে ব্যর্থ-প্রেমের হতাশায় দেবদাসে পরিণত হওয়া, আত্মহনন, জিঘাংসা প্রভৃতির আধিক্য ঘটার সাথে সাথে যৌন-ব্যাধি, যৌন-ব্যভিচার ও দেহব্যবসার আধিক্য ঘটতে থাকে এবং একটি পূর্বরাগের মধ্য দিয়ে বিবাহের পরই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সন্দেহ, মনোমালিন্য, তিক্ততা, বাড়তে থাকে তখন স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, মানুষ কি এখনও সভ্যতার পথে এগিয়ে চলেছে?

চার.

প্রেমের সংজ্ঞা নিয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিতর্কের মধ্যে না গিয়েও একটা কথা অবশ্যই বলা যায় যে এক পতি-পত্নী পরিবারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তিগত যৌনপ্রেমের উদ্ভব হবার অন্যতম কারণই হচ্ছে ইতিহাসে এই প্রথম একজন নারী ও পুরুষ একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে দীর্ঘদিন ধরে পরস্পরের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেল। যৌথ বিবাহের স্তরে এই সুযোগের তেমন অবকাশ ছিল না। দীর্ঘদিন ধরে পরস্পরের সান্নিধ্য লাভের সুযোগই প্রেমের বিকাশের অন্যতম পূর্বশর্ত। অবশ্য এর সাথে সৌন্দর্যবোধ, পরস্পরের মানসিকতার পরিপক্কতা ও অন্যান্য মানবিক গুণাবলির বিকাশের স্তরও বিশেষ বিবেচনার অপেক্ষা রাখে, যেমন স্নেহ, মায়া-মমতা, সেবাপরায়ণতা, শৌর্য-বীর্য, শ্রদ্ধা ইত্যাদি। সুতরাং 'দর্শনমাত্র প্রেম', 'প্রথম দর্শনে প্রেম', 'শ্রবণে প্রেম' প্রভৃতি কথাগুলো যতই মধুর হোক-না কেন তা সেই পূর্বশর্ত পূরণ করে না, তাই তা নিছকই কামনা বা লালসার নামান্তর। কারণ প্রথম দর্শনে কেবল বাহ্যিক রূপটুকুই মানুষের চোখে ধরা পড়ে, তার গুণাবলির কোনো প্রকাশই সেখানে ঘটবার সুযোগ থাকে না। মানুষের যৌন-কামনার সাথে বাহ্যিক বা শারীরিক রূপের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্যের ধারণাটি মানুষ ইতিহাসগতভাবে অর্জন করে এবং তার কতগুলো আঞ্চলিক, সামাজিক নিরিখ আছে, যা তার মনে একটা স্থায়ী ছাপ ফেলে রাখে এবং

মানুষ চেতন বা অবচেতন মনে সেই ছাপের অনুরূপ ব্যক্তিটিকে পাবার বা ভোগ করার কামনা করে। ক্ষণিকের দর্শনে বা প্রথম দর্শনে সেই পূর্বসঞ্চিত ধারণাটি নাড়া খায়, আর তাকেই সাধারণত প্রেম বলে আখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু সমাজে প্রেমের জন্মের পেছনে যে মূল কারণ সেই দীর্ঘদিনের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ তা এখানে অনুপস্থিত। তাই একে প্রেম আখ্যা দেওয়া হবে এক বিশেষ ধরনের সংকীর্ণতা। প্রাক্‌বিবাহ পূর্বরাগ, যাকেই সাধারণ অর্থে প্রেম বলা হয়ে থাকে, পরবর্তী জীবনে একটি একনিষ্ঠ পরিবার গঠনেরই পরিকল্পনা বা স্বপ্নের স্তর। তারও বিকাশ ঘটে সেই দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের মধ্য দিয়েই। কিন্তু এই সান্নিধ্য দীর্ঘস্থায়ী হবার পূর্বশর্তগুলো কী? সেগুলো অবশ্যই নারী-পুরুষের সমানাধিকার, স্বাধীনতা ও পরস্পরের প্রতি সম্মানবোধ। রবীন্দ্রনাথ ঠিক এই কথাটাই বলেছেন একটু অন্যভাষায় 'ত্যাগের সঙ্গে প্রেমের ভারী একটা সম্বন্ধ আছে এমন সম্বন্ধ যে কে আগে কে পরে তা ঠিক করাই দায়। প্রেম ছাড়া ত্যাগ হয় না আবার ত্যাগ ছাড়া প্রেম হতে পারে না। যা আমাদের কাছ থেকে প্রয়োজনের তাগিদে বা অত্যাচারের তাড়নায় ছিনিয়ে নেওয়া হয় সে তো ত্যাগই নয় আমরা প্রেমে যা দিই তাই সম্পূর্ণ দিই...।' (*প্রেম*, রবীন্দ্র রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড)। এখানে ত্যাগ বলতে স্বার্থত্যাগের কথাই বলা হয়েছে যার দ্বারা পরস্পরের অধিকারকে স্বীকার করা ও মর্যাদা দেওয়া হয়, পরস্পরের স্বাধীনতার ভিত্তির ওপরে জীবনের পদক্ষেপ ফেলা হয়। প্রাকবিবাহপ্রেমের মধুর আলাপনের আবেগে প্রেমিক-প্রেমিকাকে স্বাধীনতা, সমানাধিকার ও স্বার্থত্যাগের যেসব মৌখিক প্রতিশ্রুতি দেয়, বাস্তব জীবনে খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তা লঙ্ঘিত হয়। এর প্রধান কারণই হচ্ছে পুরুষ-শাসিত সমাজের মূল চাবিকাঠিটি গচ্ছিত থাকে পুরুষেরই হাতে। আর নারীর আঁচলে বাঁধা থাকে যে চাবির গোছা তা দিয়ে আর যাই হোক সেই 'চিচিং ফাঁক' মন্ত্রটি খুঁজে পাওয়া যায় না যা দিয়ে গুপ্তধনের পথের সন্ধান পাওয়া যায়। এই স্বাধীনতা শব্দটার একটি স্থূল অর্থ বাজারে চালু আছে সেটা হচ্ছে চলাফেরার স্বাধীনতা। পশ্চিমি দুনিয়ার নারীদের যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তার উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাদেরকে স্বাধীনভাবে ভোগ্য করে তোলার স্বাধীনতা। আর এদেশে নারীদের যে স্বাধীনতা আছে তা আসলে বিদ্যাসাগরের সেই কুকুরটির স্বাধীনতা, যার গলার রয়েছে গলবন্ধের দাগ।

স্বাধীনতার মর্মকথাটি লুকিয়ে আছে অর্থনীতির ওপরে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক ও তার সাথে সাথে সামাজিক স্বাধীনতা। আগেরটি হলে পরেরটি হতে বাধ্য কিন্তু আগেরটি না-হলে পরেরটি হবে না। পুরুষশাসিত সমাজের মতোই পরিবারের অর্থনীতি কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে পুরুষদেরই হাতে। অর্থাৎ পুরুষ সমাজ ও গৃহ এই দুয়েরই কর্তা। সুতরাং এখানে স্বাধীনতার বুলিটি যে কত শুকনো তা সহজেই অনুমেয়। অকেনেরই ধারণা যে-নারী অর্থ উপার্জন করে সে স্বাধীন। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা কি তাই? উপার্জনশীলা নারী অন্যদের তুলনায় কিছুটা সচ্ছলতায় থাকে ঠিক কথা, কিন্তু যে-

সমাজে এখনও নারীদের একা থাকা শুধু নিন্দিত নয় অসম্ভবও বটে, যেখানে অবিবাহিত অবস্থায়
সন্তানধারণই ব্যভিচারের একমাত্র মাপকাঠি, সে-সমাজে তাকে তো পুরুষের ছত্রছায়ায় থাকতেই হবে। আর পুরুষও নারীদের এই নির্ভরশীলতা সম্পর্কে সচেতন, তাই তার পূর্ণ আধিপত্য থাকে নারীর ওপর।

এখানে নারীদের দেহগত শুচিতা বা সতীত্ব (chastity) সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে। দেহগত শুচিতা যদি সমাজের পক্ষে মঙ্গলকরই হয়, তবে তা শুধুমাত্র নারীদেহের ওপরে না-বর্তিয়ে নারী ও পুরুষ উভয়ের ওপর বর্তানো উচিত। কিন্তু পুরুষ-শাসিত সমাজে যে কেবল নারীদের সতীত্বের ওপরেই প্রাধান্য-গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, তারও পেছনে কাজ করে পুরুষদের সঠিক উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠার প্রশ্নটি এবং সাথে সাথে নারীদেরও পরাধীন রাখার প্রশ্নটি। বিভিন্ন ধর্মীয় কাহিনী, উপাখ্যান প্রভৃতিতে সতীত্বকে এমনভাবে গৌরবান্বিত করা হয়েছে এবং সমাজে দেহগত শুচিতার প্রশ্নটি এমনভাবে বংশপরম্পরায় পরিবাহিত হয়েছে যে তাতে নারীরা নিজেরাও এই সতীত্ব বা দেহগত শুচিতার সংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং তারাই এর অন্যতম ধারক-বাহকে পরিণত হয়। অর্থাৎ অর্থনীতিগতভাবে পরাধীনতার বেড়ি তো পড়েছেই নারীদের পায়ে, সামাজিক সংস্কারেরও হাতকড়া পড়েছে তাদের হাতে। অর্থাৎ কেবলমাত্র তারাই বাঁধা পড়েছে আষ্টেপৃষ্টে।

বুর্জোয়ারাই সর্বহারাদের জন্মদাতা, আবার এই বুর্জোয়ারাই তাদের নিষ্পেষণ ও নির্যাতন করে তাদের পূর্ণ বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। অনুরূপভাবে এই বুর্জোয়া শ্রেণীই ব্যক্তিগত যৌনপ্রেমের বিকাশের প্রধান সহায়ক শ্রেণী, আবার এই শ্রেণীই প্রকৃত প্রেমের বিকাশের প্রধান অন্তরায়। এই হেঁয়ালীর উত্তর কী? কারণ বুর্জোয়ারা জানে যে নরনারীদের মধ্যে প্রেমের প্রকৃত বিকাশ ঘটলে যে শক্তির সৃষ্টি হবে তা এই সমাজ-ব্যবস্থার মূলেই কুঠারাঘাত করবে। কারণ নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দানের প্রশ্নটির সাথে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোর একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। পুরুষ-শাসিত সমাজে পুরুষদের যে সুবিধাজনক অবস্থান, পুরুষরা কখনই তা স্বেচ্ছায় ত্যাগ করতে চাইবে না। কারণ তা করতে গেলেই অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধন করতে হবে, যার মূল কথা হল ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ ও সামাজিক মালিকানার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এরই বিরুদ্ধে নারীরা, বিশেষ করে উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশের নারীরা বিদ্রোহ করে এবং তা ‘ওম্যান লিব’ ইত্যাকার বিকৃত পথ গ্রহণ করে। উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলোতে ভৎবব ংবী-এর তত্ত্বের আড়ালে প্রেমকে করে তুলছে উচ্ছৃঙ্খল, তার সুস্থ বিকাশের পরিপন্থী। আর আমাদের মতো আধা-ধনতান্ত্রিক দেশগুলো এই কাজই করছে আরও স্থূলভাবে পূর্বরাগকে সামাজিকভাবে নিন্দনীয় করে তুলে। অর্থাৎ যে দুজন পরস্পরকে বাকি জীবনের জন্য দেহমন দেবে তারাই পরস্পরকে চিনে নেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। অর্থাৎ দুই দেশেই প্রেমের সুস্থ

বিকাশের পথ রুদ্ধ। কিন্তু এই নিষেধের বিরুদ্ধেই মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাই প্রেমিক-প্রেমিকারা নানা রকম গোপনীয়তা, মিথ্যা, ছলাকলার আশ্রয় নেয়। আর স্বপ্ন দেখে সেই স্বর্গরাজ্যের, যেখানে তাদের প্রেম হবে সমস্তরকম বাধামুক্ত।

এই সমাজে যেমন পুরুষেরা তাদের সুবিধাজনক অবস্থান সম্পর্কে সচেতন, নারীরাও তেমনি তাদের পরাধীন, নির্ভরশীলতার অবস্থান সম্পর্কে সচেতন! সবলের সাথে দুর্বলের, ধনীর সাথে দরিদ্রের বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার সময়, দ্বন্দ্ব, সংশয় তো পরবর্তী জনের পক্ষেই স্বাভাবিক। অনুরূপভাবে প্রাক্‌বিবাহ পূর্বরাগ ও দাম্পত্যজীবনে নারীরা সদাশঙ্কিত, আতঙ্কের আবরণে নিজেদের বিকাশকে করে রুদ্ধ। এ আশঙ্কা কিসের? পুরুষের বিশ্বাসহানির, ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার আশঙ্কা। সমাজের প্রতিটি নারীই নিজ অভিজ্ঞতাবলে পুরুষদের বিশ্বাসহীনতা ও নিজেদের নিরাপত্তায় বিপদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। তাই প্রাক্-বিবাহ প্রেমে পুরুষদের যতখানি উদ্দামতা থাকে, তীব্রতা প্রকাশ পায়, নারীদের ততখানি থাকে না। আত্ম-সংযমের আবরণে তারা নিজেদেরকে আবৃত করে রাখে। ইচ্ছা থাকলেও প্রেমাস্পদের কাছে তারা নিজেদের দেহমন উজাড় করে দিতে পারে না, ফলে সেই প্রেম, প্রেম হয়ে ওঠে না, যা পরাধীনতারই নামান্তর মাত্র।

এই সংযম বা আত্ম-অবদমনের বর্ম নারীরা ধারণ করে কেবল আত্মরক্ষার জন্য। পুরুষের অবিরাম প্রলোভন ও প্রবঞ্চনার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য নারীরা নানা রকমের ছলাকলার আশ্রয় নেয়, তাদের চরিত্র হয়ে ওঠে দুর্জ্ঞেয়। রহস্যময়তাকে নারীরা এমনভাবে রপ্ত করে যে তা প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়ে যায় নারীচরিত্র বোঝা দেবতারই অসাধ্য, মানুষ তো কোন ছার, নারীরা সর্পতুল্যা ইত্যাদি। কিন্তু কেন-যে এই রহস্যময়তা, কেন যে তাদের চরিত্র এমন দুর্বোধ্য, তা বিচার করা হয় না। প্রেমিক-প্রেমিকারা প্রাক্‌বিবাহ পূর্বরাগে যে সুখী পরিবারের স্বপ্নের জাল বোনে (বস্তুত পূর্বরাগই হচ্ছে ভবিষ্যৎ পরিবার গঠনের পাঠশালা) বাস্তবজীবনে তা যে কিভাবে ভেঙে চুরমার হয়ে যায় তা তারা নিজেরাও অনেক সময় বুঝতে পারে না। এই সমাজের একজন বিবেকবান শ্রেণীসচেতন পুরুষ না-চাইলেও তার অবচেতনে মনে নারীদের ওপর আধিপত্যের অধিকারবোধ কাজ করে যা থেকেই তার মনে আসে উচ্চমন্যতা (superiority complex) আর নারীদের মনে কাজ করে হীনমন্যতা (inferioity complex)। আর তার সাথে সাথে বুর্জোয়া সমাজের ক্রমবর্ধমান সঙ্কট, আপাত দুর্বোধ্য ও দুর্ভেদ্য সমস্যাবলির জটিল জাল মিশে তাদেরকে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে ফেলে যে, উভয়ের সদিচ্ছা থাকলেও সেইগুলো থেকে তারা মুক্তি পায় না; ফলে দেখা দেয় বিচ্ছিন্নতাবোধ, একঘেয়ে ভোঁতা জীবনযাত্রা। আর উভয়েই হয়ে পড়ে হতাশাক্লিষ্ট, ক্লান্তকোনোমতে দিনগত পাপক্ষয় করা। এই পারিবারিক জীবনে তাই শত সহস্র বিচ্ছেদ ঘটছে, হয়তো তার প্রকাশ ঘটছে কদাচিৎ।

পূর্ববর্তী আলোচনাসমূহ থেকে আমরা দেখতে পাই যে যৌনপ্রেমের স্বাধীন বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হচ্ছে : প্রথমত, সমাজে পুরুষের হাতে সম্পত্তির

মালিকানা, যা থেকে জন্মেছে তাদের কর্তৃত্বাধিকার ও নারীর নির্ভরশীলতা; দ্বিতীয়ত, সামাজিক শ্রমের মর্যাদা থেকে নারীজাতিকে বঞ্চিত করে তাকে ব্যক্তিগত দাসীতে পরিণত করার সামাজিক ব্যবস্থা; তৃতীয়ত, সম্পত্তির নিশ্চিত উত্তরাধিকারী সৃষ্টি করার কামনা।

ধনতন্ত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান সর্বহারাশ্রেণীর সৃষ্টি। এই শ্রেণী এমন এক শ্রেণী যারা তাদের শ্রম-শক্তিকে পণ্য করে জীবনধারণ করে এই শ্রমশক্তিটুকু ছাড়া তাদের আর কোনো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নেই। তাই নিশ্চিত উত্তরাধিকারী সৃষ্টির সমস্যাও এই শ্রেণীর মধ্যে অনুপস্থিত। তাছাড়া বৃহৎ শিল্পের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে নারীদের সামনে পারিবারিক তাগিদেই সেই শিল্পকর্মে নিযুক্ত হবার সুযোগের ফলে তারাও তাদের পুরুষদের মতোই সামাজিক শ্রমের মর্যাদার অধিকারিণী হয়। তাই স্বীকৃত হোক আর না হোক, একমাত্র সর্বহারাশ্রেণীই প্রকৃত স্বাধীন প্রেমের আনন্দ উপভোগ করে, শুধুমাত্র দারিদ্র্য, অভাব-জনিত কষ্টটুকুই যা অন্তরায় হয়। এখানে নারী-পুরুষের সমানাধিকার স্বীকৃত কেবল অতীত পুরুষাধিপত্যের স্মৃতির কিছু অভিব্যক্তি ছাড়া। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজে এই সামাজিক শ্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পূর্ণ সুযোগ নয়, কারণ নারী যদি তা করতে যায় তবে গৃহস্থালির কর্মে অংশগ্রহণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। আর পারিবারিক কর্মে নিযুক্ত হলে উৎপাদনে অংশ নিতে পারে না। এ অসুবিধা শুধু শ্রমিকশ্রেণীর নারীর ক্ষেত্রেই নয়, সকল শ্রেণীর নারীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

যখন সমাজ-বিপ্লবের মাধ্যমে উত্তরাধিকারযোগ্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত হবে, তখন এসব সমস্যা সর্বনিম্ন স্তরে অবনত হবে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে, যেহেতু একগামিতা অর্থনৈতিক কারণসঞ্জাত তাই সেসব কারণের অবসানের পর সমাজের একক এই একগামী পরিবার-প্রথা কি লুপ্ত হবে? এঙ্গেলস বলেন, 'সঙ্গতভাবেই বলা যায় যে, প্রথাটির লোপ না হয়ে বরং এর পূর্ণতর প্রতিষ্ঠাই শুরু হবে। কারণ, উৎপাদনের উপায়গুলো সমাজের সম্পত্তি হওয়ায় মজুরি-শ্রম, প্রলেতারিয়েতের অস্তিত্ব লোপ পাবে এবং সেই সঙ্গে সমাজের কিছুসংখ্যক নারীর (গণনাযোগ্য) পক্ষে অর্থের জন্য আত্মদানের আবশ্যকতাও আর থাকবে না। গণিকাবৃত্তি লুপ্ত হবে; আর একগামিতা ক্ষয় না পেয়ে শেষ পর্যন্ত পুরুষদের পক্ষেও সত্য হয়ে উঠবে।'

উৎপাদনের উপকরণের সামাজিকীকরণের সাথে সাথে ব্যক্তিগত পরিবারগুলো সামাজিক সত্তা অর্জন করবে। ব্যক্তিগত গৃহস্থালির স্থলে দেখা দেবে সামাজিক শ্রমক্ষেত্র। শিশুর প্রতিপালন ও শিক্ষা হবে সামাজিক ব্যাপার। শিশু বিবাহ-জাত বা বিবাহবহির্ভূত যাই হোক-না কেন, তার দায়িত্ব নেবে সমাজ। সুতরাং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তাহীনতা, যার অভাবের জন্য নারী তার প্রেমিকের কাছে সম্পূর্ণ আত্মদান করতে অক্ষম ছিল, সে অবস্থা লোপ পাবে। কিন্তু তার অর্থ কখনই যৌন-উচ্ছৃঙ্খলতা বা ব্যভিচার নয়। একগামী পরিবারের মধ্যে যে ব্যক্তিগত যৌনবিকাশের সম্ভাবনা লাভ

করবে আর সেটাই হবে তখন সঙ্গী নির্বাচনের প্রধান মাপকাঠি। আবার বিবাহ-বন্ধনের অচ্ছেদ্যতা গড়ে উঠেছিল একগামী পরিবার গঠনের অর্থনৈতিক অবস্থা থেকে। কিন্তু সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে বিবাহ-বন্ধনের শিথিলতাও প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দেবে। প্রেমভিত্তিক বিবাহই যদি নীতিসিদ্ধ হয় তবে বিবাহ ততক্ষণই নীতিসিদ্ধ, যতক্ষণ তা প্রেমসিক্ত। আবার ব্যক্তিগত যৌনপ্রেমের অনুভূতির স্থায়িত্ব ব্যক্তিভেদে বিভিন্ন হতে পারে, তাই প্রেমের অবলুপ্তি বা অধিকতর প্রেমাবেগ যদি কারোও মনে ঘটে তবে সেই বিবাহ-বিচ্ছেদ স্বামী-স্ত্রী ও সমাজের পক্ষে মঙ্গলকরই। ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিলোপে অর্থাৎ সমাজতন্ত্র ও তার পরবর্তী সমাজে নরনারীর সম্পর্কের বিষয়ে এঙ্গেলস বলেন

'অতএব পুঁজিবাদী উৎপাদনের আসন্ন বিলোপের পর কিভাবে যৌনসম্পর্ক পরিচালিত হবে, সে বিষয়ে আমরা এখানে যে আন্দাজ করতে পারি সেটা প্রধানত নেতিমূলক চরিত্রের, কেবলমাত্র কী কী লোপ পাবে তাতেই তা সীমাবদ্ধ। কিন্তু এতে নতুন কী কী যুক্ত হবে? তা দেখা যাবে নতুন পুরুষ গড়ে ওঠার পর, এমন সব পুরুষ যাদের কখনও পয়সা বা অন্য কোনো সামাজিক ক্ষমতা দিয়ে নারীক্রয়ের কারণ ঘটেনি, আর এমন সব নারী, যারা সত্যকার প্রেমের অনুভূতি ছাড়া আর কোনো কারণে পুরুষের কাছে আত্মদানে কখনও বাধ্য হয়নি, অথবা যাদের কোনো অর্থনৈতিক পরিণতির ভয়ে প্রণয়পাত্রের কাছে আত্মদানে বিরত হতেও হয়নি। একবার এ ধরনের মানুষ জন্মালে আর তাদের যথাকর্তব্য সম্পর্কে আমাদের ভাবনায় তারা বিন্দুমাত্র বিচলিত হবে না, তারা নিজেদের আচার এবং তদুপরি ব্যক্তি-আচরণের পক্ষে উপভোগ্য জনমত চালু করবে এবং এটুকুই।'

রাইসুর কবিতা কি কলাকৈবল্যবাদী?

....

শ ও ক ত হো সে ন

বইয়ের নাম	:	হালিকের দিন
বইয়ের ধরন	:	কবিতার বই
কবি	:	ব্রাত্য রাইসু
প্রকাশকাল	:	ফেব্রুয়ারি ২০১২
প্রকাশনী	:	পুনর্মুদ্রণ যন্ত্র
প্রকাশক	:	ব্রাত্য রাইসু
প্রচ্ছদ	:	ব্রাত্য রাইসু
পৃষ্ঠা সংখ্যা	:	৯৬
মূল্য	:	৪০০ টাকা
উৎসর্গ	:	যেন আমি ভিনদেশে আলপথে বিকেল বেলায়

বাংলাভাষায় স্যাটায়ারধর্মী বা শ্লেষাত্মক কবিতা কয়েক দশক ধরে স্বল্প মাত্রায় রচিত হলেও নব্বই-এর দশকে এ-ধরনের কবিতা চর্চার আধিক্য চোখে পড়বার মতো। নব্বইয়ে যারা এই ধারার কবিতা মোটাদাগে চর্চা করেছেন এবং যারা নিজের কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য গড়ে তুলেছেন স্যাটায়ার বা শ্লেষের রক্ত-মাংস-হাড় দিয়ে; এদের মধ্যে ব্রাত্য রাইসু, মাতিয়ার রাফাসেল, শাখাওয়াৎ টিপু, ডেভিড সজ্জ্বল বিপ্লব, অংশত রহমান হেনরী অন্যতম। কারও কারও মতে, এখানে উল্লেখকৃত নামগুলোর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যের কবিতায় যিনি তুলনামূলক অধিক পরিশ্রমী ও সিদ্ধহস্ত তিনি ব্রাত্য রাইসু। বাংলাদেশে তো বটেই এমনকি বাংলা কবিতার পুরো জমিনের যে-অংশটুকু জুড়ে

শ্লেষাত্মক কবিতার বিস্তার দেখা যায়, এর মধ্যে বাংলাদেশের নব্বইয়ের কবিতা সবচেয়ে চাক্ষুষ হয়ে ওঠে।

নব্বইয়ে পশ্চিম বাংলায় কিন্তু এ-ধরনের কবিতা উল্লেখযোগ্য মাত্রায় চর্চা হয়নি। বাংলাদেশে অন্যান্য দশকেও এই ধারাটি নিয়ে বিশেষভাবে চর্চা হয়নি। এ-ব্যাপারে অনেকদিন আগে হযরত রাইসুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনার কবিতায় সবসময় এভাবে বাঁকা করে কথা বলেন কেন? এই শ্লেষ কার পক্ষে আর কার বিপক্ষে?" কবি রাইসু জবাব দিয়েছিলেন, "যখন কে শত্রু আর কে মিত্র সেটা পরিষ্কার করে ধরা যাচ্ছে না, কিংবা যখন নিজের শত্রু নিজেই তখন স্যাটায়ার বা শ্লেষ ছাড়া আর কী-ই-বা করার থাকে! এই শ্লেষ যেন নিজেকে নিয়েই নিজের।" ব্রাত্য রাইসু'র বলা কথাটুকু দিয়ে তার না-বলা আরও অন্যান্য কথাগুলোও আমি সেদিন বুঝে উঠতে পেরেছিলাম; দুনিয়া গ্রাস করে রেখেছে যে-সাম্রাজ্যবাদ-আধিপত্যবাদ, তারই বিরুদ্ধে প্রতীকী রূপায়ণ ঘটেছে রাইসু'র কবিতায় বাস্তব যাপন করতে গিয়ে নিজেকে যেখানে সেই গ্রাসের মুখে ঠেলে দেয়া ছাড়া অন্য উপায় থাকে না, সেখানে নিজেকেও শ্লেষ করে রাইসু তার কবিতায় সার্থক হয়ে ওঠেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় নব্বইয়ের কবি চঞ্চল আশরাফ, টোকন ঠাকুর প্রমুখ কবিদের থেকে রাইসু এই জন্য আলাদা যে, উল্লিখিত দুই কবির কবিতায় বিশ্বের প্রথম যে-সমস্যা সাম্রাজ্যবাদ, সেই বিষয়ের বিরুদ্ধে বিন্দুমাত্র অবস্থান নেই। কাজেই অধিকাংশ কবির কবিতার মতো চঞ্চল ও টোকনের কবিতা কলাকৈবল্যবাদী; পক্ষান্তরে ধনিক-শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্লেষনিসৃত মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় জারিত রাইসু'র কবিতা।

দুই.

ব্রাত্য রাইসু তখন দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকায় সাহিত্য পাতায় নির্মলেন্দু গুণের সহযোগী হিসেবে কর্মরত; আমি তখন পুরান ঢাকার পাতলা খান লেনের একটি মেসে থাকি, পুঁথিঘর লি.-এ চাকরি করি পাশাপাশি মনের বিরুদ্ধে এম.কম সমাপ্তির শেষ ধাক্কাটা পোহাচ্ছি। সব কিছুর সঙ্গেই কবিতা চলছে সমান তালে আমার নানাবিধ কষ্টের অঝোর ফোঁটাগুলোকে কবিতার উপাদান করতে পারায় প্রতিটি বিন্দু কবিতায় গেঁথে দিতে লাগলাম। দিনভর যখন যেখানে যে-অবস্থায় থাকি দু'হাতে কবিতা লিখে যাচ্ছি; কোনো বিশেষ মানদণ্ডের তোয়াক্কা না-করে প্রতিদিন ডজন কবিতা না-লিখে ঘুমোতে যেতাম না; সেই সব কবিতা থেকে অন্যান্য পত্রিকার মতো দৈনিক বাংলাবাজারের সাহিত্য পত্রিকায়ও ডাকযোগে কবিতা পাঠাতাম; তখন ব্রাত্য রাইসু'র সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না। কয়েকবার কবিতা পাঠানোর পর একদিন দেখলাম অপরিচিত হওয়া সত্ত্বেও রাইসু বাংলাবাজারে আমার কবিতা ছেপেছেন। এভাবে পরপর আমার কয়েকটি কবিতা বাংলাবাজারে ছাপা হওয়ায় আমার মধ্যে এক ধরনের প্রশ্ন তৈরি হয়, কে আমার কবিতা ছাপছেন?

এর কিছুকাল পরে শাহবাগ আজিজ সুপার মার্কেটে বসে আমার এক পরিচিত জন দূর থেকে দেখিয়ে বলল, ঐ লোকটি বাংলাবাজার পত্রিকার সাহিত্য পাতা দেখেন; বিষয়টি জানার পর বেশ আগ্রহ নিয়ে সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি বাংলাবাজার পত্রিকার সাহিত্য পাতার দায়িত্বে আছেন? রাইসু আমার কথার জবাব না-দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে দেয়, আপনার নাম কী? আমি বলি, শওকত হোসেন, বাংলাবাজারে আপনি আমার কয়েকটি কবিতা ছেপেছেন। জবাবে বলল, আপনার বোধহয় কিছু বিল জমা আছে গিয়া নিয়া আইসেন। আমি বললাম-কত? রাইসু বললেন, মোট কত তা মনে নাই, তবে প্রতিটি কবিতার জন্য পঞ্চাশ টাকা কইরা। সংক্ষিপ্ত আলাপ শেষে বিদায় নেয়ার উদ্দেশ্যে আমি হ্যান্ডশেক করবার জন্য হাত বাড়িয়ে দেই; রাইসু কিন্তু হাত এগিয়ে দিল না, আমাদের হ্যান্ডশেক্ড হল না; আমি এ-ধরনের আচরণের সঙ্গে পূর্বে পরিচিত ছিলাম না, স্বাভাবিকভাবেই আমার মুখ ম্লান হয়ে আসে। আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি হাত বাড়াচ্ছেন না যে! রাইসু বলল, "আমার সর্দি, আামি চাই না হ্যান্ডশেকের কারণে আমার ভাইরাস আপনার মধ্যে সংক্রামিত হোক।"

আমি বুঝে নিলাম আমার কবিতা ছাপলেও লোকটি খুব একটা যুতের নয়। পরে বিষয়টি নিয়ে আমার পরিচিত কারও কারও সঙ্গে আলাপ করে জেনেছি লোকটি নাকি এরকমই। এরপরে ব্রাত্য রাইসু'র সঙ্গে যখনই দেখা হত তখনই আমাকে অদ্ভুতভাবে 'বস' সম্বোধন করত কিন্তু হ্যান্ডশেক আর করা হয়ে ওঠে না। অবশ্য আরও পরে এসে হ্যান্ডশেক না-করার রেওয়াজ ভেঙে গেল কিন্তু 'বস' সম্বোধন করা এখনও অব্যাহত আছে। এই 'বস' সম্বোধন কেবল আমার ক্ষেত্রে নয়, ছোট-বড় প্রায় সবাইকে সম্ভবত এই সম্বোধনটি সে করে থাকে। শুনেছি, ষাটের কবি আবুল হাসানও সবাইকে 'বস' সম্বোধন করতেন।

এর অনেক পরে আমি যখন আবৃত্তিকার কামরুল হাসান মঞ্জুর প্রতিষ্ঠান ম্যাস-লাইন মিডিয়া সেন্টারে চাকরি করি তখন ব্রাত্য রাইসু'র প্রথম কবিতার বই 'আকাশে কালিদাসের লগে মেগ দেখতেছি' এবং মাশরুর আরেফিন-এর একটি কবিতার বই ছাপার দায়িত্ব পড়ে আমার ওপর। রাইসু'র কবিতা আগে বিচ্ছিন্নভাবে পড়েছি তবে একসঙ্গে তার অনেকগুলো কবিতা পাওয়ায় প্রথম বই প্রকাশের আগেই তার পাণ্ডুলিপির প্রায় সবগুলো কবিতা পড়ে ফেলেছিলাম; সে-সব কবিতার চার-পাঁচটি বাদে বাকিগুলো আমার তখন খুব একটা ভালো লাগেনি। এর কারণ হিসাবে মনে হয়েছে রাইসু'র কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য স্যাটায়ারধর্মিতা হলেও তার চার থেকে পাঁচটি কবিতা গভীর চিন্তাসমৃদ্ধ এবং শিল্প-মানদণ্ডে উত্তীর্ণ। তাঁর অধিকাংশ কবিতাই চিন্তায় অগভীর, শিল্পমানে স্থূল এবং শ্লেষ সৃষ্টির প্রতিবেশ নিম্নমানের। তবে রাইসু'র কবিতাকে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে বিচার করে দেখেছি, তাঁর অধিকাংশ কবিতা নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদী রক্তচোষা দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে। তিনি যেই সমাজে বাস করেন, সেই

সমাজের নিষ্পেষিত শোষিত শ্রেণির পক্ষে তার পরিচ্ছন্ন অবস্থান; এই অবস্থান কুয়াশাচ্ছন্ন নয়, একেবারেই মূর্ত এবং সেটা প্রমাণিত হয় যখন এই সমাজেরই ধনিক শ্রেণিকে নিয়ে তিনি প্রতীকীভাবে শ্লেষ করেন, ঠাট্টা-উপহাস করেন।

তিন.

একুশে বইমেলা '১২-র শেষ দিনে আমাদের সমসাময়িক এক কবিতা-লেখক আর আমি বা/এ-র লিটলম্যাগ চত্বরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম; একপর্যায়ে সে আমাকে জানাল, রাইসুর ২য় কবিতার বই বেরিয়েছে। আমরা তখন রাইসুর অনলাইন পত্রিকার স্টল 'সকল বাংলা ডটকম'-এর সামনে রাইসুর স্টলের দিকে পাছা দিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম; আমি ব্রাত্য রাইসুর স্টলের দিকে মুখ ঘুরালাম, বললাম তাই নাকি, খুবই ভালো খবর! এরপর আমার পাশে দাঁড়ানো ওই কবি বলল, "বই বের হলে কী হবে? রাইসুর ১ম বইয়ে কয়েকটি কবিতা থাকলেও এটির মধ্যে কিছুই নেই। আমি বললাম তার মানে? এই কথা বলতে বলতে রাইসুর স্টলের দিকে আমি একা এগিয়ে গেলাম। বইয়ের নাম রাখা হয়েছে, 'হালিকের দিন'! বেশ অভিনব এবং চমক রয়েছে নামে। একটি বই হাতে নিয়ে ধাক্কা খেলাম দাম দেখে; ৯৬ পৃষ্ঠার বইয়ের দাম ৪০০ টাকা! যাই হোক সেই মুহূর্তে অর্থসংকটের কারণে হাত থেকে বইটা ধীর গতিতে নেমে গেল, এরপরে প্রায় সন্ধ্যার দিকে অর্থ সংগ্রহ করে এটি কিনলাম।

এরও দু-তিন সপ্তাহ পরে, ব্রাত্য রাইসুর ২য় কবিতা গ্রন্থ 'হালিকের দিন' পড়ে ফেললাম দুই বসাতে। এখন প্রশ্ন হলো, কী আছে "হালিকের দিন"-এ? আসলেই কি এটির মধ্যে কিছু নেই? রাইসুর ২য় বইটি কি শুধু দামি অফসেট পেপারে সুন্দর ছাপা আর মোটা বোর্ডের দামি বাঁধাইয়ের উপস্থাপন নাকি আছে কিছু এতে যা উল্লেখ হওয়া দরকার আলোচনা হওয়া দরকার?

আমি বইটি পড়ে এর মধ্যে ব্রাত্য রাইসুকে অল্পই পেয়েছি। রাইসুর মতো করে রাইসুকে পেতে চেয়ে আরও ধারালো-তীক্ষ্ণ কষাঘাত হয়তো চেয়েছিলাম; কিন্তু আমার চাওয়া পূরণ-ই-বা রাইসুর ব্রত হবে কেন? কাজেই এই গ্রন্থে যা নেই তা আলোচনার দরকার কী? যা আছে সেদিকে যদি আমরা মুখ-চোখ ফেরাই, তাহলে কী পাই?

রাইসুর ক্ষোভ প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'বড়লোকদের সঙ্গে আমি মিশতে চাই' কবিতায়। 'বড়লোক' তথা উচ্চবিত্ত তথা পুঁজিপতি তথা পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতীকী কায়দায় বাষ্পায়িত হয়েছে এই ক্ষোভ। রাইসুর কবিতার ভাষায় :

"করতে পারব না কোনদিন যারা ধানমন্ডি লেকের পাশে বাড়ি করেছেন,..."

এই 'করতে পারব না' মানে কী? মানে চুদতে পারব না বা লাগাতে পারব না বা ফাঁকাতে পারব না ইত্যাদি। বড়লোক চোদা কিন্তু প্রচলিত চোদা নয়; আমার ধারণা বড়লোকের আভিজাত্য, অহংকার এবং তার নিরঙ্কুশ নিরাপত্তা বেস্টনির ওপর

আঘাত হানা যা কবি রাইসু 'করতে পারব না' কথা দিয়ে প্রতীকীভাবে বোঝাতে চেয়েছেন।

আমার উপরিউক্ত ব্যাখ্যার সমর্থন মেলে এই কবিতার ২২তম লাইনের মধ্যে :

"বড়লোকদের সঙ্গে যৌন সঙ্গম ছাড়াই তবে এ জীবন যাবে!"

রাইসুর ওপর মনোজাগতিক তদন্ত চালালে যে-রিপোর্ট বেরিয়ে আসে, তাতে বোঝা যায়, রাইসুর এ-ধরনের 'অশ্লীল' শব্দ চয়নের পেছনের কারণটি হল অসহায়ত্ব; অসহায় মানুষ কাঁদে, গালাগাল দেয়, পাগল বনে যায়, আত্মহননের পথ বেছে নেয়। রাইসু হয়তো কাঁদবার লোক নয়, পাগলও নয়, সম্ভবত আত্মহননেও তার আগ্রহ নেই; সে-কারণে গালাগাল করে বোঝাতে চায় শত্রুর প্রতি তার কী-পরিমাণ বিরূপ মনোভাব এবং রাগ। এই অসহায়ত্ব ব্যক্তি রাইসুর ভেতরে জন্ম নিয়েছে আমাদের সামষ্টিক অসহাত্বের কারণে। অর্থাৎ রাজনৈতিকভাবে আমরা দুর্বল বলে গালি দিতে পারি, পচা ডিম ছুড়ে মারতে পারি; কিন্তু চাইলেই শত্রুর গালে চড় মারতে পারি না বা তাদের প্রশাসনের ওপর আমাদের মতো করে প্রভাব সৃষ্টি করতে পারি না।

ব্রাত্য রাইসুর কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য শ্লেষ। এই শ্লেষ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি আমজনতার মুখের ভাষা ব্যবহার করেন। তবে আমজনতার মুখের ভাষা প্রায়ই ছুটে যেতে দেখা যায় যেমন. "এরা দুইজন" কবিতায় :

"বৃষ্টি হলে কাঁঠাল তলায়"

এখানে আমজনতার ভাষা "কাঁঠাল" নয়া "কাডাল" হতে পারত, কিন্তু কবি তা করেননি নিশ্চয়ই সচেতনভাবেই। কাজেই কবিকে কথিত ভদ্রলোকের ভাষা এবং আমজনতার ভাষা দুই-এর মিশ্র ব্যবহার করতে দেখা যায়।

অমার ২য় কবিতার বইয়ের নাম ছিল "নড়ে ওঠো নেজ কুকুরে, চৈতন্যে"; ওই বইয়ে "নড়ে ওঠো নেজ" নামে একটি কবিতাও ছিল; যেখানে আমি কুকুরের লেজকে মানুষের বিবেকের প্রতীকী উপস্থাপন করেছিলাম; সকল মানুষের মধ্যে সেই লেজ নড়ে ওঠার আহ্বান জানিয়েছিলাম। এখানে উল্লেখ্য, কুকুরের লেজের ৪ রকমের ডাইমেনশন আছে : (১) কুকুর রাগ করলে পিঠের ওপর লেজকে শক্ত এবং সাধ্যমতো খাড়া করে রাখে; (২) কুকুর ভীত-সন্ত্রস্ত হলে পাছার নিচে লেজকে গুটিয়ে রাখে; (৩) কুকুর স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে পিঠের সামান্য উপরের দিকে লেজ তুলে লেজকে স্বাভাবিক রাখে; এবং (৪) কুকুর যখন প্রেম বা ভালোবাসায় আপ্লুত হয় তখন সে বিশেষভাবে লেজ নাড়িয়ে ভালোবাসার জানান দেয়। এই লেজ নাড়ানোকে আমি আমার কবিতায় ইতিবাচক প্রতীক হিসেবে চিত্রায়ন করেছিলাম।

কিন্তু প্রচলিত অর্থে কুকুরের এই লেজ নাড়ানোকে তোয়াজ বা চামচামি অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে; কবি ব্রাত্য রাইসুও তাই করেছেন। "তার সাথে" কবিতায় প্রমিত "লেজ" লিখেছেন আমজনতার ভাষা "নেজ" লেখেননি:

কুকুরের মতো লেজ নাড়ি তাই
তার ভালো লাগে
নিজে বলেছেন
আরো লেজ নাড়ি...
তার নিজ লেজ
নাড়ান না তিনি

(কবিতা: তার সাথে)

"হালিক" শব্দটি যেমন বঞ্চিত গ্রামীণ মানুষের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, পক্ষান্তরে উপরিউক্ত কবিতাটির "লেজ" শব্দটি কিন্তু কথিত ভদ্র লোকদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই বইয়ের প্রায় সকল কবিতাই বর্ণনামূলক, যা একই সঙ্গে একাধিক অর্থ বা বহু অর্থের দ্যোতনা কমই সৃষ্টি করে। "উপ্রে" মানে উপরে, "বানাইন্না" মানে বানানো, "আম্রা" মানে আমরা– এই ধরনের শব্দে রাইসুর ঝোঁক দেখা যায় কিন্তু সেটা আবার বিক্ষিপ্ত অর্থাৎ একই শব্দের ব্যবহার ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় ভিন্ন ভিন্নভাবে করেছেন।

রাইসুর কবিতা বিষয়, প্রকরণে স্থিত নয়; বিক্ষিপ্ত। নিজস্ব ভাষা ও স্বর-এর পূর্ণাঙ্গতা দেয় না, বক্তব্য-শ্লেষ-কষাঘাত তাও খণ্ড-খণ্ড এলেবেলে মনে হয়। এসবের পরেও এই নৈরাজ্যের কালে অর্থাৎ হালিকের দিনে কবি ব্রাত্য রাইসু অনেক বেশি রাজনীতি সচেতন কবি:

পা ভেঙ্গে তো ওঁরা দুঃখ পায়
তবে, মানুষ মারার পরে পা নাচায়।

(কবিতা: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পা)

ব্রাত্য রাইসুর কবিতা অন্তত আলোচনার জন্য তার বইটি পাঠের প্রয়োজন বোধ হয়, অন্তত বোধ হয় তার কবিতার সমালোচনা করি; এটাও সাহিত্যের এই দুর্দিনে এই কবির কাছ থেকে আমাদের কম পাওয়া নয়। পক্ষান্তরে আমাদের সময়ে দু-চারজন বাদে প্রায় সবাই ছাইভস্ম ছাড়া কী-ই-বা লিখছে। বরং বলা যায়, নানা কুপথ অবলম্বন করে অর্থাৎ মিডিয়ার বশ্যতায় মিডিয়ার দৌরাত্ম্যে মহা-মহা কবি হয়ে উঠেছেন যারা, তাদের প্রায় সব কবিতাই বিষয়হীন গন্তব্যহীন অসহায় খালি-পাত্রের হাহাকারের ন্যায় অ-দরকারী, কলাকৈবল্যবাদের মরিচায় অচল, অপাঙ্‌ক্তেয়; এদের কবিতায় পুরুষবাদী আবর্জনার এলেবেলে মানসনিঃসৃত হাজার-কোটিবার 'স্তন', যোনি', ব্যর্থ যৌন-উন্মাদনার উল্লেখ ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না; সর্বোপরি এদের কবিতা সাধারণ-মানুষশূন্য এক অর্থহীন দাসত্ব ব্যতীতও কিছুই না। ...এই কৈবল্যের পথ থেকে নতুন প্রজন্মকে ফিরে আসতে হবে, তা না-হলে আড়াই শ বছরের চলমান দাসত্ব থেকে

অন্য-দশটা বিষয়ের মতো আমাদের কবিতাকেও মুক্ত করা যাবে না। খুব লজ্জার সঙ্গে বলতে হয়, আমাদের সময়ের কারও কারও কবিতা তো যে-কোনো জায়গা থেকে শুরু আর যে-কোনো জায়গায় সমাপ্ত বলে মনে করলেও অত্যুক্তি হয় না; এদের কোনো বিষয় নেই, এদের প্রকরণটা গৎবাঁধা প্রাচীনপন্থীয়; এরা জনগণ, সমাজ, রাষ্ট্র, রাজনীতি এসবের কিছুকেই আমলে নেয়ার প্রয়োজন মনে করে না। এদের কবিতা প্রকৃতই কলাকৈবল্যবাদী; এতে কারও বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকবারও কথা নয়।

কারও কারও আবার দলবাজির কৌশলটা বেশ রপ্ত করা আছে; আমাদের সময়ে দলবাজির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দুর্বৃত্ত'র নাম শামীম রেজা। এ-কে আমি প্রথম দেখি জিগাতলা দৈনিক 'আজকের কাগজ' পত্রিকা অফিসে; দেখতে ফর্সা, হাস্যোজ্জ্বল; সর্বোপরি সুদর্শন কিন্তু এর মাথাটা সাহিত্যের তুলনায় সাহিত্য নিয়ে দলাদলি, পুরস্কার গ্রহণ-বিতরণ এবং যাবতীয় কেরিক্যাচারে পূর্ণ। এর মুখে হাসি কিন্তু এর চোখের মধ্যে একটা ধ্বংস লেগে থাকে। অবশ্য এই ধ্বংসটা শিশুতোষ। আমার অনেক কবিতা সে আজকের কাগজে ছেপেছে কিন্তু অন্য দুষ্ট সাহিত্য-সম্পাদকদের কাছ থেকে যেভাবে নিজেকে রক্ষা করেছি এর দলবাজিকেও সবসময় একইভাবে এড়িয়ে চলেছি। বরিশালের ছেলে হিসেবে কবিতার একটা মনোজগৎ তার শুরুতে ছিল, পরে সাহিত্য-কেন্দ্রিক নানা রকম অপকর্মের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়ায় নিজের সৃষ্টি-জগৎ ধরে রাখতে পারেনি। এরকম আশির দশকের আরেক দুষ্ট সাহিত্যিক শামীম রেজারই নাকি চাচা পারভেজ হোসেন; মুখে মধু অন্তরে বিষ; কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক হওয়ার ক্ষেত্রে অন্যদের সহযোগিতা করলেও নিজের গদ্য-চর্চার কোনো স্বরূপ ও ধারা দাঁড় করাতে পারেননি; সমসাময়িকদের মধ্যে নিজেকে গল্পকার হিসেবে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে না-পেরে বর্তমানে অনুজদের মধ্যে নানা রকম (বিভিন্ন কর্পোরেট হাউজের, কলকাতার ইত্যাদি) পুরস্কার পাইয়ে দেয়ার কাজে লিপ্ত বলে জনশ্রুতি আছে; যা অনুজরা বিরক্তির সঙ্গে যে প্রত্যাখ্যান করছে তা-ও বুঝবার ক্ষমতা বেচারার নেই। রাজধানীর শাহবাগ পাড়ায় 'চাচা-ভাতিজার সিন্ডিকেট' হিসেবে এরা পরিচিতি পেয়েছে। জীবনানন্দ দাশ বেঁচে থাকলে খুব লজ্জা পেতেন এই ভেবে যে, এই মানিকজোড় বরিশালের মানুষ! প্রসঙ্গক্রমে বদরুদ্দীন উমরের ভাষায় উল্লেখ্য, "ইকনোমিক্যাল ডিজঅনেস্টি ইজ দ্যা লোয়েস্ট কোয়ালিটি অব ডিজঅনেস্টি"; তিনি আরও বলেন, "আর্থিক বিষয়ের বাইরেও হাজার রকমের ডিজঅনেস্টি থাকে, সাধারণত যেগুলোকে মানুষ হিসাবে কম ধরে। কিন্তু আর্থিক বিষয়ের বাইরের ডিজঅনেস্টিও অনেক বেশি ক্ষতিকর হতে পারে, যা আমাদের বিচার-বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন।"একথা বলবার কারণ হল, এই চাচা-ভাতিজা আমাদের সাহিত্যিক-পরিবেশ নির্বিচারে নষ্ট করে যাচ্ছে, হয়তো বুঝে অথবা হয়তো না-বুঝে; এরা শিশু নয় তারপরও 'বুঝে অথবা না-বুঝে' কথাটি বললাম এই জন্য যে, নিজেদের বৈশিষ্ট্যের সমস্যার কথা অনেক সময় নিজেদের চোখে ধরা পড়ে না। বাংলাদেশে একমাত্র আহসান হাবিব সম্পাদক হিসেবে একটি সময়কে জন্ম

দিয়েছেন। এছাড়া প্রায় সকল দৈনিকের সাহিত্য সম্পাদক নিজের ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থে দৈনিকের পাতাকে ব্যবহার করেছেন। উল্লেখ্য, যারাই ওই সব সম্পাদকের টেবিলে নিয়মিত হাজিরা দেয় না, বড়ভাই জ্ঞান করে বিশুদ্ধ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে না, এরা অধিকাংশ সময়ই তাদের-করা সংকলনের সূচির মধ্যে ঠাঁই পায় না। দুই বাংলার মধ্যে বাংলাদেশ অংশের এই তালিকা তৈরির কর্মটি বর্তমানে অর্পিত আছে মিডিয়া 'ডন' সাজ্জাদ শরীফের ওপর। রাইসু 'প্রথম আলো' ছাড়ার পর এই দৈনিকের সাহিত্যপাতা জাফর আ. রাশেদের হাতে মৃত্যুলাভ করলেও এই পাতার প্রধান ডন কবিতার 'ক'-এর কাছ দিয়ে না-ঘেঁষলেও এদেশের কবিতা নিয়ে কুকীর্তিতে তার বিরতি নেই। তার করা সংকলনের বাইরে যারা আছে তারা কবি নয়, কাজেই তাকে সেজদাহ করো তবেই কবি হওয়া যাবে! ইতিহাস বলে জীবনানন্দ-কে চিনতে হলে একজন বুদ্ধদেব দরকার আর অক্ষয়কুমার দত্ত-কে চিনতে হলে একজন দেবেন্দ্রনাথ দরকার; শামীম রেজা, পরভেজ হেসেন, সাজ্জাদ শরীফ– এরা যা, এদের পক্ষে তা-ই চেনা সম্ভব। আমার প্রশ্ন হল, সাহিত্যে এদের ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট হবে কী দ্বারা! উল্লেখ করবার মতো, ধরবার মতো, বিবেচনা করবার মতো এদের যেহেতু কিছুই নাই, সে-কারণে এটা-সেটা চটুল ফেনা-কর্ম দিয়ে বাজার গরম রাখতে চায়। কিন্তু এই ফেনা দিয়ে শেষরক্ষা হয় না, কিছুদিন পরে ফেনা মিইয়ে যায়; সাজ্জাদ শরীফ আজ 'প্রথম আলো' ছাড়লে কাল তাকে তরুণরা আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করবে; কেননা তার এমন কোনো লেখাজোখা নেই যার শক্তিতে পাঠকের হৃদয়ে সে বেঁচে থাকবে। তারপরও সাহিত্য নিয়ে এরা যে-কুকর্মগুলো করছে সেটা ব্যর্থতার যন্ত্রণা থেকেই।

যাই হোক; ভিন্ন চিত্রও আমাদের সময়ে রয়েছে; সেটা হল আরও দু-একজন কবিসহ কবি রাইসুর রচনা এবং তাদের কর্মকাণ্ড ও ধর্মকাণ্ড; লিটলম্যাগ-এর কথিত ভ্রান্ত ধারণা দ্বারা রাইসু যেমন চালিত নয় একইভাবে পুরস্কার, দলাদলি ইত্যাদি থেকে সে অনেকটাই দূরে; রাইসুর সৃষ্টিজগতে 'মানুষ' রয়েছে। কাজেই কোনোভাবেই রাইসুর কবিতা কলাকৈবল্যবাদী নয়।

তবে সার্বিক বিচারে রাইসুর কবিতাও যে নানা রকম দোষে দুষ্ট, তার একটি উদাহরণ তুলে ধরছি– রবীন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করে রাইসু লিখেছেন :

"...গুড, ওনারা মাইনা নিলেন
বইলাই না আমরা আইজ বাংলায় হরদম সাহিত্য চোদাইতেছি। ...."

(কবিতা: রবীন্দ্র-অনাথ বাংলা ভাষা)

সে-ই রবীন্দ্রনাথেরই তাল, লয় ও স্বরে রাইসু অন্য কবিতায় দ্ব্যার্থহীনভাবে লিখছেন

আমার সকল দিন
সমাপন হলো আজ
তব গান গাইব না আর আমি

(কবিতা: দুর্ব্যবহারের স্মৃতি)

উপরিউক্ত লাইনগুলো কিন্তু শ্লেষাত্মক নয়, বোঝা যায়, জীবনের সিরিয়াস মুহূর্তের উচ্চারণ এগুলো। এতে দেখা গেল, একই রবীন্দ্রনাথকে এক কবিতায় ঠাট্টার পাত্র করা হয়েছে আবার আরেক কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ রাইসুও কোন কোন ক্ষেত্রে বিষয় ও প্রকরণে স্থিত নয়; চঞ্চল, অস্থির এমনকি অসংলগ্নও। যাইহোক ব্রাত্য রাইসুর ক্ষেত্রে একথা খুবই খাটে যে, "কবিতা অর্ধেক আর অর্ধেক হল কবি" কেননা রাইসুর জীবন-যাপন চলন-বলন এসবও কবিতার চেয়ে কম শ্লেষাত্মক নয়। তার পোশাকের কম্বিনেশন সম্পর্কে এসময়ের সকল কবিতা-লেখকই জ্ঞাত। আর তার কথাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাঁধভাঙা

একবার মান্যবর আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ-কে রাইসুর একটি কবিতার বই দিয়ে বলল স্যার বইটা একটু পড়ে দেখবেন। এর কিছুদিন পর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের টিয়েন্টিতে ফোন দিয়ে রাইসু বলল, "আমি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে চাই।" সায়ীদ ফোন ধরে বললেন, "হ্যালো কে?" ফোনের ওপাশ থেকে একজন বলছে, "আমার নাম রাইসু আমি একটা বই দিয়েছিলুম, বইটি কি পড়সু?" এই হল আমাদের হযরত রাইসু! এর সম্পর্কে কে কতটা জানসু? হয়তো সব জানা হয় না, জানা সম্ভবও না। তার এই ২য় বইটি অনুপুঙ্খ পাঠ করে এই রচনা রচিলাম বলা যাবে না। সেই হেতু অধিকটাই অজানা অবলা রয়ে গেল হয়তো, যা বললাম তা সত্য কিন্তু ধ্রুব নয়।...